রবীন্দ্র-সাহিত্যের নায়িকারা

দ্রোহে ও সমর্পণে

আহমদ রফিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

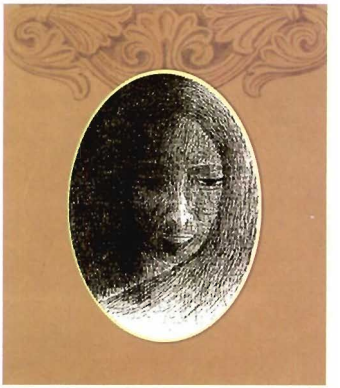

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক বা চিত্রকলায় যেমন অসামান্য তেমনি সমাজ, ধর্ম, রাজনীতির ভাবনাতে অভিনবত্বই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনাতে ঐ অভিনবত্বের প্রকাশ তাঁর নিজস্বতায়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রচৈতন্যের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে প্রতিফলিত তেমনি এক বৈপরীত্য তাঁর নারীভাবনায়ও পরিস্ফুট। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত স্রোতে অবগাহন করেছেন।

সতেরো-আঠারো বছরের যে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিলেতে বসে দেশী-বিদেশী নারীদের জীবনযাত্রার তুলনামূলক বিচার করে নারীস্বাধিকারের পক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছিলেন তিনিই চল্লিশের পরিণত বয়সে পৌঁছে সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যসম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার প্রবক্তা হিসেবে সনাতন বিশ্বাসের রক্ষণশীল অনুসারী হয়ে ওঠেন। সে সময়কার রচনায় তেমন প্রমাণ ধরা রয়েছে। আবার সত্তর বছরে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথই পর্বান্তর যাত্রায় নারীর স্বাধিকার ও ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং সে বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সৃষ্টিতে যদিও মাঝে মধ্যে পূর্বধারণা হঠাৎ ঝলসানি দিয়ে যায়।

উপন্যাস থেকে ছোটগল্প, কবিতা থেকে নাটকের নায়িকারা রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার পূর্বোক্ত বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য ধারণ করে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। সেখানে আধুনিকতা-অনাধুনিকতার টানাপোড়েন রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সে টানাপোড়েনের ইতিকথাই গ্রন্থধৃত আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিচার-বিশ্লেষণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাবন্ধিক কবি ও কলামিস্ট হিসেবে খ্যাত আহমদ রফিক, (জন্ম ১৯২৯) ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির আকর্ষণে সমভাবে আলোড়িত ছিলেন। তিনি বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাঁর শিক্ষাজীবন বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। পেশাগতভাবে শিল্প-ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একদা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মননের চর্চাতেই তিনি অধিক সমর্পিত। এখন পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে সক্রিয়। একাধিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা, প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সক্রিয় রয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে। রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা একাডেমির ফেলো এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবনসদস্য।

তাঁর সৃষ্টিকর্মের পরিধি ব্যাপক। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক থেকে রাজনীতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও বিজ্ঞান তাঁর রচনার অন্তর্গত। মূলত প্রবন্ধ ও কবিতায় তাঁর সৃষ্টিকর্মের সর্বাধিক প্রকাশ, যদিও একদা কিছু সংখ্যক গল্পও তিনি লিখেছিলেন। রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুশীলন ও গবেষণা তাঁর অন্যতম বিশেষ প্রিয় বিষয়।

তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার পান। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার— একুশে পদকে ভূষিত হন। কোলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি।

আলোকচিত্র : বিশ্বজিৎ সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Rabindra-Shahityer Naikara
Drohe O Samarpone

by Ahmad Rafique
price Bdt 140.00 only
US $ 6.00
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh

an ANYAPROKASH publication

ISBN 984 868 229 5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নায়িকারা
দ্রোহে ও সমর্পণে

আহমদ রফিক

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৩

© | লেখক

প্রচ্ছদ | রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম অবলম্বনে মাসুম রহমান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১৪০ টাকা

Rabindra-Shahityer Naikara
Drohe O Samarpone | By Ahmad Rafique
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk 140 only
ISBN 984 868 229 5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদিত
ও
কলি-কে
জীবন নির্বিঘ্ন হোক নিরঙ্কুশ পদযাত্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক বহুমাত্রিক বিস্ময়কর প্রতিভা। সাহিত্যের এমন শাখা নেই যা তাঁর লেখনি স্পর্শ করে নি, মায় চিত্রকলাও তাঁর সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। শৈল্পিক সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও চিন্তাভাবনার স্বাধীন প্রকাশ ঘটাতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সব কিছুই প্রেক্ষাপট হিসাবে এসেছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রভাবনায় অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটেছে যথারীতি। সে অভিনবত্ব একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা নানা বিচারে, নানা তত্ত্বের ভারে জটিল। তাঁর কবিতা থেকে উপন্যাস ও ছোটগল্পের সর্বত্র ঐ নারীভাবনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। প্রবন্ধে তা আরো প্রত্যক্ষ। ঐ ভাবনার তাপে ও উর্বরতায় তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র বিশেষ করে নায়ক-নায়িকা চরিত্র যথাযথ রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রসৃষ্ট নায়িকা-চরিত্র— বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতার নায়িকা-চরিত্রে কীভাবে কতটা প্রভাব ফেলেছে, গড়ে তুলেছে কোন্ বৈশিষ্ট্যে তারই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। রবীন্দ্রনাটক এ আলোচনায় বিবেচিত হয় নি বিশেষ কারণে। বাঁশরী'র কাহিনীধর্মী তথ্য উপন্যাসধর্মী চরিত্রের জন্য 'বাঁশরী'কে নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বহু-আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার জটিলতার কারণে ঐসব বিষয়ের উল্লেখ যুক্তিসঙ্গত। যেমন রবীন্দ্রচেতনায় দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব— মহর্ষি পিতা ও পারিপার্শ্বিক স্থানিক প্রভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রভাবের দ্বন্দ্ব। প্রথমোক্ত প্রভাবের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যপ্রভাব যা ধর্মীয় অনুশাসনের রূপ নিয়ে যুগ যুগ ধরে সমাজের নিয়ন্ত্রক চরিত্র গড়ে তুলেছে। সে সামাজিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে পারিবারিক পরিসরে এবং সেই সূত্রে ব্যক্তিচেতনায়, সংস্কার ও রক্ষণশীলতা নিয়ে।

দ্বিতীয় প্রভাব মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শন-চিন্তার আলোয় সৃষ্ট মূল্যবোধ উপনিবেশের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের হঠাৎ সমৃদ্ধ ধনিক ও এলিট শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল উনিশ শতকী স্থানিক রেনেসাঁস তথা নবজাগরণের মাধ্যমে। এ জাগরণ ছিল সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত চরিত্রের। তবু এর প্রভাব উল্লেখিত শ্রেণীতে হয়েও উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-মানসিক পরিবর্তনের দিকনির্দেশিকা। রবীন্দ্রনাথের পরিবার অর্থাৎ ঠাকুরবাড়িতে এই দুই প্রভাবই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায়। রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত দুদিকের প্রভাবই আত্মস্থ করেছিলেন নির্দ্বিধায়।

রবীন্দ্রচেতনায় পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতার সূত্রপাত এভাবেই। প্রসঙ্গত প্রশ্নটা ছিল এর মধ্যে কোন্ প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক আলোড়িত হয়েছিলেন। এ প্রশ্নের সোজাসরল জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। পিতার উপস্থিতি এবং স্থানিক পারিপার্শ্বিক প্রভাব যখন যেভাবে রবীন্দ্রচেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে তারই নিয়ন্ত্রক ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে ছাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছে। চরিত্রগুলো সেভাবেই গড়ে উঠেছে, বিন্যস্ত হয়েছে কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরা এবং পরিণতি। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে।

এর ফলাফল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জন্য ও তাঁর সৃষ্টির জন্য শুভ পরিণাম বহন করেছিল কিনা সে প্রশ্ন যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি আরো একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে রবীন্দ্রনাথ এ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কি-না কিংবা কতটা সচেতন ছিলেন এর জবাব মেলা কঠিন। জবাব মিলুক বা নাই মিলুক একথা সত্য যে তৃতীয় আরেকটি বিষয় রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় যুক্ত হয়েছিল, তাতে প্রাচীন সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর উদ্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তার ফসল। যেমন রবীন্দ্রনাথের দুইনারী তত্ত্ব— মাতা ও প্রিয়া। অন্যদিকে নারীর সুন্দরী ও কল্যাণী রূপ কিংবা প্রেয়সী ও গৃহলক্ষ্মী রূপ— এমনি নানাতত্ত্বে নারীত্বধারণাকে রবীন্দ্রনাথ জটিল করে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের উপলক্ষে নারী-পুরুষের শারীরতাত্ত্বিক ভিন্নতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত এক অবসেসন লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রথম দুই পর্বে উপরে উদ্ধৃত বিষয়গুলো নিয়ে অনেকটা আধ্যাত্মিক ঘোরের মতো ভাবিত ও তাড়িত ছিলেন। এর সঙ্গে ছিল সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যসম্বন্ধের শুদ্ধতা বিষয়ক 'অবসেসন' যা পূর্বোক্ত সনাতন ঐতিহ্যপ্রভাবজাত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এ দুই পর্বের নায়িকা চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তবে জীবনের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ঐতিহ্যপ্রভাব-চেতনা থেকে অনেকটা মুছে ফেলতে পেরেছিলেন। তবু কি সবটুকু পেরেছিলেন?

রবীন্দ্রচেতনায় উল্লিখিত নানা প্রভাব এবং নারীভাবনায় সেসবের যে প্রতিফলন ঘটেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ছোটগল্প ও অংশত কবিতায় তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র তথা নায়িকাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তাঁর নারীভাবনার প্রকৃতি নির্ধারণে খুবই সহায়ক হয়েছে। কারণ প্রবন্ধে তাঁর মতামত খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সেখানে কোনো রাখঢাকের সুযোগ নেই, প্রয়োজন নেই।

এ উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিষয়টিকে রবীন্দ্রজীবনকালের পরিসর বিবেচনায় তিনটি প্রধান পর্বে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রধানত উপন্যাসের কথা ভেবে এ পর্বভাগ। এ পর্ববিভাগে সময় যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব-পর্বান্তরে রবীন্দ্রমানসে রক্ষণশীলতা-আধুনিকতার পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ। বিলেতে সতেরো-আঠারো বছর বয়সী প্রবাসী তরুণ রবীন্দ্রনাথ সমাজে নারীর সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন 'ভারতী' পত্রিকায় যেসব চিঠি লিখেছেন তা পরে 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ স্বল্পপরিসর পর্বে রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধিকারের প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের মতামত তাঁর পরিবারে, মূলত পিতা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে (দ্বিজেন্দ্রনাথও বটে) যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এতেই বোঝা যায় ঠাকুরবাড়ির আধুনিকতা অবিমিশ্র চরিত্রের ছিল না। আর কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে মহর্ষির চিন্তাভাবনা এবং জীবনাচরণই ছিল তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্রের প্রকৃত রূপ। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে ব্যতিক্রম এবং প্রভাবহীন। এ পর্বে 'দেনাপাওনা', 'ত্যাগ', 'মহামায়া' ইত্যাদি নারীবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প রচিত হয়েছে। লেখা হয় 'চিত্রাঙ্গদা'র মতো নাটক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পর মোটা হিসাবে চল্লিশ বছরের (১৯০১) রবীন্দ্রনাথ (পেছনের কয়েক বছরে ভিত তৈরির কাজ চলেছে) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন ঐতিহ্যে নিমজ্জিত, তাঁর নারীভাবনায় রক্ষণশীলতার ও হিন্দুত্ববাদিতার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এ সময়টা ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বঙ্গদর্শন পর্ব নামে পরিচিত হলেও সাহিত্য সৃষ্টির বিচারে একে 'চোখের বালি'-'নৌকাডুবি' পর্ব বলাই সঙ্গত। রবীন্দ্রচেতনার এ সময়কার প্রভাব উল্লিখিত উপন্যাস দুটোতে এবং অন্যান্য রচনায় পড়েছে, 'নষ্টনীড়' এ দিক থেকে ব্যতিক্রমী রচনা (রবীন্দ্রসৃষ্টির এ দ্বৈত চরিত্র গোটা রবীন্দ্রজীবন-পরিসরের জন্য সত্য)। কবিতায় এ সময়টাকে নৈবেদ্য'র ভক্তিবাদী কালপর্ব বললেও ভুল হয় না। মহর্ষির মৃত্যুর সময় (১৯০৫) পর্যন্ত প্রসারিত এ পর্ব স্বল্পকালীন হলেও এ সময়ে অর্জিত ভাবনার প্রভাব চলেছে সবুজপত্র পর্বের (১৯১৪) পূর্ব পর্যন্ত।

পূর্বোক্ত সময়পর্বের নারীভাবনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-চরিত্রে এরপরও বেশ কিছুকাল ধরে প্রভাব রেখেছে, বলা যায় সেগুলোকে অধিকার করে রেখেছিল। 'গোরা' (১৯০৭-১১) রচনার সময় থেকে রবীন্দ্রভাবনায় সেইসঙ্গে নারীভাবনায় বাঁকবদলের সূচনা ঘটলেও পরবর্তী প্রায় এক দশক জুড়ে কমবেশি পূর্বোক্ত প্রভাব রবীন্দ্ররচনায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। বিশেষ করে উপন্যাসে। সবুজপত্রের (১৯১৪) কাল ছোটগল্পের জন্য প্রগতিপর্ব হিসাবে বিবেচিত হলেও উপন্যাসে দিকবদল শুরু তিরিশের দশকের বছর দুই আগে, যখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শেষের কবিতা'। আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞতা কি এর পেছনে উদ্দীপক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল ? লাবণ্যর আধুনিকতামণ্ডিত চরিত্র, তার শান্তশ্রী, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও মমতাময়ী রূপে আর্জেন্টাইন মহীয়সীর ঈষৎ আভাস পড়েছে ? ভেবে দেখার মতো বিষয়।

দু'এক বছর অগ্রপশ্চাৎ হিসাবে ধরে নিয়ে মোটামুটি হিসাবে তিরিশের দশকের শেষ এক যুগপর্ব তথা তৃতীয় পর্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক ভাবনায় তেমনি নারীভাবনায় নানামাত্রিক আধুনিকতাবোধের প্রকাশ স্পষ্ট।

তবে পূর্বধারণার তলানি সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল বলে মনে হয় না, 'মাঝে মাঝে তার বারতা' সূক্ষ্ম পরিস্রুত রূপে হলেও চোখে পড়ে। তবে সাধারণভাবে এ পর্বের রবীন্দ্রমানসিকতা (নারীবিষয়ক) উপন্যাসে প্রতিফলিত, নায়িকাচরিত্র বিচারে তা বোঝা যায়, আবার এ সময়েই সৃষ্ট অন্য নায়িকার ('যোগাযোগের' কুমু) চরিত্রে পিছুটানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্য বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীলতার শিকড় তুলে ফেলার চেষ্টা। এ চেষ্টা কতটা সফল তা নিয়ে প্রশ্ন একাধিক সমালোচকের, বিশেষ করে যারা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন।

ছোটগল্প বিদ্রোহী নায়িকার জন্ম দিয়েই এদিক থেকে পুরোপুরি ভারমুক্ত হতে পারে নি। 'তিনসঙ্গী'র দুই নায়িকা, বিশেষত অচিরা এবং অন্য দু'একজন তার প্রমাণ। তবে উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদ— প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, তার স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ অনেক স্বচ্ছ এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। ভাবতে অবাকই লাগে যে ছোটগল্পের সূচনাই নারীনির্যাতনের শোকাবহ পরিণতি-চিত্রণে এবং কিছুটা পরে বিবাহিত নারীর পরকীয় প্রেমবাসনার উদ্ভাসে। এমনি একাধিক গল্প তখনকার রবীন্দ্রমানসের পরিচয় তুলে ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় অবশ্য বিষয়টি স্বাভাবিক নিয়মেই সীমাবদ্ধ বৃত্তে আশ্রিত। তবু 'বলাকা'-'পলাতকা' (সবুজপত্র পর্ব) থেকে 'মহুয়া' পর্বের প্রেমাভিসারে আধুনিকতার কালচরিত্র হৃদয়-বাস্তবতার আভাস ফুটিয়ে তুলেছে, প্রেমের স্বাধীনতা ও বন্ধনমুক্তির আধুনিকতা সমানমাত্রায় পরিস্ফুট। পরবর্তী 'পুনশ্চে'র সহজ স্বচ্ছন্দ ঘরোয়া চরিত্রেও নারীস্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট। সংখ্যায় অল্প হলেও কবিতার বিদ্রোহী নায়িকারা প্রকৃত অর্থেই বিদ্রোহী।

আপাত বিচারে রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় অতীত থেকে বর্তমানে সমাজে নারীর অবস্থামূলক দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রমানসে সনাতন সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব এবং সমাজ-সাংস্কৃতির সঙ্গে নারী নির্যাতনের সম্পর্ক বিশেষ করে ঐতিহ্য বিচারে এর ধারাবাহিকতা স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রবীন্দ্রমানস মূলত পিতার শিক্ষা এবং অংশত পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ঐ ধারাবাহিকতা তথা উত্তরাধিকার বহন করেছে বলে বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কালে নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা, তার অধিকার-অনধিকার সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য বলে আমার ধারণা।

এসব ঐতিহ্যবাহিত অর্জন, এবং পারিবারিক-সামাজিক প্রভাবই তো রবীন্দ্রমানসে নারীভাবনার ভিত্তি তৈরি করেছে। এ মূল ভিত্তির ওপর পরবর্তী কাল ক্রমান্বয়ে পলি সঞ্চিত করেছে ভিন্ন চরিত্র ধারায়। তাই 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে 'কালান্তর' পর্বের প্রবন্ধ কিংবা 'চোখের বালি' ও 'দেনাপাওনা'-'নষ্টনীড়' পার হয়ে 'চার অধ্যায়' ও 'তিনসঙ্গী'র ধারাবাহিক পাঠে ধরা যায় দুই বিপরীত স্রোতের যাত্রী রবীন্দ্রনাথকে, দেখা যায় মধ্যপর্বের প্রচণ্ড সনাতনপন্থী রবীন্দ্রনাথকে। আবার চোখে পড়ে 'সবুজপত্র' পর্ব থেকে শেষ পর্বে পৌঁছে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ কী স্বচ্ছন্দ গতিতে আধুনিকতার হাল ধরে জীবনতরী বাইতে থাকেন। আরো চোখে পড়ে প্রবন্ধ সাহিত্যে মতামতের স্পষ্টতা পার হয়ে প্রগতি পর্বের সৃষ্টিকর্মে বিপরীতে স্রোতের টানাপড়েনে কেমন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার আভাস তৈরি করেছে। কখনো প্রগতির টান কখনো পিছুটান তাঁর নারীবিষয়ক চিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ রহস্যময় ও জটিল করে তুলেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের চরিত্র বিচারে তাই নির্দিষ্ট দুই বিপরীত ধারার প্রকাশ অস্পষ্ট থাকে নি। সেক্ষেত্রে সত্যিকার বিদ্রোহী নায়িকারা সংখ্যায় খুবই অল্প, কিছুসংখ্যক দুই ধারার মধ্য অবস্থানে ঠাঁই নিয়েছে, অন্যদিকে দলে ভারি সনাতন পন্থার অনুসারী নায়িকারা। এর কারণ বিদ্রোহী নায়িকারা প্রায়শ নানা কারণের বশবর্তী হয়ে আত্মনিবেদনে বা সমর্পণে অবস্থান পরিবর্তন করেছে। আশ্চর্য যে তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে এসব রচনার জন্য রক্ষণশীল সমাজ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। সে আক্রমণ ছিল অযৌক্তিক, অশোভন, ক্ষেত্র বিশেষে অশ্লীল। সবশেষে এ বই প্রকাশ উপলক্ষে 'অন্যপ্রকাশের তিনসঙ্গী'কে অশেষ ধন্যবাদ।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ **আহমদ রফিক**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী-স্বাধিকার প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা ১৩
নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা অতীত থেকে বর্তমানে	পৃষ্ঠা ২৩
রবীন্দ্রভাবনায় নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান	পৃষ্ঠা ৩৩
'চোখের বালি' আধুনিকতা ও সনাতন চেতনার সংঘাত	পৃষ্ঠা ৫৯
'নৌকাডুবি' সামাজিক রক্ষণশীলতার চিত্রচরিত্র	পৃষ্ঠা ৭৩
নারীভাবনায় দুই বিপরীতের প্রকাশ 'গোরা' উপন্যাসে	পৃষ্ঠা ৮১
বিদ্রোহী নারীব্যক্তিত্বের প্রতীক দামিনী	পৃষ্ঠা ৯১
'ঘরে বাইরে' দাম্পত্যসম্বন্ধের পটভূমিতে সতীত্ব-নারীত্বের দ্বন্দ্ব	পৃষ্ঠা ১০৫
'যোগাযোগ' সনাতন দাম্পত্যসম্বন্ধের জালে আটক হরিণী কুমু	পৃষ্ঠা ১২০
'শেষের কবিতা' রোমান্টিক প্রেমের দ্বৈতরূপ	পৃষ্ঠা ১৩৯
'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' দুই নারীতত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ কতটা ?	পৃষ্ঠা ১৪৯
'চার অধ্যায়' প্রতিকূল পরিবেশে প্রেমের জঙ্গমতার প্রকাশ	পৃষ্ঠা ১৫৭
ছোটগল্পের বিচিত্র নায়িকারা	পৃষ্ঠা ১৬৫
কবিতায় নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন উচ্চারণ	পৃষ্ঠা ১৮৫
শেষ কথা	পৃষ্ঠা ১৯০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী-স্বাধিকার প্রসঙ্গ

বিশ শতকের বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজসচেতন সময় পেরিয়ে এসে এবং আধুনিকতার উত্তরপ্রভাব বহন করেও আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিশেষ যে দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশার স্তরে পৌঁছাতে পারে নি তা হলো নারীস্বাধীনতা, বিশেষত মানব-মানবীর যুগ্ম রূপের মানদণ্ডে নারী-পুরুষের পাশাপাশি চলা এবং সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাধাহীন প্রকাশ নিশ্চিত করার প্রশ্নে। এ বিষয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি এক পা এগিয়েছে তো দু'পা পিছিয়েছে। আধুনিকতার প্রভাব এদিক থেকে একমুখী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু আধুনিক সমাজে ভোগবাদের প্রকাশে কোনোদিকেই কমতি নেই।

অথচ সামাজিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ নারীর স্বাধিকার ও ব্যক্তিসত্তার আত্মনির্ভর বিকাশের প্রশ্নটি অনেক কাল আগে বিভিন্ন স্তরে উচ্চারিত হয়েছে। এর কারণ সমাজে জনসংখ্যার হিসাবে নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান বলা চলে। সমাজের এত বড় জনশক্তি যদি ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে গৃহকর্মের ও সন্তান লালনের নামে বন্দিদশায় দিন কাটায়, সামাজিক অগ্রগতির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করে তাহলে সমাজের অর্ধেকটাই তো নির্জীব বা পঙ্গু হয়ে থাকবে, সমাজে প্রত্যাশিত প্রগতির প্রতিফলন ঘটবে না।

এমন ধারণা থেকে সমাজের সচেতন অংশে, তা যত ছোটই হোক, দাবি উঠেছে যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি থেকে ভোটাধিকারের মতো গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে, প্রকৃতপক্ষে সচল সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ যেমন অপরিহার্য তেমনি অংশগ্রহণের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিও ততটা জরুরি। এ দাবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠেছে সমাজের সচেতন নারী-পুরুষের রচনায় বা সমাজ সংস্কারে ও রাজনৈতিক উচ্চারণে। একে নারীবাদী প্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সেই কবে গ্রিক সমাজে নারীর পশ্চাদপদ অবস্থার সময়ে দার্শনিক প্লেটো তাঁর আদর্শ প্রজাতন্ত্রে কবিদের স্থান না দিলেও নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষাদানের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাতে সেখানে নারীর অবস্থার কোনো হেরফের ঘটে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘকাল পর ইউরোপীয় রেনেসাঁস সমাজে-সংস্কৃতিতে, এমনকি সীমাবদ্ধভাবে ধর্মভাবনায়ও অগ্রসর চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমাজে নারীর অবস্থানে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। যদি পারত তাহলে কি ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার পেতে কয়েক শতক সময় লাগে ? মানবাধিকার কি নারীর স্বাধিকার থেকে ভিন্ন কিছু ? তবু স্বীকার করতে হয় যে, রেনেসাঁসের সুফল হিসেবেই সাহিত্যে বা ব্যক্তিচিন্তার প্রকাশে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিক অধিকারের দাবি উচ্চারিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পুরুষশাসিত সমাজ বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একদেশদর্শিতা নিয়ে, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে।

ঐ একদেশদর্শিতা বস্তুত সমাজে, পরিবারে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অধিকারের প্রশ্নে। তবে সেসব প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে সময় কম লাগে নি। আঠারো শতকের শেষদিকে (১৭৯২) মেরি উলস্টোনক্র্যাফটের রচনা (Vindication of the rights of women) নারীর সামাজিক দুর্দশা সম্পর্কে, এমনকি ফরাসি দার্শনিক রুশোর নারীবিরোধী বক্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সে গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'ক্রিমিনালস, ইডিয়টস, উত্তমেন অ্যান্ড মাইনরস : ইজ দিস ক্লাসিফিকেশন সাউন্ড' গ্রন্থটির লেখক ফ্রান্সেস পাওয়ার কব। তেমনি গুরুত্বপূর্ণ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'দ্য সাবজেকশন অব উওমেন' (১৮৬৯) বইটি। মিল সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতির মতো সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারেব দাবি তোলেন তাঁর বইতে।

তাঁর মতে, মেয়েরা পিছিয়ে থাকার ফলে শুধু যে নারীসমাজের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, সমাজও সেই সঙ্গে পিছিয়ে পড়ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে মানবজাতির অগ্রগতি। সাহিত্যও সে নারীবাদী চিন্তার প্রভাব থেকে বাদ পড়ে নি। প্রমাণ হেনরিখ ইবসেনের 'A Doll's House' নাটক (১৮৭৯)। নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার ও স্বাতন্ত্র্যবোধের টানে নায়িকা নোরা স্বামীর ঘর ছেড়েছে, ছেড়েছে সংসার, স্বামী ও সন্তানের আকর্ষণ। স্বামীর অধীনে নোরা পুতুলের মতো সাজানো সংসারে বসবাস করতে চায় নি। তাই তাঁর ঘর ছাড়া। সে গৃহত্যাগে দ্বিতীয় প্রেমের আকর্ষণ প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থিত ছিল না।

যেমন ছিল টলস্টয়ের 'আন্না কারেনিনা'র (১৮৭৬) নায়িকার ক্ষেত্রে। আন্নার ক্ষেত্রে স্বামীর পরিবর্তে ভিন্ন পুরুষের প্রেমের টানই ছিল বড় যে কারণে আন্না স্বামী, ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়। প্রেম সম্পর্কে মোহ মুক্তির পর ঘরে ফেরার উপায় ছিল না আন্নার, তাই তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। আবার একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এ সূর্যমুখী ঘর ছেড়েছিল। কিন্তু তা ব্যক্তিচেতনার তাড়নায় নয়, বরং স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে স্বামীর প্রতি অভিমানে। পরে লেখক নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের মিলন ঘটালেন। তাই এক্ষেত্রে ঘরছাড়ার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে নারীস্বাধীনতার বিষয়টি পরিস্ফুট নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ সূত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা তথা রেনেসাঁসের প্রভাব বাঙালি শিক্ষিত সমাজে চিন্তা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে (যা উনিশ শতকীয় নবজাগরণ তথা রেনেসাঁস হিসেবে পরিচিত) তা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ, এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে তা সমাজের মূল স্রোত ব্যাপক ও গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। তাছাড়া সেখানে প্রাচীন মূল্যবোধ, অন্ধ সংস্কার, সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণা ও গোঁড়ামি যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিত ছিল। স্পষ্টতই ছিল দুই ভিন্ন স্রোতের উপস্থিতি যেখানে আধুনিক চিন্তা ও উদার মানবিক চেতনার প্রকাশ ছিল গৌণ।

সমাজে বিধবা নির্যাতন, সতীদাহ বা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ছাড়াও নানা সামাজিক অনাচার নারীজীবন বিষময় করে তুলেছিল। কৌলীন্যপ্রথা কুলীন তরুণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে, অবিবাহিতা কুলীনকন্যার সদগতির জন্য বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ তো প্রবাদপ্রতিম বিষয় হয়ে উঠেছিল। এসব কারণে বিদ্যাসাগর বা রামমোহন ছাড়াও সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনে যেমন ব্রাহ্ম সমাজগোষ্ঠীর উদ্ভব, তেমনি কেশবচন্দ্র সেনের নারীমঙ্গল উদ্যোগের পাশাপাশি অনুরূপ ভাবনায় নারীপ্রগতির আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে মূলত কিছু সংখ্যক সমাজসচেতন যুবকের চেষ্টায়।

বিক্রমপুর নিবাসী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা (১৮৬৯) এবং অবিবাহিতা কুলীন কন্যাদের জীবনরক্ষার চেষ্টায় তার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এক অর্থে নারীমুক্তিরই বিশেষ উদ্যোগ বলা যায়। নারীর অধিকার রক্ষায় 'অবলাবান্ধব' বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর ভাষায় 'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়... অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ববঙ্গের যুবকদিগের নেতা স্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন' (শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত)।

শুধু সামাজিক কুপ্রথার প্রতিকারই নয়, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও সচেতন যুব সমাজের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এদের চেষ্টায় ১৮৭০-৭১ সালের সমকালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নারীপ্রগতি ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য একাধিক সামাজিক সংগঠন স্থাপিত হয়, এমনকি কলকাতায় পূর্ববঙ্গীয় যুবকদের নিয়ে একটি 'সম্মিলনী' সভা গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য নারীশিক্ষার বিস্তার, বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা নিরোধ, নারীর সামাজিক অবস্থান ও নৈতিক উন্নয়নে সাহায্যদান।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে নারীর ব্যক্তিক ও মানবিক অধিকার অর্জনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষার সঙ্গেও রয়েছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার আত্মিক সম্পর্ক। অবশ্য একালে ছোটখাট অর্থকরী কর্মতৎপরতা ও ছোটখাট কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভরহীন নারীদের অনেকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রধান সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচিত নয়।

তবু মানসিক শক্তি অর্জন, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন, অন্ধতা ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্তির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক গভীর। এজন্যই সমাজে নারীস্বাধিকারের প্রেক্ষাপটে নারীশিক্ষার বিষয়টি বরাবর গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সমাজে নারীপ্রগতি ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী ও পুরুষ এদেশে সেই উনিশ শতক থেকেই নারীশিক্ষার প্রয়োজন ও সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে এসেছেন। এসব কারণে একালে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনগুলোতে নারীশিক্ষা মানবাধিকারের পাশাপাশি যথাযথ তাৎপর্য নিয়ে আলোচিত হচ্ছে।

এমনকি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে নারীপ্রগতি ও নারীআন্দোলনের ইতিহাস-পাঠের বিষয়টি যা সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষ সবার পক্ষেই জানা আবশ্যিক বলে মনে করা হয়। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনগুলোতে নারীবিষয়ক সামাজিক সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে নানা ধরনের প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার সূচনা দেখা যাচ্ছে। যেমন ১৯৯৫ সালের বেইজিং নারীসম্মেলনে বিশ্বজুড়ে শিক্ষাক্রমে নারীবিষয়ক অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বেশ জোরেসোরেই রাখা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বে (অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোসহ) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ শ্রম, অর্থ, জনশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও মনে রাখা দরকার যে নারী-অধিকার ঐ মানবাধিকারের অংশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নারী-অধিকার রক্ষার বিষয়টি সামাজিক ও পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবের কারণে বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। আমরা কাগজে-কলমে বা নীতিগতভাবে যা-ই বলি না কেন, ঢালাওভাবে মানবাধিকারের প্রশ্নে পুরুষের অধিকার যতটা প্রাধান্য পাবে নারীর অধিকার বিশেষ বিবেচনা বাদে ততটা প্রাধান্য বা গুরুত্ব না পাওয়ারই কথা। এ জন্যই বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজন বহুকাল থেকে গুরুত্ব পেয়ে আসছে, যেমন অনুন্নত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তেমনি শিক্ষায় পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। নারীশ্রেণী সম্পর্কেও একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন নিঃসন্দেহে যুক্তিসম্মত।

তাই স্বীকার করতেই হয় নারীস্বাধিকার ও নারী প্রগতির বিষয়টি বস্তুত বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি যেমন জড়িত তেমনি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ও সমান গুরুত্বে সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত বিভিন্ন পথে আলোকিত যাত্রায় এগিয়ে যেতে না পারলে নারীস্বাধিকার অর্জন অন্ধকারেই থেকে যাবে। এর আরেকটি কারণ দীর্ঘকাল থেকে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবল ঐতিহ্য তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে, তার বিপুল অন্ধকার নিয়ে মানবসমাজে— নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে পরাক্রমী উপাদান হিসেবে উপস্থিত। এখানে সংস্কার সাধন বা নব্যচিন্তার আলো পৌঁছে দেওয়া খুব কঠিন কাজ। আধুনিকতার সঙ্গে সে জন্যই সনাতনপন্থার বিরোধ মৌলিক এবং তা দীর্ঘকালের ট্র্যাডিশন হিসেবে চলে আসছে। সে ক্ষেত্রে সব ধর্মেরই কম বেশি একই ভূমিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ অচলায়তন ভাঙার প্রশ্নেও ঘুরে ফিরে শিক্ষা তথা সুশিক্ষা, সচেতন শিক্ষার গুরুত্ব উঠে আসে, বিশেষ করে নারীশিক্ষার বিষয়টি উনিশ শতকে নবজাগরণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সমাজের সচেতন অংশে নারীশিক্ষার তাৎপর্য বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছিল। যে জন্য রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতার মধ্যেই নারীশিক্ষা সম্পর্কে ঠাকুরবাড়ি ও অন্যান্য পরিবার বিশেষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যেমন তা ছিল ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় তেমনি বেশ কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

এ সম্পর্কে কিছু ব্যক্তির কর্মোদ্যমের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণে বঙ্গে হিন্দুসমাজ এগিয়ে ছিল বলে সেখানে ঐ প্রচেষ্টা যতটা বিস্তৃতি পেয়েছিল মুসলমান সমাজে তা ছিল না। ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজে সাধারণ অশিক্ষা থেকে অন্ধসংস্কারের প্রভাব ছিল প্রবল। আর নারীদের ক্ষেত্রে ঐ দুর্দশার সীমা নির্ধারণ অসম্ভব বলা চলে। এ অবস্থায় যেখানে হিন্দুসমাজে নবজাগরণের প্রভাবে ধর্মবাদিতার মধ্যেও শিক্ষার (নারী শিক্ষাও) আলো জ্বলছে সেখানে উনিশ শতকের মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার নবজাগরণের বদলে ধর্মীয় শিক্ষার টানে মক্তব-মাদ্রাসার প্রভাব বড় হয়ে দেখা দেয়, যা তাদের সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে জ্বালানি যোগ করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমান পরিচালিত সাময়িকপত্রের বড়সড় অংশ।

শিক্ষা ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের এ পিছিয়ে পড়ার জন্য 'শিখা' গোষ্ঠীর অন্যতম ধীমান কাজী আবদুল ওদুদ জামালউদ্দিন আফগানি থেকে সনাতনপন্থী নবাব-জমিদার, বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক ও মোল্লামৌলবিদের দায়ী করেছেন। এ ধারা পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দিকেও লক্ষ করা গেছে। যশোরের মুন্সী মেহেরুল্লাহ থেকে ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ এমনকি আধুনিক কালের মৌলানা আকরম খাঁ পর্যন্ত অনেকেই ধর্মীয় শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আধুনিক শিক্ষার সম্ভাবনা পিছে ঠেলে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নারীশিক্ষার হাল যে কেমন হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ অবস্থার মধ্যে মুসলমান সমাজে শিক্ষা ও আধুনিকতার চেতনার বিস্তার ঘটাতে দু'চারজন হলেও উদ্যোগী ব্যক্তির দেখা মেলে। উনিশ শতকে *বিষাদ সিন্ধু* লেখক স্বনামখ্যাত মীর মশাররফ হোসেন মূলত সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষা ও আধুনিক চেতনার পক্ষে অবদান রেখেছেন। রেখেছেন চিন্তাবিদ আবদুর রহিম (১৭৮৫-১৮৫৩) কিংবা মুক্তচিন্তার ধারক যুক্তিবাদী দেলওয়ার হোসেন (১৮৪০-১৯১৩)। শেষোক্তজন ছিলেন বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষার পক্ষে এক আপোসহীন সৈনিক। বিশ শতকে কবি কাজী নজরুল ইসলাম থেকে কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেনসহ একাধিক লেখক-বুদ্ধিজীবী মুসলমান সমাজকে শিক্ষায় ও মুক্তচেতনার দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা সাধারণভাবে সমাজে শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর পক্ষে কথা বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা নারীশিক্ষারও প্রবক্তা ছিলেন। তবে বিশেষভাবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে কয়েকজন নারী-ব্যক্তিত্ব উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের শুরুতে নিজ নিজ সময় পরিসরে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে (নবাব) ফয়জন্নেছা চৌধুরানী (১৮৪০-১৯০৩) কিংবা একালে বহু-আলোচিত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ফয়জন্নেছা সাহিত্য, সঙ্গীত ও জ্ঞানচর্চায় অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় রেখেছিলেন (মনিরুজ্জামান)। তবে নারীশিক্ষায় (আধুনিক শিক্ষায়) তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৩) ফয়জন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নারী শিক্ষালয়সহ) তার নারীহিতৈষণা-সমাজহিতৈষণার সাক্ষী। যে-সময় মুসলমান সমাজে ছেলেরাই আধুনিক শিক্ষায় এগিয়ে আসতে চায় নি সে-সময় নারীশিক্ষার জন্য ছাত্রী নিবাস, বৃত্তি ইত্যাদি ব্যবস্থা করার মধ্যে ফয়জন্নেছার সমাজচেতনার ও দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে 'সখি সমিতি'র সদস্যা হওয়ার উপলক্ষে তার পরিচয় ঘটেছিল বলে জানা যায়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অবশ্য নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখন কিংবদন্তি বা 'মিথ' হিসেবে গণ্য। আটাশ বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পর বাকি জীবন আধুনিক চেতনার এই বিদুষী নারী (ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় শিক্ষিত) শুধু নারীশিক্ষার বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করেন তাই নয়, সারাজীবন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, কুশিক্ষা এবং অনুরূপ রক্ষণশীল উপসর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' থেকে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন' নামক মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বেগম রোকেয়া মুসলমান নারীদের মধ্যে আধুনিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিও এদিক থেকে ছিল একই প্রেরণার পরোক্ষ উৎস। এদের পথ অনুসরণ করে বিশ শতকে নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার চর্চা ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে, তবে সন্দেহ নেই তা প্রথম দিকে 'হাঁটিহাঁটি পা পা' করে বড় ধীরগতিতে চলেছে।

তিন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শুধু বঙ্গদেশেই নয়, মহারাষ্ট্রেও পণ্ডিত রমাবাই নারীপ্রগতি ও নারীমঙ্গল কর্মসূচি নিয়ে নারীর স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রায় একই সময় (১৮৮২) কাজ শুরু করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশেও ভ্রমণ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বের ওপর বক্তৃতা করেন। বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে নারীস্বাধিকারের এ আন্দোলন সামাজিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও নারীরা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ডেলিগেট হিসেবে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী কাদম্বিনী দেবী, পূর্বোক্ত রমাবাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নি স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখের উপস্থিতি। এক বছর পর জাতীয় কংগ্রেস নীতিগতভাবে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধিকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে সে সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত্র ঘটায়। এসব বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায়ও বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বে ধৃত।

বাংলায় উনিশ শতকের রেনেসাঁস তথা নবজাগরণ ধর্মীয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা ঘটালেও এর সুফল মূলত সীমাবদ্ধ ছিল পুরুষ সমাজে এবং উচ্চবর্ণে। নারী সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে এর সুফল সামান্যই পেয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্যের মূলধারায় তাই নারীপ্রগতির পক্ষে প্রত্যাশিত প্রতিবাদী প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম। মাইকেল মধুসূদনের রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১) প্রমীলা চরিত্র কিংবা একই লেখকের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের (১৮৬২) কিছু সংখ্যক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা ও প্রতিবাদী মানসিকতা এক অর্থে ব্যতিক্রমী ঘটনা।

কারণ উনিশ শতকে কথাসাহিত্যের মূল ধারায় রচিত নারীচরিত্রগুলোকে একদিকে প্রাচীন ভারতের সনাতনী আদর্শের ছাঁচে গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যদিকে দেখা গেছে সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে আপোসবাদিতা। ব্যতিক্রমী চরিত্রগুলো লেখকের কালো কালিতে চিত্রিত, যেমন *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এ রোহিণী চরিত্র। তাছাড়া সতীত্ব-পত্নীত্বের প্রথাসিদ্ধ প্রকাশ তো আছেই।

রাজনৈতিক অঙ্গনে— জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থী তথা বিপ্লববাদী আন্দোলনে কিছুসংখ্যক নারীর সাহসী ভূমিকা নিছক ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল, সেখানে সমাজপ্রগতির সাধারণ প্রভাব নেই বললে চলে। অন্যদিকে এদের বীরত্ব, সাহস, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজে নারীস্বাধীনতার বোধ জাগিয়ে তুলতে বা নারীজাগরণ ঘটাতে বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে নি। এর সুপ্রভাব রাজনীতিক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে।

আরো একটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে নারীস্বাধিকার, সমাজের ও পরিবারের অন্যায় বন্ধন ও নির্যাতন থেকে নারীমুক্তির প্রশ্নটি নারীদের কাছেই ছিল বিতর্কিত। দীর্ঘসময়ের শ্যাওলাপড়া ঐতিহ্য তাদের চেতনায় এমন গভীর প্রভাব রেখেছিল যেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীসমাজ ঘরের অন্ধকার আশ্রয়েই নিজেকে সুখী ভাবতে চেষ্টা করেছে। অথবা এ অব্যবস্থা বিধাতার দান বা ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে, দু'চারজন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বা বেগম রোকেয়া বা রমাবাই বা লীলা রায় ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিতে হয়। তারা নিজ (নারী) সমাজেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, আর রক্ষণশীল পুরুষসমাজ থেকে সমালোচনাই নয়, এদের ওপর আঘাতই বরং এসেছে তীব্র হয়ে। একুশ শতকে পৌঁছেও ঐ অবস্থার কতটা পরিবর্তন ঘটেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে আধুনিক ও উদারমানবিক চেতনার যেসব পুরুষ নারীস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছেন, সংখ্যায় তারা কিন্তু বেশি নন। তাদের মধ্যে স্ববিরোধিতার প্রকাশও নিতান্ত কম নয়। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা ও সনাতন ঐতিহ্যের পিছুটান সম্ভবত এর অন্যতম কারণ। নারীদেহের ওপর অধিকার যে একান্তভাবে ব্যক্তিনারীরই এখতিয়ারে এমন ধারণার প্রকাশ বা বিকাশ বড় একটা দেখা যায় নি নারী আন্দোলনের সূচনা লগ্নে। তখন নারীবাদী আন্দোলনের মূল উচ্চারণগুলো আলোয় আসে নি।

বরং পত্নীত্ব-সতীত্ব পারিবারিক শুচিতা এবং জায়া-জননীর পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব যেমন নারী তেমনি পুরুষদেরও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মূলত সনাতনী ঐতিহ্যের প্রভাবে। এ প্রভাব লেখক বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ অধিকাংশের মধ্যে কমবেশি দেখা গেছে। তারা ঐ সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলতার প্রভাববলয় পুরোপুরি ভাঙতে পারেন নি। আশ্চর্য যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে ঐ সনাতনী প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি।

সব কিছু মিলে নারী-পুরুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মোটা হিসাবে নারীস্বাধীনতা ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পক্ষে ছিল না। সনাতনবোধের অচলায়তন ভাঙতে তাদের বড় একটা উৎসাহ বা আগ্রহ দেখা যায় নি। তা না হলে ১৯২১ সালে পৌঁছেও বঙ্গীয় আইন সভায় নারীর ভোটাধিকার প্রস্তাব বাতিল হয় কীভাবে? এ অধিকার পেতে তাদের আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয় কেন?

এ বাস্তবতা বিশ শতক অতিক্রম করেও সত্য হয়ে আছে, যদিও সাহিত্যে অনেক ব্যতিক্রম, অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটেছে নায়িকা চরিত্রে খোলনলচে বদল। এর কারণ যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব তেমনি বিশ্বব্যাপী নারী অধিকারবিষয়ক সচেতনতা ও আন্দোলন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানামঞ্চে নারীর অধিকার নিয়ে নানামাত্রিক ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী উচ্চারণ শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে।

তাই যুক্তিসঙ্গত দাবিই উঠেছে আন্তর্জাতিক নারী-স্বাধিকার বিষয়ক সম্মেলনগুলোতে। নাইরোবি, কায়রো, বেইজিং প্রতিটি সম্মেলন কেন্দ্রেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ওপর অবিচার ও নির্যাতনের বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উত্থাপিত হচ্ছে, পাস হচ্ছে, হাততালি পড়ছে। সন্দেহ নেই নারী-স্বাধিকার আন্দোলন শক্তি অর্জন করছে, তার স্পর্শ লাগছে বিশ্বসমাজের গায়, বিশ্ববিবেক সচেতন হতে শুরু করেছে, তবে সেখানে তাত্ত্বিক দিকটাই প্রধান। তুলনায় বাস্তব অর্জন যে কম সে কথা অস্বীকারের উপায় নেই।

কারণ বিশ্বজুড়ে নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকারের বিষয় নিয়ে, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয় নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও সমাজে নারীর অধিকার এখনো বড় একটা জায়গা দখল করে নিতে পারে নি, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে। আর ভারতীয় উপমহাদেশ এ পিছুটানের বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। বিশ শতকী আধুনিকতার চোখ-ঝলসানির পাশাপাশি এখনো রাজস্থানে রূপকানোয়ারের মতো রূপবতী নারীকে সহমরণে যেতে হয়, সত্যিকার অর্থে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়। শাহবানু'র খোরপোষ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাথমিক নির্দেশের ওপর রক্ষণশীল সমাজপতিদের আঘাতই জয়ী হয়। এ জাতীয় ঘটনার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আর বাংলাদেশ সম্ভবত নানামাত্রিক নারীনির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কথিত আধুনিক সমাজেও যৌতুকের দাবির বর্বরতায় প্রাণ হারাচ্ছে শত শত নারী, এসিডে ঝলসে যাচ্ছে তাদের চোখ মুখ শরীর। ধর্ষণ, পীড়ন আর গ্রামাঞ্চলে ফতোয়াবাজির শিকার নারী নিত্য খবর হয়ে উঠছে, সমাজের সচেতন অংশ অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সুবিচারের বিরুদ্ধেই স্লোগান উঠছে রক্ষণশীলদের কণ্ঠ থেকে। মনে হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার এ যুগের নারী, আধুনিক যুগের নারী।

ভাবতে অবাকই লাগে যে বিশ শতকের আধুনিক চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনার পরিবেশেও নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা হালে পানি পায় নি।

শিক্ষিত সমাজেও নারীর আপন যোগ্যতায় উচ্চাসনে অবস্থান পুরুষ (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) সাদা মনে গ্রহণ করতে পারছে না। সমাজে নারীর অবস্থান এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীতে— এমন অভিযোগ সম্ভবত অন্যায্য বলে মনে হবে না। তবে সমাজে, রাজনীতিতে যেমনই হোক বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যে বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়ে চলেছে, যেমন চরিত্র চিত্রণে তেমনি ঘটনাবলি বা কাহিনীর উপস্থাপনায়। এটুকুই আধুনিকতার সুফল বলা চলে।

অন্যদিকে নারীআন্দোলন সংগঠনগত দিক থেকে ক্রমে জোরদার হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সমাজে এর বস্তুগত প্রভাব কেন জানি ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠছে না, কোথায় যেন শূন্যতা বা স্ববিরোধিতা বিরাজ করছে। গভীর বিশ্লেষণে হয়তো এর তাৎপর্য ধরা পড়বে। আর এ কারণেই দূর অতীতের দিকে তাকানোর প্রয়োজন। প্রয়োজন কালপ্রবাহে ঐতিহ্যধারা বিষয়টিকে কতটা প্রভাবিত করেছে তা দেখে নেয়া উচিত, তাতে অনেক অপ্রিয় সত্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যেমন সনাতন ঐতিহ্য বা প্রাচীন সামাজিক প্রথা কিংবা ধর্মীয় অনুশাসন (সব ধর্মের ক্ষেত্রেই কম বেশি প্রযোজ্য) বা ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত উপস্থাপনা সমাজে নারীদের অবস্থান দ্বিতীয় সারিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে, তেমনিভাবে দেখার বিষয় যে এক্ষেত্রে পুরুষের অচেতন বা সচেতন ভূমিকা কতটা সক্রিয় প্রভাব রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষ সমাজ যদি বাস্তবিকই নারী-স্বাধীনতার পক্ষে, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে আন্তরিক হতো তাহলে কাজটা এত ধীরগতির হতো না, এতটা সময় নিত না সমাজে নারীর যুক্তিসঙ্গত অবস্থান নিশ্চিত হতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীচেতনার মতো লিঙ্গচেতনা সম্ভবত পুরুষের মধ্যে একটি প্রবল উপকরণ হিসেবে উপস্থিত। এটাও একধরনের 'শোভিনিজম' যা যুগ যুগ ধরে পুরুষ বহন করে চলেছে। পুরুষ এ উচ্চমন্যতা ও গরিমাবোধ থেকে মুক্ত হতে না পারলে, অন্তত গরিষ্ঠসংখ্যক মুক্ত হতে না পারলে এদেশে নারীস্বাধিকার অর্জনের কাজ মোটেই সহজ হবে না। অন্যদিকে এ বিষয়ে শিক্ষিত, সচেতন নারীর ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। লোকদেখানো নারীবাদ বা নারীবাদী ভূমিকার 'ফ্যাশন শো' সত্যিকার নারীআন্দোলনের ক্ষতিই করে চলেছে। এদেশে তেমন উদাহরণ একেবারে অনুপস্থিত নয়। আত্মপ্রচারে প্রগলভ নারীস্বাধিকারের প্রবক্তা দু'একজন নারী নারীবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করেছে যা এক সময় যথেষ্ট আলোচিতও হয়েছে। বড় কথা, পুরুষ বা নারী উভয়ের পক্ষেই 'জেন্ডার কমপ্লেক্স' লালন সামাজিক অগ্রগতির বিরোধী, আর নারীস্বাধিকারের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা
অতীত থেকে বর্তমানে

নৃতাত্ত্বিক-পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় এ সত্য এখন স্বীকৃত যে মানবজীবন ও সভ্যতার শুরুতে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর কর্তৃত্ব ও অধিকার ছিল সুস্পষ্ট। যৌনমিলন ও সন্তানধারণের স্বাধীনতা এবং পিতৃপরিচয়ের বিষয়টি তখন পুরোপুরি নারীর এখতিয়ারে ছিল। সম্ভবত সন্তানধারণ ও লালনপালনের দায়িত্ব কাঁধে থাকা এবং দৈহিক শক্তিতে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার রশিটা নারীর হাত থেকে শক্তিমান পুরুষের হাতে চলে যায়। নারী সে অধিকার আর ফিরে পায় নি। সমাজতত্ত্ববিদগণ এখনো উদাহরণ ও ঐতিহ্য প্রমাণ হিসেবে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ক্ষীয়মান মাতৃতান্ত্রিকতা তথা পরিবারে নারীর প্রভাব, অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। বিবাহিতা হিন্দুনারীর হাতে লোহা বা শাঁখা পরিধান কি প্রাগৈতিহাসিক নারীর বন্দিত্বদশার প্রতীক? বিশ্বের সর্বত্রই আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির স্পর্শ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার ফলে তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। প্রচলিত নারীস্বাধিকারের ক্ষেত্রেও সে প্রভাব দেখা যাচ্ছে যদিও নারীর কাজকর্মের দায়দায়িত্ব আগের মতোই রয়ে গেছে। তাহলে কি স্বীকার করতে হয় যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে নারীর পারিবারিক-সামাজিক অধিকার হরণ ও পুরুষের একাধিপত্যের বিষয়টি জড়িত? ইতিহাস তেমন কথাই বলে।

ভারতে আর্যপূর্ব সিন্ধু সভ্যতায় সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা জানার বড় একটা উপায় নেই। সিন্ধুলিপির মর্মোদ্ধার করতে না পারা এর অন্যতম কারণ। পরবর্তীকালে যাযাবর আর্য সমাজে যতদূর জানা যায় নারীরস্বাধিকার একেবারে অস্বীকৃত ছিল না। বৈদিক সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে যেমনই হোক পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের কাল থেকে নারীর অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে।

গবেষক সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, 'শিক্ষায় নারীর অধিকারকে শাস্ত্র স্বীকার করে নি' ('প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', ভারত ইতিহাসে নারী, পৃষ্ঠা ৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু শিক্ষাগ্রহণের অধিকারই নয়, পরিবারে ও সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর স্বাধীনতাও ছিল অস্বীকৃত। উক্ত লেখিকার মতে, "বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগে নারী প্রধানত বধূরূপেই চিত্রিত।... নারীকে বধূ ও জননী ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় দেখা হয় নি।... মনুসংহিতায় বলা হয়েছে 'নারীর পক্ষে বিবাহই হলো উপনয়ন, পতিসেবা, বেদধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস' (২/৬৭)। অর্থাৎ নারীর পক্ষে বিবাহ এবং স্বামী, সন্তান ও শ্বশুরালয়ে সকলের পরিচর্যাই বিদ্যাশিক্ষার বিকল্প, অতএব সত্যিকার বিদ্যাশিক্ষা থেকে সে বঞ্চিত, এ কথাই প্রতিষ্ঠিত হলো।... শিক্ষার অধিকার না থাকায় স্বাধীন কোনো বৃত্তির অধিকারও তার ছিল না, ফলে কোনো না কোনো পুরুষের ওপর একান্ত নির্ভরশীল থাকতে সে বাধ্য হতো" (প্রাগুক্ত পৃ: ৫)। রবীন্দ্রনাথ কি বেদ ও মনুসংহিতার প্রভাবে নারী সম্পর্কে পূর্বোক্ত ধারণা পরম জ্ঞান করেছিলেন?

বৈদিক যুগের শুরুতে নারীর পক্ষে সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার থাকলেও পরে সে স্বাধীনতা তার থাকে নি। এমনকি 'গৃহকর্মই বিবাহিতা নারীর একান্ত করণীয়, বাইরের জগতে তার চলাফেরা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। বৈদিকযুগে রাষ্ট্রের যে দু'টি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা ছিল, সভা ও সমিতি, নারী তাতে অংশগ্রহণ করতে পারত না। (মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪/৭/৪)'। পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারও নারীর ছিল না।

অন্যদিকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার পুরুষের ছিল, কিন্তু নারীর তা ছিল না। ঋগ্বেদের কাল থেকেই তা দেখা যায়। শতপথব্রাহ্মণ থেকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষের বহুবিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন শেষোক্ত ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'যদিও একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে তথাপি একটি নারীর পক্ষে একজন পুরুষই যথেষ্ট (৩/৫/৪৭, প্রাগুক্ত)'। বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তী কালেও এভাবেই নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারগুলো ক্ষুণ্ণই নয়, নষ্ট করা হয়েছে।

আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় 'যে স্বামীকে প্রসন্ন করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে না' (অথর্ববেদ, ১১/৫/১৮ সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত পৃ: ১০)। বৈদিক সমাজের রীতিপ্রথার কারণে পুত্রসন্তানের জন্যই নারীর প্রয়োজন, আর প্রয়োজন যৌন সম্ভোগের পরিতৃপ্তির জন্য। এমন সমাজে নারীর অবস্থান যে পুরুষের নিচে হবে তা বলাই বাহুল্য। এভাবেই বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজে নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে।

নারী শুধু পুরুষের সম্পত্তিই নয়, বিষয়-সম্পত্তিতেও নারীর অধিকার অস্বীকৃত হয়ে উঠেছিল। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটার পর থেকে বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে পুরুষ। এ দিক থেকে নারী ও শূদ্র সমপর্যায়ের। তা হলে বলতে হয় দাস শূদ্রের মতো নারীও পুরুষের দাসী (অন্য ভাষায় পুরুষশাসিত সমাজের দাসী হিসেবে গণ্য)। সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'সব শাস্ত্রেই বারবার নারী ও শূদ্রকে একই বন্ধনীতে রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ করা হয়েছে তারা উভয়েই সম্পত্তি, তাই তাদের সম্পত্তিতে অধিকার নেই। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই।' অবশ্য ইসলামি বিধানে নারীর সম্পত্তির অধিকার পুরুষের সমান না হলেও অংশত স্বীকৃত।

বিষয়-সম্পত্তির ওপর অধিকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও নারী যে পুরুষের সম্পত্তি তথা ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য সে সূত্রের জের ধরে বলা চলে যে সেকালে 'নিজের দেহের উপরও নারীর অধিকার ছিল না।' সে অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলেই একালে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি নিজ দেহের ওপর নারীর নিঃশর্ত অধিকার। নারীর দেহসম্ভোগের বিষয়ে অবস্থা এমনই ছিল যে সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায় 'সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে তাকে কিনে ফেলার চেষ্টা করতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে হবে'। আশ্চর্য যে এ বিধান উপনিষদের পূজ্য ঋষি যাজ্ঞবল্কের (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।

আর এক হাজার বছরেরও পর বিভিন্ন দিক থেকে উদার সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম। এখানেও পবিত্রগ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে 'নারীদের পরিচালক হচ্ছে পুরুষরাই। কারণ, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একে অন্যের উপরে মর্যাদা দান করেছেন', অর্থাৎ পুরুষ নারীর চেয়ে উচ্চমর্যাদার (সুরা নিসা, ষষ্ঠ রুকু, ৩৪ সংখ্যক আয়াত)। আর স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে বিধানও প্রায় অনুরূপ। পূর্বোক্ত আয়াতেই বলা হয়েছে অবাধ্য স্ত্রীকে উপদেশ দানের কথা, এরপর বিছানা আলাদা করার কথা, এরপর প্রহারের কথা। এরপর স্ত্রী অনুগত হলে অন্যপথ না ধরার কথা।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্বই রক্ষিত হয়েছে, নারী সেখানে অবিচারের শিকার। তাই ব্যভিচারী নারীর জন্য সমাজে বিধান নির্মম হলেও পুরুষের জন্য তা খুবই সহজ, স্বচ্ছন্দ। যুগের পর যুগ সমাজ ও সমাজপতিদের কল্যাণে সামাজিক বিধি বিধানের নির্মমতা বেড়েছে অসহায় নারীকে ঘিরে, পুরুষশাসিত সমাজে এমনটাই খুব স্বাভাবিক। সাহিত্যেও ব্যবস্থাটা যে ভিন্ন হয়ে ওঠে নি এটাই পরম বিস্ময়ের কথা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর দুরবস্থা সর্বত্র।

'উত্তর-বৈদিক সাহিত্য থেকে মহাকাব্য যুগ পর্যন্ত নারী ভোগ্যবস্তু, ...জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর রূপ এই উত্তরবৈদিক যুগের চিত্রেরই অনুবৃত্তি' (প্রাগুক্ত)। বাৎসায়নের কামসূত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'নারী পণ্যদ্রব্যের মতো।' অন্যদিকে 'নারী জন্মসূত্রেই হীন' এমন ধারণা রয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে। মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহ ভীষ্মের মতে 'নারীজন্ম অভিশাপের ফল ও পুরুষজন্ম পূর্বজন্মের পুণ্যের পুরস্কার।' আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তো বলেই দিয়েছিলেন, 'নারী সর্ব পাপের দ্বার।'

'নারী নরকের দ্বার'— বহু উচ্চারিত এ তত্ত্বের বিপরীতে বলা চলে যে নারী ব্যতীত পুরুষের যৌনসম্ভোগের পরিতৃপ্তি ঘটে না, মেলে না পুত্র সন্তানের দেখা, যে-পুত্র না হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ তথা পিতার ইহজাগতিক ও পারলৌকিক প্রয়োজন সম্পন্ন হয় না। একমাত্র পুত্রসন্তান তথা উত্তরপুরুষই বিষয়-আশয়, পুরুষাণুক্রম ও ঐতিহ্য রক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর নারীই ঐ অপরিহার্য সন্তানের জন্মদাত্রী। তা সত্ত্বেও নারীকে অবমাননাকর, নিচু অবস্থানে ঠেলে দেওয়ার মতো উদ্ভট স্ববিরোধিতা বৈদিক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে নির্বিচারে উপস্থিত ছিল। কোনো ধীমান শাস্ত্রজ্ঞ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। সাহিত্যিকও এ সত্যই মেনে নিয়েছেন। নারী তাই 'রমণী' 'কামিনী' ইত্যাদি যৌনতা-সংশ্লিষ্ট নামে পরিচিত, পুরুষের ক্ষেত্রে এমন উদ্ভটত্বের বালাই নেই।

মনে হয় পুরুষের সম্ভোগবাসনা, যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যই নারীর জন্ম ও জীবনযাপন। আর এ ভূমিকাতেই নারীজনমের সার্থকতা।

দুই

মধ্যযুগে পৌঁছেও নারীর এ অধস্তন অবস্থানের অবসান ঘটে নি। কি উদারচেতা কি রক্ষণশীল শাসন— সব ক্ষেত্রেই নারী গৃহসজ্জায় বন্দি— তার রূপের ও সৌন্দর্যের প্রশংসায় তাকে ভুলিয়ে রাখা— এসব কিছুরই এক উদ্দেশ্য— নারীকে পরিপূর্ণভাবে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা। অথচ যেমনটা আগে বলা হয়েছে, প্রাচীন কৌম সমাজে নারীর অনেকখানি স্বাধীন অবস্থান ছিল। আর্যকরণ, পুরাণ ও স্মৃতির অনুশাসন, সংহিতার কঠোর রীতিনীতি সব কিছু মিলে নারীর সে স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করেছে। চর্যাপদের একাধিক দোঁহায় বাস্তব অবস্থার প্রমাণ মেলে।

পাল শাসনের পর গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনীআমলে বঙ্গে যে রক্ষণশীল ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে তার পরিণামে সমাজে কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা নির্যাতন ও সতীদাহ থেকে বহু অমানবিক ব্যবস্থার পত্তন হয়। বলা যায়, ক্রমে এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। পূর্বোক্ত পুরাণ, মনুসংহিতা, স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে নির্ধারিত অনুশাসনের দায়ে সমাজে ও পরিবারে নারী কঠিন পুরুষশাসনের শিকার হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থান ক্রীতদাসীর পর্যায়ে পৌঁছায়। সতীত্বের কঠোর ধারণার মধ্য দিয়ে যৌনশুচিতার যে আদর্শ নির্ধারিত হয় তা কেবল নারীর পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল, (মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত 'চেস্টিটি বেল্ট' স্মর্তব্য) অথচ পুরুষ এসব বিধিবন্ধন থেকে মুক্ত বলা চলে। ব্যভিচারী পুরুষের জন্য কঠোর সামাজিক শাস্তির কোনো বিধান তখনো ছিল না, এখনো নেই বললে চলে। কিন্তু নারীর জন্য ছিল এবং এখনো আছে।

অবস্থাদৃষ্টে পূর্বোক্ত লেখিকার এমন অভিমত যুক্তিসঙ্গত যে 'স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান নির্ণয় করতে গেলে অসমতা, অবিচার, অত্যাচারের মহাভারত রচনা করা যায়। এই সমাজাদর্শের মূলকথা প্রবল পুরুষের প্রভুত্ব ও দুর্বল নারীর দাসত্ব।' আধুনিককালেও কখনো কখনো বিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় মাতৃভক্ত পুত্রের আপ্লুত কণ্ঠস্বর শোনা যায় : 'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' এমন বক্তব্য ঐ জননী নারীর জন্য কতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমানবিক ও অবমাননাকর সে বোধ নারীকুলে সৃষ্টি হয় নি বলে বধূ নির্যাতনের ঐতিহ্য যেমন শেষ হয় নি তেমনি নারীস্বাধীনতার বিষয়টি বাস্তবের হালে পানি পায় নি। নারীপক্ষে স্বাধিকারের লড়াই এখনো এক অসম লড়াই হিসেবে চলছে। এর জন্য পুরুষ-প্রভুত্ব প্রধানত দায়ী, কিন্তু হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত এক শ্রেণীর নারীও কম দায়ী নন।

আর বিধবা নির্যাতন ? সে যেমন সামাজিক, পারিবারিক পর্যায়ে তেমনি বিধবার জন্য মানসিক স্তরেরও বটে। সব মিলিয়ে সে এক অবিশ্বাস্য অমানবিকতার ইতিহাস। সামাজিক আচারপ্রথা থেকে খাদ্যাখাদ্যের বিধানে বিধবার জন্য শুধু বঞ্চনা ও নিগ্রহই প্রধান হয়ে থেকেছে। এ কালেও সেই জের পুরোপুরি শেষ হয় নি। এ অবস্থা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান, মুসলমান সম্প্রদায় এদিক থেকে ধর্মীয় বিধানের জোরে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা চলে। তবু পাশাপাশি অবস্থানের ফলে পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব কিছুটা পড়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও।

উনিশ শতকের বহুকথিত রেনেসাঁস তথা নবজাগরণের প্রভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহ চালু করতে কী প্রবল সামাজিক লড়াই না করতে হয়েছিল রক্ষণশীল সমাজপতিদের বিরুদ্ধে! সেখানে সাফল্যের তুলনায় ঐ মহৎপ্রাণ ব্যক্তিটির জন্য হতাশাই ছিল বড়। সমাজে বিরাজমান রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির প্রভাব উনিশ শতকের প্রধান সাহিত্যধারায় যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিত ছিল। ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষার নামে মৌলবাদী তথা রক্ষণশীলতার চেতনা উপস্থিত সব ধর্মকেই কম বেশি স্পর্শ করেছে, মুসলমান সম্প্রদায়ও এদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। ধর্মভিত্তিক সংস্কার-আন্দোলনগুলোর চরিত্রধর্মের দিকে তাকালে এমন সত্যই মেনে নিতে হয়।

অবশ্য পাশাপাশি এ কথাও স্বীকার্য যে পনের শতকে সূচিত বাংলায় ভক্তিবাদী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের অনুরূপ ধারায় নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেলেও পারিবারিক স্তরে সে প্রভাব সামান্য দেখা গেছে, এমনকি জীবনযাত্রার চলমান ক্ষেত্রেও তা সত্য। বৈষ্ণব সমাজের আচার-অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে স্বাধীন পরিবেশ উপস্থিত তা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তী দুই তিন শতকে প্রচলিত সহজিয়া সাধনা কিংবা আরো পরে বাউল সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় নারীস্বাধীনতার যে প্রকাশ এবং যৌনশুচিতা ও সতীত্বধারণার সনাতন ঐতিহ্যে যে পরিবর্তন সূচিত তা ঐ বিশেষ গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, তা ব্যাপক জনসমাজে প্রভাব ফেলে নি। অন্যদিকে ঐ সব ক্ষেত্রে যৌনাচারে বাড়াবাড়ি বরং এমন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যে ঐ অনাচার নারীস্বাধীনতার বিষমফল অর্থাৎ স্বাধীনতার কুফল হিসেবে এসেছে। তাই নারী উল্লিখিত স্বাধীনতাভোগের যোগ্য নয়।

অন্যদিকে এদেশে মুসলমান শাসনামলে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি সামাজিক ঔদার্যের নীতিগত প্রতিফলন আশ্চর্যজনকভাবে পুরুষদের মধ্যেই দেখা গেছে সর্বাধিক, নারীসমাজ সেসব সুফলের সামান্যই ভোগ করেছে, গুটিকয় ক্ষেত্রে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্ফুট। বরং সেই সঙ্গে পর্দাপ্রথা, নারীকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা, পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার ও বিবাহ বাতিলের (তালাক দেওয়ার) একাধিপত্য, বাঁদিপ্রথা, বাঁদিবিবাহ, মেয়েদের অশিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নারীসমাজকে পুরুষের তুলনায় অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছে। মুসলমান নারী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের নারীদের থেকেও পিছিয়ে থেকেছে। একমাত্র বিধবা বিবাহের অধিকার (যা হিন্দু সমাজে ছিল না) এবং পিতৃসম্পত্তিতে কিছুটা অধিকার (তা-ও পুরুষের অর্ধেক) ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীস্বাধিকারের প্রতিফলন বড় একটা দেখা যায় না। নারীশিক্ষার অভাব, প্রকৃত সমাজসংস্কারের অনুপস্থিতি, সমাজে মোল্লা-মৌলবিদের কঠোর রক্ষণশীলতা ও ফতোয়াবাজির মতো অনাচারের শিকার হয়েছে নারীসমাজ; যা কিছু সুযোগ-সুবিধা তার সবটাই ধরা থেকেছে পুরুষের হাতে।

তিন

এমনিভাবে হাজার বছরেরও অধিক সময়ের ঐতিহ্যপ্রভাব সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অবস্থানগত ব্যবধান ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাব এবং জায়া-জননীর দায়দায়িত্ব-উপলক্ষে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দিদশা, সতীত্ব-পত্নীত্বের মনভোলানো বুলি ও ব্যবস্থা, সর্বোপরি বাল্যবিবাহ নারীকুলের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের গভীর অন্তরায় হয়ে থেকেছে। নারী হয়ে উঠেছে পরিবারকেন্দ্রিক এক গার্হস্থ্য জীব যার পক্ষে বাইরের জগতে পা রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল না।

হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ে কিছু ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ পুরুষ বা পরিবার-প্রধান নারীশিক্ষা ও তাদের বহির্জগতে বিচরণের বিরোধিতাই করেছে। নারীর স্থান ঘরে, পরিবারের সেবার মধ্যে তার জীবনের সার্থকতা এমন ধারণা পুরুষ বংশানুক্রমে নারীকুলের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সানন্দে মেনে নিয়েছে এবং এভাবে আত্মদানের গৌরবে জীবন সার্থক বলে মনে করেছে। সময় এ পুরুষতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের ভিত ক্রমশ দৃঢ় করে তুলেছে। তৈরি হয়েছে নারীর জীবনযাপন ঘিরে রক্ষণশীলতার এক অচলায়তন। এ অচলায়তন ভাঙার কাজ মোটেই সহজ ছিল না, এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রবল শক্তিমত্তার, অনেকটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মতো শক্তি।

ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে সৃষ্ট বঙ্গীয় এলিট শ্রেণীর সমাজসচেতন অংশ থেকে দু'একজন করে মহৎ ব্যক্তি এ কাজে হাত দেন, তবে শ্রমের তুলনায় সাফল্য ছিল সীমিত। তবু তারা হাল ছাড়েন নি। যেমন সমাজে তেমনি সংস্কৃতিক্ষেত্রে তেমনি শিক্ষায় এক পা দু'পা করে সুস্থ সংস্কারের পথ ধরে নারীপ্রগতি ও নারীস্বাধিকারের যাত্রা শুরু। সাহিত্যক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে মাইকেল মধুসূদন এসব ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। পরবর্তী সময়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঐ ধারার বাহক, তবে কিছুটা সীমাবদ্ধতা নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি নারীসমাজের কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষভাবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন, যে-শিক্ষা ছিল নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে প্রথম ধাপ। এদিক থেকে মুসলমান নারীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারে নবাব ফয়জন্নেছা ও রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দু সমাজে শিক্ষার পাশাপাশি রাজনীতিও স্থান করে নেয়। তাই দেখা যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী বাসন্তী দেবী (১৮৮০), কামিনী রায় (১৮৬৪) বা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী থেকে ঢাকার আশালতা সেন বা লীলা রায় (১৯০০) প্রমুখ নারীশিক্ষার পাশাপাশি নারীদের শাসক-বিরোধী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অনেকখানি সাফল্যও অর্জন করেন, উল্লেখ্য যে, নারীদের ভোটাধিকার দাবির আন্দোলনে কামিনী রায়ের পাশে বেগম রোকেয়াও উপস্থিত ছিলেন। এদের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন যোগান সরলা দেবী (১৮৭২)।

কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে না হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিপ্লববাদী ক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মীয় আবেগ গোটা পরিস্থিতিতে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা ও বিভাজনের জন্ম দেয়, যা স্বাদেশিকতার জন্য মোটেই সুস্থ প্রভাব হিসেবে পরিগণিত হয় নি। হয় নি যেমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেমনি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে। যেমন সমাজের উচ্চস্তরে পুরুষ-প্রধান ক্ষেত্রে তেমনি নারীআন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এর ব্যাপক জনভিত্তির অভাব। প্রকৃতপক্ষে সময়ের বিচারে, শ্রেণীচেতনার বিচারে ঐ প্রত্যাশিত বিকাশ মোটেই সহজ ছিল না।

মনে রাখা দরকার, যেমন জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমনি নারীস্বাধিকার বিষয়ক আন্দোলন বা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব ছিল মূলত অভিজাত বা এলিট শ্রেণীর সদস্য-সদস্যাদের হাতে, অংশত মধ্যবিত্ত (উচ্চমধ্যবিত্ত) শ্রেণীর হাতে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের পিছুটান ও কিয়ৎমাত্রায় ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাধীনসত্তাবোধের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে নেতিবাচক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

নারীমুক্তি বা নারীস্বাধিকার আন্দোলনের প্রবক্তাদের চেতনায় তাই এমন বিশ্বাস ঠাঁই পায় নি যে পত্নীত্ব বা মাতৃত্ব থেকেও নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তার অবস্থান পুরুষের সঙ্গে একই সমতলে। নারীর যৌনস্বাধীনতা যে একান্তভাবেই নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ঘিরে, বিবাহের অর্থ নারীর এককভাবে স্বামীর যৌনপরিতৃপ্তির যন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়া নয়, এমনকি সমাজের বিভিন্নস্তরে পুরুষের সঙ্গে নারীর বিচরণ তার আপন যোগ্যতার অধিকারে— সেসব বিষয় তখন নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা কর্মসূচিতে স্থান পায় নি। অবশ্য বাস্তব অবস্থা বিচারে ঐ স্থান পাওয়ার বিষয়টি মোটেই সহজ ছিল না। এ সীমাবদ্ধতা ছিল দেশকাল-নির্ভর।

এ সীমাবদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে যেমন উনিশ শতকের সাহিত্যকর্মের প্রধান অংশে, তেমনি বিশ শতকের প্রথম দিকের সাহিত্যসৃষ্টিতেও। ধর্মীয় বিশ্বাসের রক্ষণশীলতা এবং অনুরূপ আচার-আচরণের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। নারী সন্তানধারণ ও পালন এবং গৃহকর্মের জন্য অপরিহার্য— এভাবেই সূত্র হিসেবে গেঁথে নিয়ে পুরুষশ্রেণীর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন ভিন্নতা যেমন পুরুষ তার কাজে ও লেখায় ব্যক্ত করেছে তেমনি অসচেতনভাবে, অজ্ঞাতসারে নারীও তা মেনে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে কোথাও কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় নি নারীকণ্ঠে বা নারীর লেখায়।

পূর্ণাঙ্গ আত্মসচেতনতার যে প্রভাব রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনাকে উঁচু পর্দায় বেঁধে দিতে পারে ঔপনিবেশিক রাজত্বে তা বড় একটা দেখা দেয় নি। বিদেশী রাজশাসনের প্রভাবে স্বভাবতই দেশীয় রাজনীতিতে ছিল নানামাত্রিক সীমাবদ্ধতা, যে সীমাবদ্ধতা ছিল জাতীয় রাজনীতি বা স্বদেশী রাজনীতির অনিবার্য অংশ। অন্যদিকে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে শ্রেণীচেতনার যথাযথ বিকাশ না ঘটাই হয়ে ওঠে উল্লিখিত ঐ সীমাবদ্ধতার পরিপূরক উপকরণ। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ খুব সহজ কাজ ছিল না।

এমনি ধারার সামাজিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক দুর্বলতা পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে যতটা সত্য ছিল, অবস্থা বিচারে তার চেয়ে অধিকতর সত্য ছিল নারীদের ক্ষেত্রে। নারীর পক্ষে উচ্চমঞ্চে আরোহণ যেমন পুরুষকুলের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না (ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রে স্বীকার্য) তেমনি সম্ভবত তাতে সমর্থন ছিল ঔপনিবেশিক শাসকরাজেরও। কারণ নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধিকার বিষয়ক প্রগতিযাত্রার ফলাফল সমাজের জন্য সদর্থক অর্থে বিপ্লবাত্মক, যার প্রভাব বিদেশী রাজশক্তির পক্ষে শুভ হতে পারে না। তাই শাসকরাজ নারীর উচ্চশিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার ব্যাপকতা সুনজরে দেখতে পারে না, বস্তুত পারেও নি। বিশেষ করে এর ব্যাপক গণভিত্তিক বিস্তার।

আর সেজন্যই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল শিক্ষা ও মেধা বিকাশের ক্ষেত্রটি উচ্চবর্ণভিত্তিক ও পুরুষপ্রভাবিত হয়ে থেকেছে, মেয়েদের অবস্থান সেখানে সীমিত ও সংকুচিত। এ সীমাবদ্ধতা যতটা রাজনীতিক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে— সৃষ্টি ও উপভোগ উভয় দিক বিচারে এ কথা সত্য। এর তাৎপর্য এমন নয় যে নারীপ্রগতি ও নারীস্বাধিকারের বিষয়টি কি সাহিত্যে কি রাজনীতিতে শুধু নারীর হাতেই ধরা থাকবে। বাস্তবে সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের, যেমন উভয়ের দায়িত্বের ফলাফল হিসেবে গড়ে ওঠে ঘরসংসার— যদিও পুরুষ পরবর্তী পর্যায়ে সংসারের তথা পরিবারের ভারি জোয়ালটা নারীর কাঁধেই তুলে দেয়। আর নারী তা মেনেও নেয়। বহির্মুখী পুরুষ বাইরের কাজেই সব দায়িত্ব শেষ করে, ঘরসংসারের সব দায়দায়িত্ব চাপায় নারীর কাঁধে। সাধারণভাবে নারী তা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে নেয়।

তবু প্রতিবাদ ওঠে; আপন অবস্থান নিশ্চিত করতে, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার আস্বাদ অনুভব করতে দু'একজন নারী এগিয়ে আসেন। আসেন শিক্ষা ও স্বাধিকারের ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বা বেগম রোকেয়ার মতো নারী। পাশাপাশি সমাজসচেতন কিছুসংখ্যক পুরুষ এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাতে নারীকর্মীদের কাজ কিছুটা সহজ হয়। একই কথা সত্য সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে। সমাজচেতনা ও শ্রেণীচেতনা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু ঐ দুটো উপকরণ সমাজে যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিত ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক অতিক্রান্ত হবার পর সাহিত্যে ও রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে তো বটেই, পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা স্রষ্টা ও কর্মী হিসেবে ক্রমশ বেড়েছে। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের পিছুটান পেরিয়ে বিষয়টা নারী-পুরুষ উভয়ের চেতনায় বিশেষ অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে চল্লিশের সর্বমাত্রিক দামাল দশক থেকে নারীপ্রগতির যাত্রা এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। এ ধারার ক্রমবিকাশ ঘটে দশক থেকে দশক পেরিয়ে সমাজচেতনা ও নারীচেতনার যুগলবন্দিতে।

তবু বিশ শতকের ঘটনাবহুল সময় অতিক্রান্ত হবার পরও নারীমুক্তি ও নারীস্বাধিকার কতটা অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তোলা যায়। আন্তর্জাতিক নারীস্বাধিকার সম্মেলনগুলোর ব্যাপক সফলতা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলা যায়। অবশ্য নারীবাদের প্রবক্তাগণ নারীআন্দোলনের বিচারে ষাটের দশককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন 'মুক্তির দশক' হিসেবে চিহ্নিত করে, যদিও নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু হয় অনেক অনেক আগে (মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়)। পূর্বোক্ত 'নারীমুক্তির দশক' এখনো প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে নি, এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

সম্ভবত এর একটি কারণ শক্তিমান পুরুষসমাজের পক্ষে নারীস্বাধীনতা বিষয়ে ব্যাপক আন্তরিকতার ও সদিচ্ছার অভাব, যা স্বল্পসংখ্যকের চেষ্টায় অর্জিত হবার নয়। নারী যে মানবসমাজের অগ্রযাত্রায় ইতিহাসের সক্রিয় অংশ, এ বাস্তবতা যেমন নারীর তেমনি পুরুষেরও অনুধাবন করতে হবে। পেছনে ফেলে আসতে হবে কয়েক হাজার বছরের রক্ষণশীলতা ও পিছুটান, বৈষম্য ও অনাচারের অতীত ইতিহাস। তা না হলে আধুনিকতার স্লোগান মুখেমুখে স্লোগান হয়েই থাকবে।

কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয়। সনাতনী পাঁক এমনি গভীর যে তাতে শুধু পা-দুটোই নয়, গোটা শরীর তথা অস্তিত্ব ডুবে যায়। আপাতবিচারে যতই আধুনিকতার চোখ ঝলসানো আলো আমাদের মুগ্ধ করুক না কেন সনাতনী ঐতিহ্য সহজে ছেড়ে কথা বলে না। আর সে জন্যই রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভাও ঐ বন্ধন থেকে সহজে মুক্তি পান নি। অনেক সাধনা ও অভিজ্ঞতাঋদ্ধ সচেতনতার প্রয়োজন হয়েছে তার সঠিক অবস্থানে পৌছাতে আর এ ক্ষেত্রে সফলতার পাশাপাশি স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা তাঁকে স্পর্শ করেছে, বিশেষ করে উপন্যাসে নারীচরিত্র চিত্রণে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোনো কোনো চরিত্রে মাতৃত্ব বা সতীত্বের ধারণা নারীকে পরাভবের বৃত্তে পৌছে দিয়েছে যা পরবর্তী আলোচনায় এক এক করে দেখা যাবে। আর কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বারবার আঘাত খেয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, নারীচরিত্র চিত্রণে; তার গল্পে নয়। তাই সব প্রশ্ন ও গৃহদাহের জটিলতা শেষ হবার পর শান্ত স্বচ্ছ পরিবেশে যখন বিনোদিনী (চোখের বালি) বিহারীর সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নিতে চেয়েছে, বিহারী এককথায় তা বাতিল করে দিয়েছে। বাইরের কাজে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি নিরাপদ নয় এমন ধারণাই বিহারীর বক্তব্যে ও অস্বীকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চিত্রিত নারীচরিত্র কিংবা তাঁর একাধিক রচনা থেকে বক্তব্য উদ্ধার করে দেখানো সম্ভব যে নারী ঘর-সংসারে শ্রী, শুভ ও কল্যাণের সাধনায় অবদান রাখবে— এমন বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল খুবই। তাই বহির্মুখী পুরুষ বাইরের জগতের কাজে সাফল্য বয়ে আনবে, আর নারী ঘর-সংসার আগলে পুরুষের পরিপূরক হয়ে যৌথ জীবনের সার্থকতা বাস্তবায়িত করবে এমন প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়। তবে নারী বিশ্বলোকের প্রাঙ্গণে এসে সভ্যতার জয়যাত্রায় অংশ নেবে এমন কথাও তিনি পরে একাধিক ক্ষেত্রে বলেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর তত্ত্ব ও বাস্তবে অনেক সময় প্রভেদ দেখা দিয়েছে যা তাঁর চেতনায় স্ববিরোধিতা বা 'অসমন্বিত দ্বন্দ্বের' প্রকাশ হিসেবে গণ্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রভাবনায় নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান

সমাজে ও পরিবারে নারী ও পুরুষের আধিপত্য ও অধিকারগত অবস্থানের বিষয়টি বরাবরই বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের। এ সম্পর্কে একাধিক মনীষীর চিন্তাভাবনাও স্ববিরোধিতার শিকার। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর নারীবিষয়ক ভাবনায় টানাপোড়েনের প্রকাশ বা প্রগতি ও রক্ষণশীলতার দুই বিপরীত প্রতিফলন যেমন সত্য তেমনি তাতে জটিলতার প্রকাশও কম নয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম যথেষ্ট ভিন্নতার মধ্য দিয়ে স্ববিরোধিতা পরিস্ফুট করে তুলেছে, লেখায় তো বটেই।

এর পেছনে নিঃসন্দেহে রয়েছে দেশকালের প্রভাব, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দুই বিপরীতমুখী প্রভাব, রয়েছে পারিবারিক-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব। জটিলতার কারণ ঐ বিভিন্নমুখী একাধিক প্রভাব। একদিকে তাঁর পিতার চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-ধারণার সূত্রে ঔপনিষদিক এবং সনাতন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রবল মুগ্ধতা যা কখনো কখনো আচ্ছন্নতার স্তরে পৌঁছেছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির আলোকিত প্রভাব রবীন্দ্রচেতনায় ভিন্ন আদর্শের দিকনিশানা তুলে ধরেছে— আবার একই সঙ্গে উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ ও তার খণ্ডিত, স্ববিরোধী চরিত্র কিছু না কিছু প্রভাব রেখেছে। এককথায় দুই ভিন্ন মেরুর গুণগত প্রভাব রবীন্দ্রচৈতন্যকে নানাভাবে স্পর্শ করে দুই ভিন্নপ্রভাবের অধীন করেছে।

দেশ (সমাজ) ও কাল, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রভাব আত্তীকরণের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় বিচার্য— তা হলো ব্যক্তিস্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা যা পূর্বোক্ত নানা প্রভাবের মধ্যেও একটি শক্তিমান উপকরণ, যে-উপকরণ একাধিক প্রভাব গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাই একই সময়ে কেউ অতীতের পিছুটান অগ্রাহ্য করে চলতে পারেন, সমকালের প্রভাব সর্বদা তাকে একই বিন্দুতে ধরে রাখতে পারে না; আবার কেউ ঐতিহ্যপ্রভাবে পিছুটানের শিকার হন কিংবা দেশকালের প্রভাবের সঙ্গে কিছুটা আপোস করে মধ্যপথ ধরে এগিয়ে চলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় আপন ভূমিকার পক্ষে নিজ নিজ যুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের নারী-পুরুষ বিষয়ক ভাবনায় ঐ ত্রিধারার প্রতিফলন লক্ষ করার মতো। আর সে কারণে উল্লিখিত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার পাশাপাশি জটিলতার অস্পষ্টতাও অপ্রকাশ থাকে নি। থাকে নি স্বদেশ, স্বকাল, পাশ্চাত্য রেনেসাঁসীয় প্রভাবের পাশাপাশি নিজস্ব কিছু ধারণা ও চেতনায় লালিত কিছু বিশ্বাসের কারণে। অন্যদিকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সঙ্গে সনাতন তথা ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং তা জীবনযাপনে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছিল যা গুণগত বিচারে প্রগতিধর্মী ছিল না।

দুই

ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের ওপর পারিবারিক প্রভাব ও বংশগতির প্রভাব নির্ধারণ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রায় (রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সমাজ চিন্তা, ১৯৮৫) যে-আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় 'দ্বারকানাথের (১৭৯৪) তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭) ছিলেন অনেকটাই রক্ষণশীল' আবার 'সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৪২) তুলনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০) অনেক বেশি রক্ষণশীল। শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনায় নয়, নিজের কালের অনেকের তুলনায়ই সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বেশি প্রগতিশীল, অনেক বেশি আধুনিক।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে পূর্বোক্ত লেখক ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের তাঁদের স্বভাব প্রকৃতি রুচি প্রবণতা বংশগতির প্রভাব বিচার করে দুই গোত্রে ভাগ করেছেন। 'একটা গোত্র হল মোটামুটি দেবেন্দ্রনাথ-অনুসারী গোত্র, অন্যটা সরাসরি যদি দ্বারকানাথ-অনুসারী না-ও হয়, তবু... অনেকখানি পরিমাণে দ্বারকানাথ-অভিমুখী গোত্র।' লেখকের বিচারে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেকটাই তার পিতার গোত্রের মানুষ', কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্ন ধারার এবং ঐ ধারায় রয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী ও কাদম্বরী দেবী প্রমুখ। আর পরিবেশ, বংশগতি, পারিবারিক প্রভাব ইত্যাদি সব কিছু মিলে, বিশেষ করে 'জীবনের ষড়ৈশ্বর্যকে সানন্দে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার ক্ষমতায় রবীন্দ্রনাথের মিল বরং... পিতামহ দ্বারকানাথের সঙ্গে।'

যদিও লেখক এক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, 'পিতার সম্পর্কে মুগ্ধতা রবীন্দ্রনাথের প্রচুর ছিল, সে মুগ্ধতা প্রভাবেরই পরিমাপ, কিন্তু মুগ্ধতা আর সাধর্ম্য এক নয়। তাঁর উপনিষদের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ, তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা,... এসবের সঙ্গে পিতার প্রভাব হয়তো জড়িয়ে আছে। হয়তো এই প্রভাবের কারণেই তাঁর মৌল নান্দনিক বা ইস্থেটিক জীবনদৃষ্টিকে আড়াল করে মাঝে মাঝে নৈতিকতা বড় হয়ে উঠেছে।... হয়তো-বা এই মুগ্ধতার কারণেই সৃজনশীল শিল্পী হয়েও, বিদ্রোহী শিল্পী হয়েও শান্তিনিকেতনের আশ্রমে গুরুদেবের পদবিটি তাঁর কাছে গুরুভার মনে হয় নি। পরে অবশ্য গুরু বা ঋষির পদবি রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।' সত্যিই কি তাই ? রবীন্দ্রনাথ কি এ আরোপিত 'গুরুদেবত্ব' শেষপর্যন্ত সত্যিই সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছিলেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় পিতার প্রভাব-সূত্রে অর্জিত ঔপনিষদিক প্রভাব, সনাতন হিন্দুত্বের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে শান্তিনিকেতন-বঙ্গদর্শন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বেই শুধু নয়, এর আগে এবং কিছুটা পরে, বিশেষ করে পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গভীরভাবে উপস্থিত ছিল, এমনকি পিতার মৃতুর পরও সে প্রভাব ধীরেসুস্থে মুছে যেতে কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু 'গুরুদেব' সম্বোধনের গুরুত্ব কি রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি নাকচ করতে পেরেছিলন ? এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এ প্রশ্ন জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ক তিনদিনব্যাপী এক সেমিনারে (১৯৯৮) গুরুত্বের সঙ্গে তুলেছিলেন বক্তা গৌতম চট্টোপাধ্যায়। সে আলোচনায় আরো একাধিক বক্তা তাঁর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মতে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি ঐ 'গুরুদেব' সম্বোধনের প্রতি মুগ্ধতা বর্জন, আশ্রমগুরু হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে যে উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বিদেশে তাঁর 'সন্ত' পরিচিতি, প্রাচ্যের জ্ঞানী ভাবুক তথা ঋষি হিসেবে প্রশস্তি মনে হয় রবীন্দ্রচেতনায় 'গুরুদেব'-এর আসন স্থায়ী করে তুলেছিল।

প্রসঙ্গত এ কথা সত্য যে পিতার প্রভাবই শুধু নয়, সনাতন বিশ্বাস লালনের ক্ষেত্রে সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার প্রভাব (যা তৎকালীন রাজনীতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক সময় যথেষ্টই ছিল। রবীন্দ্রনাথের ঐসময়কার রচনায় (এমনকি ক্বচিৎ পরবর্তী সময়ের)-এর প্রমাণ মেলে। প্রমাণ মেলে পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনায়, পত্নীত্ব সতীত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ক ধারণায় এবং তাঁর দুই নারীতত্ত্বের বিচারে। তাছাড়া নারীর শারীরবৃত্তিক ও যৌনাঙ্গ বৈশিষ্ট্য এবং পুরুষ থেকে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতার বিষয়টি চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথের মন দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এর প্রভাব পড়েছিল তাঁর নারী-বিষয়ক ভাবনায়। এ ভাবনায় যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত দিক তেমনি ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের প্রভাব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কতটা দেবেন্দ্রনাথের অনুসারী, কতটা দ্বারকানাথ-অভিমুখী— সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের উত্থাপিত এ প্রশ্ন নিয়ে ঠাকুরবাড়ির সদস্য-সদস্যাদের ওপর, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ওপর পারিবারিক, বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ না করে পারা যায় না যে পিতার মৃত্যুর পর চিন্তা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে ক্রমশ ভিন্ন বলয়ের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনো পিতামহ দ্বারকানাথ সম্পর্কে তেমন কিছু লেখেন নি। সে লেখা প্রশস্তিবাচক বা সমালোচনামূলক যা-ই হোক না কেন।

পিতামহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ নীরবতা নিয়ে অভিযোগ কম নয়। এ নীরবতা অনেকটা অবহেলার সামিল। এ বিষয়ে রবিনসনের মতে, 'গোটা ঠাকুর পরিবারই এ জন্য দায়ী'। অর্থাৎ দ্বারকানাথ সম্পর্কে গোটা পরিবারের (সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে) নেতিবাদী ধারণাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, যা মোটেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো বিচক্ষণ, গভীর চিন্তার মানুষের পক্ষে তো নয়ই। তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্যবোধ ও যুক্তিধর্ম প্রখর ছিল বলেই এমন প্রশ্নের উত্থাপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যপর্বে একসময় পিতামহ দ্বারকানাথের লেখা চিঠিপত্র সব পুড়িয়ে ফেলেছিলেন এমন অভিযোগের কথা রবিনসন রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকদের ঘনিষ্ঠতা, তাঁর মধ্যে বৈশ্যচেতনার প্রবলতা ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে দ্বারকনাথ সম্পর্কে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল এমন সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন রবিনসন। কিন্তু সম্ভাবনা সত্য হলেও বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের বড় ইংরেজপ্রীতি বা পাশ্চাত্যের আলোকিত সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে মুগ্ধতা নিয়ে তাঁর স্বদেশীদের মধ্যে অভিযোগ কি খুব কম ? আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি (ঈশ্বরভাবনা, উপনিষদচিন্তা সত্ত্বেও) এবং জমিদারি বিষয়ক কঠোরতা (কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' দ্রষ্টব্য) কি দ্বারকানাথ থেকে খুব ভিন্ন ছিল ? বিপরীত বিচারে এ কথাও তো সত্য যে দ্বারকানাথ যতটা বৈশ্যবৃত্তির অনুসারী তার চেয়ে অনেক বেশি হতে চেয়েছিলেন স্বদেশী তথা জাতীয় পুঁজি বিকাশে আগ্রহী এক শিল্পোদ্যোক্তা এবং তা বাণিজ্যিক বিত্তের পথ পেছনে ফেলে। পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি নানা কারণে। কিন্তু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় চেতনাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে দ্বারকানাথের দানের পরিমাণ তো ছিল বিপুল যেদিক থেকে তিনি ঠাকুরপরিবারের আর সবাইকে অতিক্রম করে যান অনায়াস দাক্ষিণ্যে।

আসলে উল্লিখিত দ্বারকানাথ-বিরোধিতা বা তাঁর প্রতি গোটা পরিবারের বিরূপতা এমন এক উদ্ভট, অসঙ্গতিপূর্ণ 'মিথ' তৈরি করেছিল যা এখনো বর্তমান, যা একেবারেই নেতিবাচক 'মিথ'। আসলে এটা কৃত্রিম এবং অনেকাংশে ভিত্তিহীন। আর আমাদের বিশ্বাস জীবনযাত্রায় গতানুগতিকতা বর্জনের ক্ষেত্রে পৌত্র ও পিতামহের মধ্যে অদ্ভুত মিলের কথা যা দেবেন্দ্রনাথে দেখা যায় না (সেই বহুকথিত বাবু চেঞ্জেস হিজ মাইন্ড অফ্‌ন্ = বাবু প্রায়ই তাঁর মত পরিবর্তন করে থাকেন) বাদ দিলে উভয়ের মধ্যে অমিলের মাত্রাই বেশি। তবে উক্ত মিল হয়তো বংশগতির (জীনবাহিত) প্রভাব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এটুকু মিলের জন্য কি রবীন্দ্রনাথকে দ্বারকানাথ-গোত্রীয় হিসেবে চিহ্নিত করা চলে ? অমিলের দিকগুলো তো গুরুত্ব বিচারে মোটেই গৌণ নয়। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে কখনোই পিতা-পিতামহের মতো প্রজাদের প্রতি কঠোর শাসনের পরিচয় দেন নি। বরং প্রজাশাসনের চেয়ে প্রজাপালন ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই সমবায় ও কৃষিঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি প্রজাহিতৈষণার পরিচয় রেখেছেন। আর বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই পূর্বসূরির মতো বিষয়বুদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাতুর্যের পরিচয়ও রাখতে পারেন নি। হয়তো শিল্পীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য এর কারণ। এ ছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল মানবিকবোধের গভীর উপস্থিতি।

অন্যদিকে মিল-অমিলের প্রশ্নের চেয়েও আলোচ্য বিষয়ে প্রভাবের দিকটা বরং রবীন্দ্রচৈতন্য বিচারে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে দেখা উচিত। সেদিক থেকে হিসাব করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে মূলত দেবেন্দ্রনাথ-প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব মনে করাই সঠিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারকানাথ সেখানে দূরনক্ষত্রের মতো, যার আলো রবীন্দ্রচৈতন্যে এসে পৌছাতে পারে নি। নানাদিক থেকে পিতা দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল বেশি; তবে আমাদের মতে, মিলের চেয়েও প্রভাব অর্থাৎ পিতার চিন্তাভাবনার, বিশ্বাস-আদর্শের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর ছিল যথেষ্ট, ঐ কথিত মিলের চেয়েও বেশি। পিতার প্রতি মুগ্ধতার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ কখনো গোপন করেন নি (যদিও নীরব থেকেছেন পিতামহ সম্পর্কে), এমনকি তাঁর একাধিক রচনায় ঐ মুগ্ধতার চিত্র বড় বেশি স্পষ্ট। আর সঙ্গীত, অভিনয় ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মিলের কথা রবিনসন বলেছেন তা তো ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে কমবেশি বিদ্যমান, সে সাদৃশ্য ও প্রভাব মূলত পারিবারিক।

তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর পিতামহের জীবনাচরণের কিছু বৈশিষ্ট্য যদি প্রকাশ পেয়েও থাকে তা সাধারণ পারিবারিক প্রভাবের অন্তর্গত এবং ঐ গতানুগতিকতার প্রতি বিরূপতার প্রশ্নটিও একইভাবে বিবেচ্য, যদিও সেখানে 'জীন' প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। এ সম্পর্কে আরো বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে কি অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নতুনত্ব বা অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল ? জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশদ ও ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ হয় নি বলেই বোধহয় এ বিষয়ে আলোকপাত ঘটে নি।

প্রভাবের প্রশ্নে, মিল-অমিলের প্রশ্নে বরং এমন কথা পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে পিতা দেবেন্দ্রনাথই, বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানামাত্রিক প্রভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উপস্থিত। আর মহর্ষির জীবদ্দশায় সে-প্রভাব কী যে প্রবল ছিল তৎকালীন ঘটনাদির বিচার-বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য প্রশ্নের বিচারে আরো বলা চলে যে, *দ্বারকানাথ তাঁর জীবনাচরণে যেখানে 'প্রিন্স' পরিচয়ে বিশিষ্ট, দেবেন্দ্রনাথ সেখানে মহর্ষি এবং শেষোক্ত ধারার রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু 'গুরুদেব' তথা আশ্রমাচার্য হিসেবে পরিচিত।*

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও 'যথেষ্ট রক্ষণশীলতা' (স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে রবিনসন পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তির অভিমত) তাঁর সামাজিক আচরণে, রীতিপ্রথা পালনে প্রকাশ করেছেন যেজন্য পুত্রসম, স্নেহভাজন কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা ঘটে। মহর্ষি ব্রাহ্ম হয়েও আমৃত্যু উপবীত ধারণ করেছেন, পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপনয়নকর্ম (উপবীত ধারণ) সম্পন্ন করেছেন ১৮৭৩ সালে এবং আশ্চর্য যে রবীন্দ্রনাথও (পিতার নির্দেশে!) পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথেরই লেখায় জানা যায় যে দ্বারকানাথ যদিও ইংরেজদের সঙ্গে পান ভোজন করেছেন তা সত্ত্বেও তিনি পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে সাহেবদের সঙ্গে পানাহারে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন (রবিনসন)।

আসলে মহর্ষি আমৃত্যু তাঁর প্রতিভাবান পুত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। নানামাত্রিক এ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বেদ-সংহিতা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিষদপ্রীতির যেমন কারণ তেমনি তা রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় (পরিস্রুত রূপে হলেও) উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারীচরিত্র চিত্রণে সে প্রভাব কমবেশি পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য ১৯০১ সালে পিতার নির্দেশে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীর পুনর্বিবাহ বন্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ তাকে এলাহাবাদ থেকে নিয়ে আসেন। এ মনোভাবেরই কি প্রকাশ ঘটেছে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতিতে (১৯০১-০২, পত্রিকায় প্রকাশ) ? এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রগতিশীল পূর্ব-নারীভাবনা (১৮৭৯-৮০) বর্জন করে সনাতনপন্থী, রক্ষণশীল হিন্দু ?

তিন

ভাবতে অবাকই লাগে যে, অপরিণত বয়সে বিলেতে পড়তে গিয়ে সেখানকার সমাজে নারীর অবস্থান ও স্বাধিকার লক্ষ করে অভিভূত তরুণ রবীন্দ্রনাথ শুধু যুক্তিনির্ভর ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে প্রশস্তিবাচক উচ্চারণ করে ক্ষান্ত হন নি, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীস্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের পক্ষেও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন। বলতে বাধে নি 'ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রামরাজ্যে আমরা বাস করি নি।... আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে।'

ঐ তরুণ বয়সে পিতা ও পরিবারের পূর্বতন প্রভাব উপেক্ষা করে সতেরো-আঠারো বছরের রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী নারীর দুর্দশা ও বিদেশী নারীর স্বচ্ছন্দচলার প্রেক্ষাপটে নারী-স্বাধীনতা বা স্বাধিকারের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি এ বিষয়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন নি, ভয় পান নি। এমনকি তারুণ্যের স্পর্ধায় এর পরিণাম বিবেচনা করে দেখেন নি। হয়তো ভাবতে পারেন নি যে এর ফলে পিতার শাসনতান্ত্রিক কঠোর নির্দেশে তাঁর বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের সমাপ্তি ঘটতে পারে। বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

সমালোচক কেউ কেউ বলে থাকেন, নিছক যৌবনের দুঃসাহসে ভর করে রবীন্দ্রনাথ ঐ অবিশ্বাস্য কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তবে যৌবনের উত্তাপ সাহস যোগালেও অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস সেখানে প্রেরণা যুগিয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়। প্রসঙ্গত অন্নদাশংকর রায়ের লেখা 'আগুন নিয়ে খেলা' ও 'পুতুল নিয়ে খেলা' উপন্যাসদ্বয়ের বক্তব্য তুলনীয় সমাজবাস্তবতা হিসেবে বিবেচ্য। একই সঙ্গে উভয়ের রচনাকালীন বয়সের পার্থক্যও হিসাব করে দেখা উচিত। সমকাল ও বয়স বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের নারীস্বাধিকার বিষয়ক বলিষ্ঠ উচ্চারণ সত্যিই বিস্ময় জাগায়।

স্বদেশের সামাজিক অবস্থা বিচারে তরুণ রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন যে, আমাদের পুরুষশাসিত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি, একটা পোষা প্রাণীর মতো অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একদল *বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তিবিশিষ্ট* জীবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত শত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের *শাসন পীড়ন দমন বন্ধন* করে পোষা জন্তুর চেয়ে *নির্জীব বশীভূত সংকুচিত সংকীর্ণমন* করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।... এসকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার করো তাহলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়' (১৮৭৯)।

উদ্ধৃতিতে রেখাঙ্কিত শব্দগুলোর গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতা সন্দেহ নেই তারুণ্যের আবেগ তুলে ধরেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারীর তৎকালীন অবস্থা যে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও ঐতিহ্যপ্রসূত বাস্তবতা সে সত্য তুলে ধরতেও দ্বিধা করেন নি রবীন্দ্রনাথ। এমনকি ভয় পান নি 'দিশি পুতুল' ও 'বিলিতি পুতুল'-এর উদাহরণ টেনে একথা বলতে যে বিলেতেও পুরোপুরি স্বাধীনতা সমাজের সর্বস্তরে সচল নয়। সেখানেও অনেক বিষয়ে 'পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের সম্পত্তি। যেমন গাড়ি চালাবার জন্য ঘোড়া আবশ্যক করে তেমনি সংসার চালাবার জন্যে স্ত্রীর দরকার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিষের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর নির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন' (১৮৭৯)।

উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বিলেতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বঙ্গীয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ অভিভূত চাষার মতো বিলেতি সমাজের প্রশংসায় ও স্তুতিবাচনে মেতে ওঠেন নি। বরং নারীর যতটা স্বাধীনতা, স্বচ্ছন্দ মেলামেশার অধিকার সেখানে দেখা গেছে তাই ঐ তরুণের চেতনা স্পর্শ করে তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল নারীস্বাধিকার বিষয়ক ভাবনায়। তা না হলে বিলেতি সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক সমালোচনা তাঁর চিঠিতে পরিস্ফুট হতো না।

বিলেতের এ সমাজদর্শন যে কতটা বাস্তবভিত্তিক তার প্রমাণ মেলে সেখানকার মেয়েদের রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার স্বীকৃতির বিলম্বিত প্রক্রিয়ায়। তা না হলে কথিত ঐ গণতান্ত্রিক দেশে নারীকে সাধারণ ভোটাধিকারের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে কেন ? ভারতীয় উপনিবেশের বঙ্গদেশে যেখানে ১৯২৬ সালে নারী ভোটদানের অধিকার পায় সেখানে বিলাতে নারীর ভোটাধিকারের আইন পাস হয় মাত্র ১৯১৮ সালে, তার মধ্যেও থাকে বহুবিধ সীমাবদ্ধতা— যেমন বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিবাহ বিষয়ক অবস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি ঘিরে। তাই অচলায়তন সেদেশেও নারীকে ঘিরে নিতান্ত কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই লক্ষ করেছিলেন যে, সেখানকার নারীস্বাধীনতা অনেকটাই বাইরে রঙ চাপানো, চলাফেরা ও মেলামেশার মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ সেজন্যই 'দিশি পুতুল' ও 'বিলিতি পুতুল'-এর তফাত সত্ত্বেও স্বাধিকারের অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন সেই আঠারো-উনিশ বছর বয়সেই (১৮৭৯-১৮৮০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কারণেই ইংরেজ নারীদের উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী নারীদের চরম দুর্দশার (সামাজিক-পারিবারিক) কথা অর্থাৎ সমাজে প্রথাগত দাসত্ব, দাম্পত্যজীবনে তথা পরিবারে পত্নীহিসেবে দাসত্ব এবং স্বামী থেকে শাশুড়ি অবধি বধূনির্যাতনের তুলনায় বিদেশী নারীর অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য ও স্বচ্ছন্দ অবস্থার কথা বলেছেন উদাহরণ হিসেবে। উদ্দেশ্য নারীস্বাধিকার এবং নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার সামাজিক প্রয়োজন অনুধাবন করানো, যা তাঁর মতে, সমাজহিতের জন্যই প্রয়োজন।

কেননা মানবসমাজ ও মানবসভ্যতা-সংস্কৃতিকে সুস্থভাবে এগিয়ে যেতে হলে সমাজের দুই মানবিক প্রতিনিধি নারী ও পুরুষকে যার যার মতো করে সমানতালে (সমানভাবে না হলেও) এগিয়ে ভূমিকা ও অবদান রাখতে হবে। নারীর সন্তান ধারণ, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি জৈবিক ভূমিকা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না। গাড়ির দুই চাকার একটা খুঁড়িয়ে চললে বা পিছিয়ে পড়লে সমাজ ও জীবন কোনোটারই স্বচ্ছন্দ মসৃণ গতি আশা করা যায় না।

এ-বোধ বা সচেতনতা শুধু অধিকারবোধই নয়, দায়দায়িত্বের বোধও বটে। মন থেকে সংস্কারের মুক্তি, রক্ষণশীলতার মুক্তি বা অধিকারের আধিপত্যবাদী চিন্তার অবসান ঘটানো যেমন পুরুষের দিক থেকে অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য নারীর দিক থেকেও। বাইরের চলাফেরাতেই শুধু নয়, নারী ও পুরুষ উভয়কেই অভ্যাসের ও বিশ্বাসের পিছুটান থেকে মুক্ত হতে পারা চাই। সামাজিকক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে কিংবা দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে এ অর্জন যে কত কঠিন তা একুশ শতকের কথিত আধুনিক তথা অতিআধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ও পরিবারের দিকে তাকালেও বোঝা যায়। বোঝা যায় তাদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ এবং আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্যে।

লক্ষণীয় যে এখনো সমাজে পুরুষের স্থান নারীর চেয়ে উঁচুতে, মুখে যতই আমরা নারীস্বাধীনতার কথা বলি বা লিখি এবং সেমিনারে সে সম্পর্কে যতই বিপ্লবাত্মক কথাবার্তা উচ্চারণ করি না কেন! যেমন সমাজে তেমনি ঘরের চারদেয়ালের ভেতরে, দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিক চলাফেরায় স্ত্রীর প্রতি আচার-আচরণে পূর্বোক্ত সত্যই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। স্ত্রীর দেহের ওপরও স্বামীর অধিকার যখন শেষোক্তের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চরিত্র নিয়ে প্রকাশ পায় তখন বার্নাড শ'-চিন্তাবিদ রাসেলের বিবাহ-বিষয়ক অপ্রিয় মন্তব্য মনে পড়ে যায়। বিয়ের সপ্তপদী বন্ধনে স্ত্রী যে যৌনাচারের ক্ষেত্রে আইনসম্মত বেশ্যাবৃত্তির শিকার সে কথা অস্বীকার করা বাস্তবিকই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

চার

নারী যে পরিবারে, সমাজে বা অন্যত্র একেবারেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত— পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এমন কি এ পর্যায়ে পরিণতবয়সী পুত্রেরও, বঙ্গীয় সমাজের এ আধিপত্যবাদী সত্য রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন পরিবেশের অভিজ্ঞতায় ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলম-বিতর্কেও তা স্পষ্ট। কিন্তু 'য়ুরোপপ্রবাসী'র পত্রের লেখক দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসে ক্রমে তাঁর নারীবিষয়ক ভাবনায় ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত পথের দিকেই যেন পা বাড়াতে শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের এ ধারা!

কিন্তু শুরুটা ঠিক সনাতনপন্থার নয়, বরং বলা যায় কবির নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা বা বিশ্বাসের পথ ধরে তাঁর যাত্রা শুরু নারীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন চিন্তা-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, নারীকে তিনি দেখছেন কবির চোখ দিয়ে সুকুমার বৃত্তির প্রতীক হিসেবে। দেখেছেন প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্তা হিসেবে— সম্পূর্ণ একটি কবিতা বা সঙ্গীতরূপে, সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে। এ তুলনা রবীন্দ্রনাথেরই।

উল্লিখিত বিস্ফোরক রচনার এক যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' বা 'ছিন্নপত্রাবলী'তে নারী তথা 'স্ত্রীলোক' সম্পর্কে যে মন্তব্য বা মূল্যায়ন করেছেন মাত্র কয়েকটি বাক্যে তাতে আশ্চর্য মিল— সে মিল যেমন কালগত তেমনি বিষয়গত। তাঁর ভাষায় 'পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সঙ্গীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর, সুগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে' (অখণ্ডতা : পঞ্চভূত)। একই বক্তব্য ১৮.৩.১৮৯৩ সালে পতিসর থেকে লেখা চিঠিতে— "আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।... পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন, তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো একটি 'ছাদ' নেই।... মেয়েদের আচার ব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড শ্রীসামঞ্জস্য আছে। সমস্তটি যেন একটি অর্গানিক হোল" (ছিন্নপত্রাবলী, পৃ. ১৬৮-১৬৯)।

এই প্রভেদের কারণ তাঁর মতে, 'যুগযুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে,... তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করে নি। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাষায় ভঙ্গিতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে।... মেয়েদের সঙ্গে যে লোকে চিরকাল সঙ্গীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে... তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ, সুসংহত, সুসংযত, মেয়েরাও সেইরকম।' (ছিন্নপত্রাবলী, প্রাগুক্ত)

'পঞ্চভূত'-এর পূর্বোক্ত নিবন্ধেও বলা হয়েছে, 'রমণীও প্রকৃতির মতো'। একই গ্রন্থের 'নরনারী' নিবন্ধে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে একই অর্থে বলা হয়েছে। এমনকি এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'আদর্শ নারীর উপকরণ-আয়োজন অনেকখানিই যোগাইয়াছে প্রকৃতি।... *স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দদান করা।* তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।'

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে শেষোক্ত উদ্ধৃতির বক্তব্য নিঃসন্দেহে একজন কবির, একজন সামাজিক নন্দনতত্ত্ববিদের। কবি-নন্দনতত্ত্ববিদের নিজস্ব সৌন্দর্য-ধারণা নারীসত্তার চরিত্র নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে বলেই নারীকে সৌন্দর্যের আধার প্রকৃতির মতো করে তুলে ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, তার স্বাধীন সামাজিক ব্যক্তিসত্তা হয়েছে উপেক্ষিত। অন্যদিকে পুরুষের সৌন্দর্যরূপ হয়েছে অস্বীকৃত। কিন্তু প্রতিভাবান পাশ্চাত্য ভাস্করদের কারুকর্মে পুরুষদেহের যে সৌন্দর্য প্রতিফলিত তা তো রবীন্দ্রনাথের অজানা বা অদেখা ছিল না। তা সত্ত্বেও এ একদেশদর্শিতা নিজ তত্ত্বের প্রয়োজনে এসেছে বলে মনে হয়। আর নারীর প্রধান কাজ যদি হয় আনন্দদান (সম্ভবত পুরুষের) তাহলে তাকে কি বারবনিতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরা যায়!

রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় নানাভাবে তত্ত্বের প্রভাব প্রবল। তা একদিকে সৌন্দর্যবাদী রূপ অন্যদিকে সামাজিক রূপ নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর নারীরাই বিচিত্ররূপিণী, পুরুষেরা নয়। নারীর সৌন্দর্যসত্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'উর্বশী' কবিতার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক।' বিমূর্ত সৌন্দর্যের প্রতীক উর্বশী 'নিছক নারী' হয়েও মাতা কন্যা বধূ বা গৃহিণী নয়, সে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী। এ মোহিনী 'স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।' দেবতার ভোগ নারীর সৌন্দর্য নিয়ে হলেও এ ভোগের ঐতিহ্য কি বর্তায় নি ইহলোকে সমাজসভ্যতার বিশেষ পর্যায়ে নারীকে দেবতার ভোগ্য দেবদাসীরূপে পুরুষের তথা মন্দিরের পুরোহিত ও রাজপুরুষদের ভোগ্যবস্তু করে তোলায় ? এদেশের সামাজিক-ধর্মীয় ইতিহাস তাই বলে।

উর্বশীর সৌন্দর্যরূপ তাই আসলে বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) নয়, বরং খুবই বাস্তবিক, যা নারী-বন্দনার নামে নারীকে পুরুষের সম্ভোগের আধার করে তুলেছে, 'সৌন্দর্যের যে আদর্শ (উর্বশী কবিতায়) নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়' (কথাটা রবীন্দ্রনাথের), আর সেজন্যই এর বাস্তব ভবিষ্যৎ অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'উর্বশী'র আলোচনায় একটি ভিন্ন ধারায় বলেছেন যে ঐ সৌন্দর্য অর্থাৎ 'সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা দেহধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়।' 'নারীরূপের অনিন্দনীয় পূর্ণতার' প্রত্যাশা নিয়ে 'উর্বশী' রচিত হলেও এবং এর মধ্যে 'বিস্ময় ও আনন্দ' থাকলেও তা নারীকে ব্যক্তিসত্তার বিচারে মহিমান্বিত করে তোলে নি।

বরং কবির কথাগুলো বিপরীত বিন্যাসে সাজিয়ে নিলে দেখা যায়, নারী সেই প্রাচীন বা পৌরাণিক যুগ থেকেই ভোগের আধার দেবদাসী রূপ ছাড়াও মাতা বা বধূ রূপে সমাজে, পরিবারে ও ব্যক্তিজীবনে স্বাধীন সত্তার বদলে ভোগ্যসামগ্রীর রূপে দাসীর মর্যাদাই পেয়ে এসেছে। মাতৃত্বের মহিমার কথা যত বড় করে বলা হোক না কেন, জননীও তো কারো না কারোর জায়া যাকে পত্নীত্ব ও সতীত্বের বদ্ধ খাঁচায় বাস করে পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয়, অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। কন্যাও কি এ প্রক্রিয়ার বাইরে ?

তাই এ বন্ধন স্থায়ী করতে গিয়ে নারীর মাতৃমূর্তির ও গৃহলক্ষ্মীর দেবীত্ব 'মিথ' তৈরি করতে হয়, কিংবা তৈরি হয় প্রেয়সীর এক অবিশ্বাস্য রমণীয় 'মিথ'। পুরুষ বন্ধনহীন (কথাটা রবীন্দ্রনাথেরই), পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষ উদ্দাম জীবনযাত্রার আকর্ষণে বহির্মুখী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি বিশেষণে পুরুষসত্তাকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যার জন্য প্রয়োজন নারীর অসীম আত্মত্যাগ, সহিষ্ণু পশুর মতো জীবনযাত্রা প্রয়োজন হয় তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা বিসর্জন দিয়ে পুরুষকে ধরে রাখার জন্য, নিজেকে পুরুষের আকর্ষণীয় রূপগ্রহণের এবং যৌনসম্ভোগের আধার হয়ে ওঠার। আর সে কারণেই যত নারীপ্রশস্তি, তা যেমন তার সৌন্দর্যের, তেমনি তার ইচ্ছার বিনিময়ে তার সহিষ্ণুতার। সে সহিষ্ণুতা পুরুষের যৌনবাসনা চরিতার্থ করে নিজেকে বিলিয়ে দেবার শক্তিতে পরিস্ফুট।

নারীকে নিয়ে এই বহুমুখী 'মিথ' রচনা যেমন গৃহকর্তা এবং সমাজপতি পুরুষের তেমনি কবি-দার্শনিক-বিধায়কের যিনি অবশ্যই পুরুষ। পুরোহিত এবং রাজপুরুষ সেই প্রাচীন কাল থেকে তাদের যৌন সম্ভোগের প্রয়োজনে উক্ত বিধানের সহায়তা করেছে। এর ফলে অর্থাৎ ঐ দেবীত্বের, মাতৃত্বের-বা সৌন্দর্যের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে নারী তার স্বাভাবিক দৈহিক বাসনার দাবি ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছে কিংবা বলতে হয় বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অন্যদিক বিবেচনায় নারীদেহের প্রতি পুরুষের অদম্য যৌনআকর্ষণ মেটাতে গিয়ে নারীকে ঘরের বাইরে টেনে আনতে হয়েছে; দেবদাসীতে কুলোয় নি বলে তাকে বারবণিতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরুষ তথা পুরুষ শাসিত সমাজ, সে-সমাজ নিঃসন্দেহে পিতৃতান্ত্রিক রূপে শক্তিমান।

নারীর এই সৌন্দর্যভিত্তিক, দেহকেন্দ্রিক 'মিথ' বহুলী সত্ত্বেও পুরুষ, বিশেষত প্রাচীন সনাতন চেতনার পুরুষ নারীকে এই নেতিবাচক পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে— 'নারী কামনার উৎস', 'নারী নরকের দ্বার' ইত্যাদি ভাব-মূর্তি রচনার মাধ্যমে সম্ভবত পুরুষের একতরফা যৌন-সম্ভোগের অপরাধ ঢাকার জন্য নারীর এ রূপ সৃষ্টি।

AMARBOI.COM

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের নারীবাদী ভাবনা এতটা না হলেও অনেকাংশে নারীকে বিভিন্ন রূপে, নানা চরিত্রে তুলে ধরেছে যেখানে নারীর প্রকৃতিরূপ, সৌন্দর্যের মহিমা কিংবা তার জায়া-জননী ও প্রেয়সীরূপ প্রাধান্য পেয়েছে বন্দনার নেতিবাদী বৈশিষ্ট্যে। বন্দনার মাধ্যমে নারীকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতার সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করা হয় নি। 'আমি নারী— আমি মহিয়সী' কিন্তু কিসের বিনিময়ে ? নিজেকে পুরুষের কামনার ধন, পুরুষের যৌনআকাঙ্ক্ষার ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করার বিনিময়ে কি এ মহিমা অর্জন!

উপরের কথাটা রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার ক্ষেত্রে ঠিক বা বেঠিক যাই হোক এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্যরূপ চিত্রিত করতে গিয়ে উর্বশীকেই টেনে আনেন নি, তাকে বাস্তবতার অবস্থান থেকে সরিয়ে এনেছেন পুরুষের কল্পনার সামগ্রী রূপে— 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' প্রকৃতপক্ষে নারীকে পুরুষের ইচ্ছার সামগ্রী, খেলার সামগ্রীতে পরিণত করেছে, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার বিনাশ ঘটিয়েছে।

পুরুষ শুধু এককভাবে নারীকে 'মনের মাধুরী মিশিয়ে' সৃষ্টি করবে কেন ? নারী কি পারে না পুরুষকে প্রেমের দাবিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন রূপে তৈরি করে নিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপে ভুলিয়ে কিংবা ভালোবাসায় ভুলিয়ে (চিত্রাঙ্গদা বিবেচ্য)। রবীন্দ্রনাথের নারীবাদী ভাবনা সত্যই নানা তত্ত্বের টানে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে যেখানে নারীর প্রকৃত পরিচয়, পারিবারিক-সামাজিক অবস্থান, তার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা চাপা পড়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের দুই নারীতত্ত্বও সেজন্যই বিশেষভাবে বিচারের বিষয়। এ বিভাজন কতটা বাস্তবিক কতটা নন্দনতাত্ত্বিক সে হিসাবও খতিয়ে দেখার মতো। 'দুই বোন' রচনায় শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেছেন যে 'মেয়েরা দুই জাতের,... এক জাত প্রধানত মা, আর একা জাত প্রিয়া'— এ সম্পর্কে আলোচনায় আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন : 'সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল।... সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে, প্রিয়া আছে। কোনটা মুখ্য, কোনটা গৌণ, তাই নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য।'

শর্মিলা-ঊর্মিলার চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথিত দুই নারীতত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অবশ্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'মাতৃঅঙ্কের আবহাওয়া' প্রত্যাশী পুরুষের কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সরস ভাষায় মন্তব্য করেছেন যে এরাই 'বিয়ে করতে যাবার আগে বলে যায়, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।' অর্থাৎ মা আর স্ত্রীর সম্পর্কগত ভেদটা গৌণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে 'এমন পুরুষও আছে যারা স্ত্রীকে স্ত্রী রূপেই চায়, চায় যুগলের অনুষঙ্গ'। যদি তা না পায় তাহলেই দাম্পত্যসম্পর্কে সমস্যার সৃষ্টি হয়। 'দুই বোন' সে সমস্যারই কাহিনী। কিন্তু দুই নারী রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাতেও কম নেই। আর সেসব ক্ষেত্রে এঁর রূপ ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত নারীধারণা সর্বাভাবিক না হলেও তাতে ফাঁক রয়েছে। ধারণা ও অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাঁকে নারী-পুরুষের এ ধরনের চারিত্র্য বিভাজনে প্রণোদিত করেছিল। এ ধরনের বিভাজক বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই উপন্যাস-কাহিনীর জন্য খুবই উপাদেয় উপকরণ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ কথা ঠিক যে 'নারী জল বা স্রোতধারার স্বজাতীয়' এমন ভাবনা বা ঐ দুই নারীতত্ত্ব নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়তো নয়, যতটা প্রতিকূল ছিল এক পর্যায়ে নারীর মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, সতীত্ব বিষয়ে লালিত রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা (শান্তিনিকেতন-বঙ্গদর্শন পর্বে)। তবু মা-প্রিয়াতত্ত্ব ব্যক্তিনারীকে দূরে সরিয়ে রাখে, যা নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে।

নারীর মাতৃরূপ ও প্রেয়সীরূপ নিয়ে দাম্পত্যসম্পর্কে সমস্যা দেখা দিলেও তাতে নারীর স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা যতটা ব্যাহত হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা থেকে যায় রবীন্দ্রনাথ-কথিত নারীর লক্ষ্মী ও উর্বশী রূপের শ্রেণীবিভাজনে। সেখানে বাস্তবিকই নারী একদিকে গৃহপালিত খাঁচার পাখি যদিও আপাতবিচারে মহিমাময়ী, অন্যদিকে সে পুরুষের সৌন্দর্যস্পৃহা মেটানোর স্থলে সম্ভোগতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির মাধ্যম, যদিও রমণীয় নায়িকারূপে তার উপস্থিতি। দেহাতীত সৌন্দর্য এক সময় অবস্থা বৈগুণ্যে রক্তমাংসের লোভন রূপে পরিণত হয় যা নারীর জন্য সর্বক্ষেত্রে কাম্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম বা ভালোবাসা যে নরনারীর ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক তথা উভয়পক্ষীয় হলেই যে তা সার্থক প্রেমের গুণগ্রামে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ তা ভালোভাবে জানতেন মনে করাই সঠিক। তা সত্ত্বেও গভীর কল্পনাশক্তির অধিকারী কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রকৃতি নিয়ে সামাজিক থেকে নান্দনিক মাত্রায় এতটাই ভেবেছেন যে এর ফলে নারী কবির সংজ্ঞায় বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যা নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার কতটা অনুকূল হয়ে উঠতে পেরেছে ভেবে দেখতে হয়। কারণ নারীকে তিনি সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশে যেমন দেখেছেন তেমনি দেখতে চেয়েছেন শারীরতাত্ত্বিক, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক দিক থেকেও। আর এসব দেখার পেছনে যেমন আধুনিক চেতনা কাজ করেছে তেমনি করেছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সনাতন মূল্যবোধ, বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থার নিরিখ। সমস্যা বা জটিলতা এখানেই, এবং এ জটিলতা কবিভাবুক রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা (সেই সঙ্গে পরোক্ষে কিছুটা পুরুষবিষয়ক ভাবনাও) সংক্ষেপে বুঝে উঠতে চাইলে স্পষ্টতই চোখে পড়ে বিষয়টির বহুমাত্রিক চরিত্র। সেখানে স্ববিরোধিতার প্রকাশও অস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্র চেতনায় যে 'অসমন্বিত দ্বন্দ্ব' (মানসী দাশগুপ্ত) পূর্বাপর কমবেশি উপস্থিত ছিল এখানে যেন তারই প্রতিফলন। প্রতিফলন রবীন্দ্রচেতনায় রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা থেকে প্রাচীন ঔপনিষদিক সংস্কৃতির বৈপরীত্যময় উপস্থিতির। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈল্পিক জীবনের শেষ দশকে ভিন্ন চরিত্রে আবির্ভূত হলেও তাঁর মধ্যে অন্তর্নিহিত এ দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল কিনা, অন্তত বিশেষ দু'একটি ক্ষেত্রে ঘটেছিল কিনা সে সম্পর্কে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক অনেকেরই সংশয় থেকে যায়। নারীভাবনা সেক্ষেত্রে অন্যতম।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে-বয়সে পরিবারতান্ত্রিক প্রভুত্ব-দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং আধিপত্যবাদী নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, স্বদেশী সমাজে-পরিবারে নারীর দুঃসহ দুর্দশার প্রতি প্রতিবাদী সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন তা সেকালে ছিল বিস্ময়কর ঘটনা। হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল বিলেতে বসে সেখানকার নারীদের সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান স্বচক্ষে দেখার কারণে। স্বদেশে বসে ঐ বয়সে ঐ ধরনের প্রতিবাদী উচ্চারণ সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। দীর্ঘকাল পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঐ প্রতিবাদী উচ্চারণ 'দুঃসাহস' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাস্তবিক তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা বিচারে ঐ ধরনের বক্তব্যে দুঃসাহসই প্রকাশ পেয়েছিল, যা একমাত্র তারুণ্যে বা যৌবনেই প্রকাশ করা সম্ভব। কেউ কেউ এক্ষেত্রে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিকতাবাদী প্রভাবের কথা বলে থাকেন। প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথের জাতিভেদ-বিরোধী ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য উদ্ধার কথা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঐ প্রতিবাদী সাহসের পেছনে ছিল মূলত পরিবেশ প্রভাব, তাঁর বয়সের প্রভাব। তারুণ্য বা যৌবন এমন এক বয়সকাল যখন মনের কাঁচা পর্দায় অতি সহজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, অতিসংবেদনশীল মানস-স্নায়ুতন্ত্র সহজে উদ্দীপ্ত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। আর সেজন্যই ঐ বয়সই পারে যে-কোনো আদর্শ বা বিশ্বাস বা ধারণার বশবর্তী হয়ে দুঃসাহসী কাজে নেমে পড়তে। লেখা বা প্রতিবাদ তো সামান্য বিষয়, আদর্শ বা বিশ্বাসের টানে ঐ বয়সে আত্মত্যাগ বা প্রাণ বিসর্জন অতি সহজে সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার নারীবাদী উচ্চারণ তার বয়স ও পরিবেশের প্রতি যুক্তিগ্রাহ্য সুবিচার হিসেবে বিচার করা চলে।

তার প্রমাণ এই রবীন্দ্রনাথই প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে স্বদেশে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে কী অবিশ্বাস্য রক্ষণশীল চেতনার পরিচয়ই না দিয়েছিলেন! সময়টা শান্তিনিকেতন-বঙ্গদর্শন পর্বের যখন তাঁর সাধের অভিনব শিক্ষার বিদ্যালয়কে তিনি তপোবন শিক্ষার আদর্শে রক্ষণশীল ও বর্ণাশ্রমিক শিক্ষালয়ে পরিণত করেছিলেন। নিজেও হয়ে ওঠেন আচার্য তথা গুরুদেব, সেই সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের ধারক, বাহক, প্রচারক। কে বিশ্বাস করবে দুই দশক আগের বিদ্রোহী চেতনার রবীন্দ্রনাথের এমন পরিবর্তন ? তবু পরিবর্তনটাই ছিল সত্য। এ সম্পর্কে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এ প্রভাব পুরোপুরি দেখা গেছে সে সময়কার লেখা উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে ও নায়ক-নায়িকার, বিশেষ করে নায়িকাদের চরিত্র চিত্রণে। সে প্রভাব পড়েছে কোনো কোনো কবিতার বক্তব্যে। তাই আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন হিন্দুজাত্যাভিমান ও হিন্দুপুনর্জাগরণবাদের প্রভাবে ক্রমশ তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে যেতে থাকেন, বিশেষ করে সমাজচিন্তায় ও নারীভাবনায় সনাতন রক্ষণশীলতার পরিচয় রেখে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যপ্রভাব ও পিতার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

সনাতন ঐতিহ্যের টান এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে যে-রবীন্দ্রনাথ দু'বছর আগে (১৮৮৭) সনাতনপন্থী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক-ব্যক্তিক ও শারীরতাত্ত্বিক যুক্তি তুলে ধরেন তিনিই মারাঠী নারীবাদী মহিলা রমা বাইয়ের নারীমুক্তি বিষয়ক বক্তৃতার (যাতে কিছুটা অতিশয়োক্তি ছিল) বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তুলে ধরেন নারী-পুরুষের শারীরবৃত্তিক ও কর্মক্ষমতাগত যোগ্যতা ও ভিন্নতার দিক। লেখেন— *'প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো তাহলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত।'*

আর এ সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ নারীর মাতৃত্বদায়, শিশুর জন্মদান ও লালনপালন প্রসঙ্গে চলে যান এবং বলেন যে এজন্যই 'ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান।... অতএব *পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা আমার অসঙ্গত ও অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত, তাতে এই হতো যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত'* (১৮৮৯) 'অধীনতাতে চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়' এমন অসম্ভব কথা রবীন্দ্রনাথ কীভাবে লিখতে পেরেছিলেন ভাবতে অবাক লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি। রমা বাইয়ের উগ্র পুরুষবিরোধী বক্তৃতা তাঁর মনে এতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলে যে 'য়ুরোপপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের' নারীস্বাধীনতা বিষয়ক ভূমিকায় এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে এমনই দিকবদল ঘটল যে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারলেন—

> 'আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকি সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে, অথচ সে বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই।'

তাই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিধান ও নারীর শারীরতাত্ত্বিক দুর্বলতার দোহাই দিয়ে তাদের পুরুষের অধীনে গৃহবন্দি করে সেবিকার ভূমিকায় ধরে রাখতে চেয়েছেন। তিনি একই দোহাই দিয়ে মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করার বিরোধী, নারীর স্বাধীন উপার্জনের বিরোধী হয়ে উঠেছেন। পুরুষের অধীনে (পিতা বা স্বামী) গৃহবন্দি জীবনযাপন তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে এটাই ধর্ম, অর্থাৎ স্ত্রীধর্ম। এমনকি এ কথাও বলেছেন যে অধীনতা চরিত্রে হীনতার জন্ম দেয় না। অথচ বাস্তব সত্য ভিন্ন কথাই বলে। দীর্ঘকাল পুরুষতান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক শাসনে জীবনযাপন করে নারীর মধ্যে শুধু যে হীনতাবোধ, আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদা বোধে অবিশ্বাস জন্মেছে তাই নয়, তাদের প্রায় সবাই দু'চারজন দুঃসাহসী নারীবাদী মহিলার অগ্রসর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কথা বলতে দ্বিধা করেন না এবং তা করেন ধর্মের ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে।

এই ছিল অধীনতার তথা দাসত্বের অভিশাপ। নারীজীবনে তা এত ব্যাপক, এত গভীর, এতটা ঐতিহ্য তথা শিকড়সন্ধানী হয়ে উঠেছে যে পরাধীন, আত্মবিস্মৃত নারীর পক্ষে তা অনুধাবন করাও সম্ভব হচ্ছে না। 'প্রকৃতির বিধান' ও ধর্মের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বচেতনা থেকে দিব্যি সরে এলেন, পূর্বঅভিজ্ঞতা হয়তো মনে ছায়াপাত ঘটিয়ে থাকবে, তাই রমা বাই-বিরোধী রচনার উপসংহারে পৌঁছে *'যাই হোক, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের ধর্ম'* ইত্যাদি উচ্চারণ শেষে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে জোর গলায় কথা বলে জানালেন যে 'এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্য স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড়সঙ্কোচভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক।' অর্থাৎ পুরুষ আপন ঔদার্যে নারীকে দেবে সহায়তা যেন নারী পুরুষের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

নারী ও পুরুষ সমাজে পরস্পরের পরিপূরক— রবীন্দ্রনাথ কথিত এ ধরনের বিশ্বাসে আস্থা রেখেও বলা যেতে পারে যে আধিপত্যবাদীর শুভবুদ্ধির ওপর সব কিছু ছেড়ে দিলে সংশোধন সম্ভব হয় না। শক্তির ও শাসনের ধর্মই হলো আপন স্বেচ্ছাচারিতায় ছাড় না-দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে এটা বুঝতে চান নি বলে (যেমন জমিদার-কৃষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে) তাঁর প্রগতিবাদী ধারণাও কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ভিন্নপথ ধরেছে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা যে শিক্ষিত নারীকে তার স্বাধিকারের প্রধান অবলম্বন অর্থনৈতিক মুক্তির পথ ধরতে প্রেরণা ও সাহস যোগাবে এ সত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চান নি যে পুরুষের শাসনে ও অধীনে নারীর গৃহবন্দি জীবনযাত্রার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধ প্রবল। শুধু বিরোধ নয়, নারীর স্বাধিকার অর্জনও সেক্ষেত্রে অসম্ভব।

এ পর্বে অর্থাৎ শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বের কিছু আগে ও প্রথম দিকে রবীন্দ্রচেতনায় নারীস্বাধিকার প্রশ্নে দ্বিচারিতার প্রকাশ, দুই বিপরীতের প্রভাব ও প্রতিফলন স্পষ্ট। একদিকে তিনি হিন্দু বিবাহ, রক্ষণশীল আচার-আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বসু কিংবা শশধর তকচূড়ামণি প্রমুখ উগ্র রক্ষণশীলদের বিরোধী, অন্যদিকে ঐতিহ্য ও হিন্দুত্ববাদী জাত্যাভিমানের প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধিকার ও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে সনাতনপন্থী, বিশেষ করে নারীবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতার ছায়া এড়াতে পারেন নি। তিনি ঐতিহ্যকে চান, আবার আধুনিকতাকেও ছেটে ফেলতে পারেন না। সনাতন হিন্দুসভ্যতার প্রতি আকর্ষণের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসীয় আলোকবর্তিকার প্রতিও অনুরক্ত তিনি।

তাই ১৮৯২ সালে লেখা 'চিত্রাঙ্গদা'য় তিনি নারী-পুরুষের পরিপূরক ভূমিকার (রবীন্দ্রনাথের নারী-পুরুষবিষয়ক প্রিয় তত্ত্ব) ওপর জোর দেন। চিত্রাঙ্গদার সাহসী উচ্চারণে তারই প্রকাশ ঘটে এই বলে যে—

'দেবী নহি, নহি, আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।'

প্রেমিক অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার এ ধরনের নারীব্যক্তিত্ববাদী আহ্বান কিন্তু সম-অবস্থান থেকে নয়, বরং এতে কৃপাপ্রার্থীর সুর ধ্বনিত হয়েছে, যা স্বাধীন নারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। এখানে রবীন্দ্র মানসিকতার প্রকাশ অস্পষ্ট নয়।

নারী ও পুরুষের সত্যিকার মিলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রত্যাশিত বৃত্তটি তবু এখানে অনেকটা পূর্ণতা পেয়েছে— চিত্রাঙ্গদায় এ ধরনের উদার নারীবিষয়ক ভাবনা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার নারীভাবনার সমালোচকদের মতামত হলো— রবীন্দ্রনাথের পূর্বকথিত নারীস্বাধিকারের চরিত্র এক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রকাশ পায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তর্কচ্ছলে তারা চিত্রাঙ্গদার রূপ পরিবর্তন করে অর্জুনের অনুরাগ অর্জন ও মন জয়ের কথা বলে থাকেন। বলেন, এটা স্বাধীন স্বচ্ছ প্রেমের প্রকাশ নয়। এ যুক্তি একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবু স্বীকার করতে হয় যে চিত্রাঙ্গদার ঘোষণায় যে বলিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটেছে, নারী-পুরুষের পারস্পরিক ভূমিকার যে মেলবন্ধনের কথা বলা হয়েছে তা নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার প্রত্যাশা পুরোপুরি পরিস্ফুট না করেও অন্তত নারী-স্বাধিকারের পটভূমি রচনা করেছে, যদিও চিত্রাঙ্গদার আহ্বানে দীনতার প্রকাশ, উচ্চ-নীচ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। অর্জুনের অনুমতি চেয়েছেন চিত্রাঙ্গদা মাথা নিচু করে। এটা সমাবস্থানের পরিচায়ক নয়।

ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে চিত্রাঙ্গদা রচনার (১৮৯১) কয়েক বছর পরও সনাতন ঐতিহ্যের অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি'র কবিতায় (দুই উপমা, ১৮৯৬) সনাতন হিন্দুত্ববাদিতার সমালোচনা করেছেন চড়া গলায়। পাঁচ বছর পরে যে-সংহিতা হবে সর্বাংশে অনুসরণযোগ্য, সে সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পায় উক্ত কবিতার চরণগুলোতে—

যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার...
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ-'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

এভাবে রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তায় যে দ্বিচারিতার প্রকাশ তা এ সময়ে তার নারীবিষয়ক ভাবনা ও বক্তব্যে পরিস্ফুট। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে যে হিন্দুত্ববাদ ও জাত্যাভিমানের প্রকাশ, তা স্বল্পকালের জন্য (ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে) রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করার কারণে এবং সেই সঙ্গে একাধিক কারণ-উপকরণ যুক্ত হয়ে (রাজনীতি-সমাজসংস্কার-অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথকে সাময়িক সনাতনপন্থী ও হিন্দুত্ববাদী করে তুলেছিল। এর প্রভাব যে তার নারীভাবনায় পড়বে তা বলাই বাহুল্য। তাই পূর্বোক্ত দ্বিচারণা অতিক্রম করে এ পর্বের রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও চরিত্রসৃষ্টিতে হিন্দুত্ববাদ ও সনাতন রক্ষণশীলতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটান, আবার ঘটান ভিন্ন ধারণারও।

এর পরিচয় মেলে অংশত 'চোখের বালি'র নায়িকার পরিণামে, 'নৌকাডুবি'র সর্বাংশে, 'শিবাজী উৎসব' থেকে 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' ইত্যাদির কবিতায়। 'নৌকাডুবি'তে আধুনিক চেতনার নৌকাডুবি ঘটিয়ে কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন সনাতন হিন্দুআর্দশের রূপ, সতীত্ব-পত্নীত্বের মহিমা। একই সঙ্গে 'স্ত্রীধর্ম' এবং সমধর্মী প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে অনুরূপ বিশ্বাস। এক কথায় কবিতায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে এবং বিশেষভাবে উপন্যাসে নারীকে সতীত্ব-পত্নীত্ব ধর্মের পীড়নে রেখে মাতৃত্ব ও জায়া-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জননীর গৃহধর্ম ও পতিসেবার মহিমা প্রচার করা হয়েছে। গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিশদ আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এর কারণ হিসেবে আমাদের বক্তব্য সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় যেখানে লেখক বলেছেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব, পিতার প্রভাব, সংস্কারবিরোধী ব্রাহ্মনেতাদের সান্নিধ্য, সর্বোপরি তৎকালীন সমাজমানসে জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার পরিব্যাপ্ত প্রভাব একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথের মনকে অতীতসচেতন করে তুলেছে,... এরই ফল-পরিণাম 'নৈবেদ্য' কাব্য, অন্যদিকে এই একই ভাবনার অন্যতর ফল-পরিণাম শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম।" প্রসঙ্গত শ্রী রায় এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আপন মেয়েদের বাল্যবিবাহ দান, বিয়েতে যৌতুকদানের মতো ঘটনাদির উল্লেখ করেছেন সমালোচনার ভঙ্গিতে। কিন্তু বিস্তারিত উল্লেখ করেন নি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন নারীভাবনার সাহিত্য-ফসলের কথা।

অবশ্য উল্লেখ করেছেন নিবন্ধাদিতে প্রতিফলিত কবি-সমাজসংস্কারকের রক্ষণশীল ধারণার কথা, বাল্যবিবাহের পক্ষে ও বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতের কথা, গৃহের কল্যাণ-শ্রী রক্ষায় নারীর নিবেদিতরূপের প্রতি মুগ্ধ সমর্থনের কথা। উদ্ধৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কিছু অবিশ্বাস্য বক্তব্য, যেমন— *'বিধবা বিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্যদিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।'*

নারীর ব্যক্তিমূল্য, অধিকারবোধ বিসর্জন দিয়ে হলেও পরিবারের বন্ধন (তা নারীবিশেষের জন্য মরণফাঁস হলেও) কথিত শুদ্ধতা পবিত্রতা ইত্যাদি রক্ষার জন্য নারীর কল্যাণ-শ্রী অপরিহার্য, তাতে জীবন বলিদান সম্পন্ন হলেও ক্ষতি নেই, গৃহধর্ম তো রক্ষা পেল! 'গৃহের সেবাকাজ নিবেদিতপ্রাণ গৃহলক্ষ্মীর জন্য উন্নত অধিকার, ইহাতে তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান।' এতে 'অগৌরবের কিছু নেই'। একসময়কার যুক্তিবাদী আধুনিক চিন্তার ধারক রবীন্দ্রনাথ এভাবে হিন্দুত্ববাদী আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে এক পর্বে নারীর সব অধিকার অস্বীকার করেছিলেন। তখন 'নারীকে দেখেছেন পরিবার ও সমাজের একটি দামি এবং সুন্দর কল্যাণসাধক যন্ত্র হিসেবে' (রায়)। বলা বাহুল্য এ দেখা তাঁর রেনেসাঁসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক বিপরীত।

নারী ও পুরুষের শারীরতাত্ত্বিক ভিন্নতাকে (পূর্বে উল্লিখিত) ভিত্তি করে, রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে একাধিক প্রবন্ধে নারী-পুরুষের পারস্পরিকতা এবং উভয়ের ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিচারে নারীকে অধস্তন শ্রেণীতে ঠেলে দিয়েছেন। নারী-পুরুষের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দীর্ঘকাল উপস্থিত ছিল। সংসারের কল্যাণ-শ্রী, গৃহলক্ষ্মী নারী, সৌন্দর্যের আধার নারী ইত্যাদি 'মিথ' তৈরি করে নারীকে মানবীমূল্যে, ব্যক্তিমূল্যে বিচার করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একে আর যাই হোক আধুনিক চেতনার প্রকাশ বলা চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

পিতার মৃত্যু (১৯০৫), 'স্বদেশী সমাজ'-এর মুক্ত চেতনা (অবস্থা ও ব্যবস্থা, ১৯০৫) এবং 'গোরা' উপন্যাস রচনার (১৯০৭ থেকে) কাল রবীন্দ্রচেতনার উত্তরণ পর্বের সূচনা বলে ধরা হলেও 'গোরা' উপন্যাসের মূল নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র বিচার করতে গেলে সেই পিছুটানের ছায়া চোখে পড়ে, যদিও পড়ে না দ্বিতীয় সারির নায়ক-নায়িকাদের (বিনয়-ললিতা) ক্ষেত্রে। তবে অচলায়তনের ভাঙন যে শুরু হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বুঝতে পারা যায় যে তাঁর নারীবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করছেন প্রত্যাশিত বৃত্তে যেখানে রক্ষণশীলতা সক্রিয় নয়।

এমনি মোহভঙ্গের ধারাবাহিকতা যতটা উপন্যাসে তার চেয়ে অনেক বেশি (গুণগত মাত্রায়) কখনো প্রবন্ধে কখনো কবিতায় বিশেষভাবে ছোটগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবারের বাইরে, গৃহসেবার উর্ধ্বেও যে নারীর ব্যক্তিক ভূমিকা থাকতে পারে এবং তা সমাজহিত ও সমাজকল্যাণে সাহায্য করতে পারে তেমন বোধোদয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনায় পরিস্ফুট। 'নারীপ্রসঙ্গ' (১৯২৩) নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত বিস্ময়করভাবে তাঁর রক্ষণশীল পূর্বধারণার ঠিক বিপরীত।

তাঁর ভাষায়—

> 'শিক্ষায় রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনো শক্তি সত্য ও গভীর হয় না।... আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার।... মানবসভ্যতার সাধনা এতদিন পুরুষের সাধনা-মাত্র ছিল। কাজেই.. এই সভ্যতার প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বর্তমান নারীর সেবা হতে বঞ্চিত এবং কেবল পুরুষের চেষ্টাজাত জাত বলে তার মধ্যে লোভ, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এসবই দেখা দিয়েছে। তাই আজ সর্বজগৎ পীড়িত ও ব্যথিত।
>
> নারীর যে মহাশক্তি আছে, তা কেবল তাদের গৃহসংসারেই লুটে নিচ্ছে, দেশ আর নারীর সেবা পাচ্ছে না। কাজেই বঞ্চিত দেশ দরিদ্র রয়ে গিয়েছে। হৃদয়ের রস ও কর্মের শক্তি ঘরে ও সংসারেই রয়ে গিয়েছে। এই হেতু দেশ বহু দুঃখগ্রস্ত।'

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলছেন, নারীকে আহ্বান জানাচ্ছেন ঘরের বাইরে এসে সমাজ, দেশ, দশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। এ আহ্বান নারীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের অনুকূল, তার ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রেক্ষাপট।

কিন্তু এ সময়েও কোনো কোনো প্রবন্ধের বক্তব্যে নারী-পুরুষের দৈহিক ভিন্নতার কথা, তাদের কর্মস্থানের ভিন্নতার কথা বলেছেন, অনেকটাই পুরনো সুরে। তবে তা স্থায়ী উপকরণ হয়ে উঠছে না। তার প্রমাণ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধটি। দীর্ঘ এ প্রবন্ধে নারী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে যেন ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন। তাঁর ভাষায় 'ভারতীয় বিবাহে (হিন্দু বিবাহের কথা বলা হলেও মুসলমান সমাজেও তা ভিন্ন নয়, বন্ধনীস্থ বক্তব্য গ্রন্থকারের) স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই।' বরং 'বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দি করে রাখবার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালা পুরুষপ্রভুত্বের তকমাপরা। তাই সকল সমাজেই নারী আপন প্রকৃতির পরিপূর্ণতার দ্বারা সমাজকে যে-ঐশ্বর্য দিতে পারত, তা দিতে পারছে না।'

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করছেন, নারীকে গৃহবন্দি করে রাখার মধ্যে (যা বঙ্গীয় সমাজে ছিল প্রবল) সমাজের বা দেশের উন্নতি নেই। আর নারীর এ বন্দিদশার কারণ পুরুষের আধিপত্যবাদী শাসন। পুরুষ যে নারীর প্রতি মানবিক আচরণ করতেও নারাজ সে কথাও প্রবন্ধের উপসংহারে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠককে জানাতে ভুলে যাচ্ছেন না। 'কামিনী-কাঞ্চনের দ্বন্দ্বসমাস'-এর ইতরতা এখন তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে 'পুরুষ এখনো মনে করে যে সেই হোলো মানুষ, তারই মুক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, নারীকে সে কাঞ্চনের মতো নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে ত্যাগ করতে পারে।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিক সম্পর্ক বিচারে মুক্তচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আঘাত এক্ষেত্রে পুরুষেরই ওপর, তার নারীবিষয়ক অবিবেচক মানসিকতার ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে নর-নারীর ভিন্নতাবোধ বিদায় নেয় নি, এমনকি দুই নারীতত্ত্বের কথাও প্রসঙ্গত এসেছে। বলা হয়েছে 'নারীর দুইটি রূপ, একটি মাতৃরূপ অন্যটি প্রেয়সীরূপ।' নারীর মাতৃত্বরূপের ওপর গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিসত্তার অবমূল্যায়ন ঘটানোর প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একধরনের 'অবসেসন' হয়ে ধরা ছিল দীর্ঘদিন।

এ ভাবপ্রবণতা থেকে রবীন্দ্রনাথ কতটা মুক্তি পেয়েছিলেন তা বিবেচনার বিষয়। আর নারীর যে প্রেয়সীরূপের কথা বলা হয়েছে তাতে প্রথমদিকে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার রূপটিও তাঁর চোখে স্পষ্ট ছিল না। নারীর সৌন্দর্য নিয়ে স্তবস্তুতি তো প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা ভুলিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বই কিছু নয়। এ সত্য কবি-রবীন্দ্রনাথ বুঝতে না চাইলেও সমাজ নিয়ে ভাবনায় নিরত চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারবেন না এমন নয়।

তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নারীর দৈহিক ভিন্নতা, তার শারীরবৃত্তিক সীমাবদ্ধতার সামাজিক-পারিবারিক দিকের ওপর বরাবর গুরুত্বারোপ করে এসেছেন। জোর করে বলতে পারেন নি যে প্রকৃতি-আরোপিত এ সীমাবদ্ধতার সুযোগ-সুবিধা সবটাই নিয়েছে পুরুষ এবং পুরুষশাসিত সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তি। বলতে চান নি যে এ অন্যায়, এ একধরনের শোষণের প্রক্রিয়া, এ শোষণ জৈবধর্মের হয়েও অর্থনৈতিক শোষণের, সামাজিক শোষণের এমনকি ব্যক্তিক শোষণের পথ খুলে দিয়েছে। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে 'জীবলক্ষ্মীর' পালক শক্তিই নারীর মধ্যে বন্ধনজাল তৈরি করেছে যা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। অর্থাৎ দায়টা পুরুষের নয়, 'বায়োলজি'র। আর এ 'বায়োলজি' প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথেরই। তা না হলে তাঁর সৃষ্ট বিপ্লবী নায়িকা এলা বলবে কেন, 'আমরা বায়োলজির সঙ্কল্প বহন করে এনেছি জগতে।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সমাজে এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্য তথা ভারতীয় সমাজেও এর অর্থনৈতিক আরো নানা প্রভাবের জের এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সে পরিবর্তন সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে যে স্পর্শ করে নি এমন নয়। সে তাড়নার প্রভাব ছিল তৎকালীন অনেক লেখকের চেতনায় এবং সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ কি এর ব্যতিক্রম ? কিন্তু ব্যতিক্রম না হলেও বাস্তবজগৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপরীত দিকটা রবীন্দ্রচেতনায় কিছুটা হলেও তুলে ধরেছিল। তা না হলে প্রবন্ধে-নিবন্ধে নারী-ভাবনার দুই বিপরীতে দোলায়িত রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী' বা 'স্ত্রীর পত্রে'র মতো গল্প তৈরি হবে কেন ?

অবশ্য এর পেছনে প্রমথ চৌধুরীর ও *'সবুজ পত্রে'*র প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাস কয় আগে ১৯১৪ সালে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়িল সবুজপত্রের মধ্যে'। রবীন্দ্রনাথ এ কাগজের আদর্শ ও ভাবনা চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। আর *সবুজপত্রেই* রবীন্দ্রনাথের নারীবিদ্রোহাত্মক গল্পগুলো প্রকাশিত হয়। এ সুবাদে কেউ যদি বলেন, প্রাবন্ধিক-চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গল্পকার ও কবি (যদিও কিছুটা পরে) রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার উদ্ভাস অধিক মাত্রায়, তাহলে দ্বিমত পোষণ করা যায় না। আর মনে রাখা দরকার যে 'নষ্টনীড়' গল্পটি এগুলোরও অনেক আগে লেখা।

প্রশ্ন উঠতে পারে— তাহলে কোন রবীন্দ্রনাথকে আমরা অধিক শিরোপা দেব, সমাজ-সংস্কৃতির বিচারে আধুনিক ও প্রগতিবাদী বলে চিহ্নিত করব ? প্রাবন্ধিক-চিন্তাবিদ-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে, না কবি-গল্পকার রবীন্দ্রনাথকে ? অবশ্য 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' (১৯২৫) এবং পরবর্তী একাধিক রচনাতে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা বাস্তবের অন্বেষায় মগ্ন। তাঁর কবিতা বা গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা রোমান্টিক, দেহাতীত প্রেমের স্বপ্নঘোর থেকে যে বেরিয়ে এলো তার পেছনে যেমন রয়েছে *সবুজপত্র* গোষ্ঠীর শৈল্পিক বিদ্রোহের প্রভাব, তেমনি বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বাস্তব প্রেক্ষাপটও সেক্ষেত্রে কম নিয়ন্ত্রক শক্তি নয়।

সাত

তাই 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা এবং জ্যাঠামশাই ও ননীবালা (১৯১৬) যেমন নারীকে বাস্তব জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তেমনি দিয়েছে 'পয়ল নম্বর'-এর (১৯১৭) মতো একাধিক গল্পের নায়িকা। নারীর জন্য প্রচলিত সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা অর্থাৎ ঘর ও বাহির যে সমান বিপর্যয়ের উৎস এ কথা এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রষ্টার ক্রমশ জানা হয়ে গেছে, আর তাই আঁকতে হয়েছে, 'বলাকা'র (১৯১৬) যৌবন চঞ্চলতা পেরিয়ে 'পলাতকা'র (১৯১৮) এবং 'মহুয়া'র (১৯২৮) সবলা নারীদের জীবনচিত্র, ব্যক্তিজীবনের মর্মকথা। তবে এদের কেউ যেমন অচলায়তন ভাঙার জন্য হাহাকারের মধ্য দিয়ে জীবন শেষ করেছে, কেউ আবার আপোসহীন সাহসের পরিচয় রেখেছে প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙায় (যথাক্রমে 'মুক্তি' ও 'নিষ্কৃতি') যা কবিতার শিরোনামেই অর্থবোধক।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক তাড়নার প্রেক্ষাপটে এবং নব্য রাশিয়াসহ নানাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনে নারীবিষয়ক ভাবনা কি গুণগত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছিল ? স্বদেশে নারীশিক্ষা ও নারীর কর্মক্ষেত্রের বহির্মুখী প্রসার, রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাব, শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিচৈতন্যে মননশীলতার উদ্ভাস— এ সব কিছু সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নারী-পুরুষ ভাবনার চিরাচরিত পিছুটানের ওপর গভীর আঁচড় কেটেছে, চিরন্তনী নামে পরিচিত মূল্যবোধের গায়ে চড়ানো বাড়তি রঙ বোধহয় ক্রমশ ঝরে পড়তে থেকেছে।

ঝরে পড়তে থাকার কথা বলা এ কারণে যে কবিতায় যিনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী, যিনি ছোটগল্পে অনুরূপ সম্ভাবনা তুলে ধরেন নারীর আহত বা বিপর্যস্ত ব্যক্তিসত্তার পক্ষ নিয়ে, কিংবা নাটকে যেখানে (রক্তকরবী, ১৯২৩) আদর্শ নারী (নন্দিনী) প্রাণের বেগ বয়ে এনে মুক্তজীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে, ওঠে নাট্যকারের সস্নেহ প্রশ্রয়ে; সেই রবীন্দ্রনাথই আবার উপন্যাসে তাঁর যত্নে গড়া নায়িকাকে (কুমু) মাতৃত্বের জবরদস্তিমূলক মূল্যবোধের কারণে পিছুটানের শিকার হতে বাধ্য করেন। অন্যদিকে প্রায় সমকালীন প্রবন্ধে (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি-৩, ১৯২৫) নারী-পুরুষের কর্ম, ধর্ম ও প্রকৃতিগত ভিন্নতার পক্ষে কথা বলেন। একেবারে শেষ বয়সে লেখা 'তিন সঙ্গী'র অন্যতম গল্পের নায়িকা অচিরার প্রেম বাস্তবিকই পুরুষের সাধনায় বিঘ্ন হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের পূর্বধারণার পরিস্রুত রূপের প্রকাশ ঘটায়। এজন্যই বলতে হয়েছে নারীমুক্তি ও নারীস্বাধীনতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ দ্বিচারণা থেকে আদৌ মুক্তি পেয়েছিলেন কিনা ভেবে দেখার বিষয়।

আশালতা সিংহ বা নীলিমা দেবীকে (দাসকে) লেখা চিঠিতে (যথাক্রমে ১৯২৮ ও ১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের নানামাত্রিক ভিন্নতার কথা উচ্চারণ করেও (যেমন— 'স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা অস্বীকার করা ভুল') কিংবা প্রকৃতির দিক থেকে তাদের মা হবার অত্যন্ত তাগিদ সত্ত্বেও 'নারীর মনুষ্যত্ব' তথা তার স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। 'আত্মোপলব্ধি ছাড়া যে স্বাধীনতা' হতেই পারে না এমন সঠিক বোধ বা ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠির বক্তব্যে (আশালতা সিংহকে লেখা) স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এবং প্রাচীন যুগের সঙ্কীর্ণতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে 'মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ বিশেষ মোড়কেই তাদের (মেয়েদের) পরিচয়। তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্যটি মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো বা অস্বীকৃত কখনো বা নিন্দিত।... আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবি করছে।... সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য। মানব সমাজে এই আত্মশ্রদ্ধার বিস্তারের মতো এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না।'

দেখা যাচ্ছে নারীর মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব তথা স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার দাবি রবীন্দ্রনাথ এবার আর উপেক্ষা করছেন না, যদিও আশা করছেন তারা 'কৃত্রিমবন্ধন মুক্ত হয়ে তবেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে'। সৌখিন প্রগতিচেতনা রবীন্দ্রনাথ কখনো সত্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন নি।

অন্যদিকে নীলিমা দেবী (দাস)-কে লেখা চিঠিতেও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষেই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও এ ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ অর্থে দেখতে চেয়েছেন বলেই লিখেছেন 'আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বিবাহসম্বন্ধ নিয়ে স্ত্রীলোকের দুঃসহ অবমাননার অন্ত নেই, প্রতিদিন কত আত্মহত্যা ও ততোধিক দুর্গতির ইতিহাস এখানকার মানুষ অবিচলিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনে আসছে'। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তি বা সমাজ এ অবিচার-অনাচার রোধ করতে এগিয়ে আসছে না। আসছে না সমাজে পুরুষের শাসন-কর্তৃত্বের প্রবলতার কারণে। নারীর এ দুঃসহ সামাজিক-পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত অনুভব নিঃসন্দেহে একই সঙ্গে তাঁর আধুনিক-চেতনা, মানবিক বোধ ও উদার বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক যা হয়তো তার পরিবর্তিত বিশ্বাসেরও অন্তর্গত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একই সময়ে তার সৃষ্ট কুমু-চরিত্রের প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি কেন সে রহস্যের জবাব পাওয়া যায় না। কুমুকে তিনি মাতৃত্বের দায়ে স্বামীর স্থূল লালসার কাছে বলি দিয়েছেন। দাদা বিপ্রদাসের মুখ দিয়ে যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য প্রকাশের পরও কুমুর গতি হলো এমন এক কুঠুরিতে যেখানে পুরুষের অন্ধ প্রতাপের অহঙ্কার আর লালসাসিক্ত যৌন-অনাচারের কালো ছায়া। প্রেম বা ভালোবাসা সেখানে অনুপস্থিত। কুমুর চরিত্রের সঙ্গে এবং মাঝে মধ্যে স্ফুট তার বক্তব্যের সঙ্গে এ আচরণ মেলে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত মাতৃত্বতত্ত্বেরই জয় হয়েছে। অথবা বলা যায় এখানে তিনি স্ববিরোধিতার শিকার।

অন্যদিকে 'কালান্তর'-এর 'নারী' প্রবন্ধে (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ আবার যথারীতি তাঁর নারী-পুরুষের ভিন্নতা তত্ত্ব (বিষয়টা কি কবির 'অবসেসনে' পরিণত হয়েছিল ?) হাজির করার পরও ঘরে-বাইরে নারীমুক্তির প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলেছেন, 'ব্যক্তি-হননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।' এবার নারীস্বাধিকারের প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক ও সর্বজনীন। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীমুক্তির সীমাবদ্ধতার দিকগুলোও সম্ভবত তার চেতনায় উপস্থিত ছিল। তাই বলতে পেরেছেন, 'সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই।' সনাতন সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা যে পিছু হটেছে তার প্রমাণ রাখে এমন নগ্ন সত্যের প্রকাশে যে 'নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী'। তাই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান : 'মেয়েরা যেন নবযুগের উপযোগী মুক্ত মন নিয়ে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসে বিশ্বলোকের কাজে অংশ নিতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব প্রবন্ধের অগ্রসর চেতনা সত্ত্বেও তাঁর কিছু সৃষ্টিকর্মে, বিশেষত উপন্যাসে বা একেবারে শেষ পর্বের কয়েকটি গল্পে (যেমন 'তিন সঙ্গী'র) রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধীনতা ও নারীর স্বাধীন ব্যক্তিধর্মের প্রতি পর্যাপ্ত সুবিচার করতে পারেন নি এমন অভিযোগ একাধিক পাঠক ও সমালোচকের। এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। রবীন্দ্রনাথের নারীমুক্তি ও নারীস্বাধিকার বিষয়ক ভাবনায় পূর্বাপর লালিত কিছু পিছুটান বা মোহ হয়তো এসব ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে তাঁর শেষ দিককার উদার চেতনার ওপর প্রলেপ বুলিয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন ঘটিয়েছে। এ ছাড়া উপন্যাসের নায়িকাদের ক্ষেত্রবিশেষে আর্ষচরিত্রের ও আচরণের ব্যাখ্যা মেলে না।

এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর রবীন্দ্রনাথের নায়িকা চরিত্রের 'ট্রিটমেন্টে'-এ স্ববিরোধী দ্বিচারিতা। সেজন্যই কুমুর ট্র্যাজেডি পেরিয়ে কিংবা 'তিন সঙ্গী'র আধুনিক অচিরার অনাধুনিক চেতনার পাশাপাশি সোহিনী চরিত্রের তেজ এবং সমকালের 'সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজমের' প্রেক্ষাপটে সোহিনী চরিত্র আর যাই হোক রক্ষণশীল সতীত্ব ধারণার জীর্ণতাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আধুনিকতার নতুন নিরিখ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। পতিভক্তিতেই স্ত্রীধর্মের যথার্থ প্রকাশ— রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন লালিত এ বিশ্বাসের শিকড় কেটে দিয়ে তবে তাঁরই হাতে সোহিনী চরিত্রের সৃষ্টি, যদিও সোহিনীর অতি আধুনিকতার উগ্রতা নারীমুক্তি ও নারীস্বাধিকারের কতটা সহায়ক সে সম্পর্কে কারো কারো (যেমন সুতপা ভট্টাচার্য) সঙ্গত প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনে হয় বিষয়টিতে নিহিত জটিলতা ও তার ভালোমন্দ নিয়ে বিতর্কে তিক্তবিরক্ত রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অতিপ্রতিক্রিয়াবশতই নারীস্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে সোহিনী চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসঙ্গত এর বিপরীতে 'প্রগতি সংহার' (১৯৪১) গল্পটি বিবেচ্য। তবু হাজার বছরের সংস্কারে গাঁথা অচলায়তন ভাঙতে হয়তো সোহিনীর মতো অতি উগ্র ও কিছুটা অস্বাভাবিক চরিত্রের আঘাত দরকার পড়ে। এ অর্থেই চরিত্রটি বিবেচ্য।

আট

সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীবিষয়ক ভাবনায় সূচনালগ্নের বিস্ফোরক মন্তব্যের পর স্বল্পকালীন দ্বিচারিতার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে পিছুটান ও রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটান ঐ পর্বে লেখা প্রবন্ধে ও সৃষ্টিকর্মে (কবিতা বা উপন্যাসে)। এ পর্বের সময়কাল দীর্ঘ না হলেও তা তীব্র রক্ষণশীলতায় চিহ্নিত। শুধু উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে বা প্রবন্ধের অবিশ্বাস্য বক্তব্যেই নয়, তখনকার বিশ্বাসচিহ্নিত জীবনাচরণে ও কর্মযজ্ঞে (এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও) সে প্রভাব পরিস্ফুট।

ক্রমে পরিবেশবিষয়ক কিছু সুপ্রভাব ও প্রভাবের অভাব (যেমন মহর্ষি পিতার মৃত্যু), বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা (সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক) কবি-চিন্তাবিদ-সমাজভাবুক রবীন্দ্রনাথকে তার পূর্ব অবস্থান থেকে সরে আসতে সাহায্য করে। কিন্তু এ সরে আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল ধীরগতির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো। তাই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় দ্বিচারিতার প্রকাশ যথেষ্ট মাত্রায় ঘটেছে, যার রেশ শেষাবধি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উপস্থিত ছিল বলে সমালোচকদের কারো কারো অভিযোগ। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে এটা ছিল 'পরিণতির পর্ব' যা যথেষ্ট দীর্ঘ। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধীনতা ও নারীর স্বাধীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতার বিরোধী নন, তা সত্তেও নারীর দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটেছে, যে-সম্বন্ধে এ কালের নারীবাদীগণ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নারীর সমস্যা ও দুদর্শা সম্পর্কে সচেতন হয়েও তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার আলোকে নারীসমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন।

এ প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে নারীস্বাধীনতা ও নারীমুক্তির প্রত্যক্ষ প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে না চাইলেও তাকে নারীপ্রগতি বিরোধী বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা ক্রমউত্তরণের পথ ধরে নারীর অসহায়তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, নারীনির্যাতন ও নারীর গৃহবন্দিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য মতামত তুলে ধরেছে। এ অবস্থা যে সার্বিক বিচারে সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর, পুরুষের আদর্শ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রার সহায়ক নয় সে সত্যও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

এ জাতীয় ভাবনার শৈল্পিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যপর্ব থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের শেষ দশকের কিছু আগে থেকে— বিশেষভাবে কবিতায় ও ছোটগল্পে, অংশত উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে। রক্ষণশীল পর্বের পরও উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সীমাবদ্ধতার (মধ্যপর্ব থেকে শেষ পর্বে) প্রকাশ নিয়ে লেখক-পাঠকের অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। এর কারণ সম্ভবত নারী-পুরুষ এবং সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু ধারণা ও বিশ্বাস যা তার আধুনিক চেতনায় পরিস্রুত হয়েও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বিশেষ করে, নারী-পুরুষের শারীরবৃত্তিক ভিন্নতা যা বিজ্ঞানভিত্তিকও বটে এবং সেই সূত্রে নারীর জৈবনিক সীমাবদ্ধতার দিকটি। এর ফলে তাঁর ধারণার প্রকাশে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এর পারিবারিক ও সামাজিক অভিক্ষেপ তাঁর কাছে সমস্যা বলে মনে হয়েছে যা তাকে ভাবিত করেছে যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানে পৌঁছাতে। অন্যদিকে পুরুষের পক্ষে নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ এবং 'এক্সপ্লইটেশন' (শোষণ) রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায় নি। কিন্তু এর সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ সমাধান খুঁজে পান নি রবীন্দ্রনাথ। নারীর ওপর থেকে অধিকার উঠে গেলেই যথাযথ অর্থে নারী-স্বাধীনতা অর্জিত হবে এমন ভাবনা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। বরং নারী-পুরুষের আন্তরিক পারস্পরিকতা সমস্যার সমাধান আনতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছে। যেজন্য রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নারীর অসহায়ত্ব, তার ওপর পুরুষের আধিপত্যবাদী অনাচার কবি-কথাশিল্পী-চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ব্যথিত করেছে। আর সেজন্যই এমন মন্তব্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে যে 'আমাদের (অর্থাৎ পুরুষদের) অবাধ অধিকারের ক্ষেত্র আমাদের স্ত্রী' ('নারীর মনুষ্যত্ব')। অর্থাৎ স্ত্রীর ওপর যেমন খুশি অত্যাচার, অনাচার চালানো যেতে পারে, কারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী স্বামীর এবং সংসারের এমন এক পণ্য যার আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনুরূপ একাধিক মন্তব্য (নারীর পক্ষে) তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। এমনকি উপন্যাসের যেসব চরিত্র নিয়ে অভিযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্র থেকেও দু'একটি মন্তব্য বা বক্তব্য উদ্ধার করা সম্ভব যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর পক্ষেই কথা বলে। যেমন স্থূলরুচি স্বামীর প্রবল যৌনকামনার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবার পর কুমু তার সতীত্ববোধের ওপর প্রবল আঘাত নিয়ে ভাবতে থাকে 'ঠাকুর, তোমার ভক্তকে বিক্রি করে দিলে কোন দাসীর হাটে... সে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়।' এক্ষেত্রে স্বামীর যৌনলালসাতৃপ্তি তার কাছে ধর্ষণ বলে মনে হয়েছে, যে জন্য এক ধরনের অশুচিতাবোধ তাকে পীড়া দিয়েছে যে অশুচিতা কুমুর চোখে অসতীত্বের প্রতীক।

অন্যদিকে বিপ্রদাসের প্রতিক্রিয়াও অনুধাবন করার মতো। তাঁর ভাষায় 'সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে, সহ্য করব না।' কুমুর অনুভব ও ভাবনা এবং বিপ্রদাসের উপরে উদ্ধৃত বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই চিন্তাভাবনা ও অনুভবের প্রতিফলন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নায়িকাকে ফিরে যেতে হয়েছে কামতাড়িত স্থূলরুচির স্বামী মধুসূদন ঘোষালের শয়নকক্ষে, যে ব্যক্তিটি অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তিমানুষের মূল্য হিসাব করে থাকে। আর কুমুর এ ফিরে যাওয়া যে তার স্রষ্টার ইচ্ছায় সে সত্যও অস্বীকারের উপায় নেই।

এ ধরনের স্ববিরোধিতার আরো উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের শেষদিককার রচনা থেকেও তুলে ধরা যায়। আর এসব কারণে যুক্তিসঙ্গত পথেই আমরা দেখে নিতে চাই রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের দ্রোহ ও আত্মসমর্পণে, প্রতিবাদে বা আপোসবাদিতায় রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনার কতটা প্রতিফলন ঘটেছে এবং তা কীভাবে ঘটেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে-আলোচনা বা বিচারবিশ্লেষণই প্রকাশ পেয়েছে, তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘চোখের বালি’
আধুনিকতা ও সনাতন চেতনার সংঘাত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার উপন্যাস ‘করুণা’, ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি’র পর ‘চোখের বালি’ প্রথম এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয় যার ফলে উপন্যাসটি সমকালে এবং পরবর্তী সময়েও আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নারীব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সমাজে প্রচলিত কিছু রক্ষণশীল বিধিবিধান অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছে, চেয়েছে নারীর ব্যক্তিসত্তাকে যোগ্য মর্যাদায় স্থাপন করতে, নারীর স্বাধীন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিতে। এজন্যই কারো কারো বিচারে এ উপন্যাসের নায়িকা ‘বিদ্রোহিনী’র মর্যাদা পাবার যোগ্য।

কিন্তু নারী-ব্যক্তিসত্তার সে চ্যালেঞ্জ শেষপর্যন্ত টেকে নি। টেকে নি ঘটনা-পরম্পরার বাস্তবতার কারণে নয়, বরং তা ঘটেছে লেখকের ইচ্ছার চাপে। যে-ইচ্ছায় রচনার খসড়া পর্যায়ে দেওয়া ‘বিনোদিনী’ নাম পর্যন্ত প্রকাশের সময় ‘চোখের বালি’তে হারিয়ে যায়। এ পরিবর্তনের তাৎপর্য অনুধাবন করার মতো। বাস্তবিকই বিনোদিনী এ কাহিনীর ঘটনাক্রমে চোখের বালি হিসেবে বিবেচ্য। হতে পারে যে-ইচ্ছা ও মানসিকতা নিয়ে উপন্যাসটির রচনা শুরু, দীর্ঘসময় (অন্ততপক্ষে চার বছর) ধরে লিখে চলার কারণে এবং ইতোমধ্যে লেখকের চেতনায় ক্রমসঞ্চরমান ভিন্নতর রক্ষণশীল প্রভাব এসে পূর্ব ধারণা বাতিল করে দেয়, কাহিনী ভিন্ন পথ ধরে চলে। এ অনুমান প্রমাণের পক্ষে খসড়া পাণ্ডুলিপির প্রথম ও সংশোধিত ভাষ্য হাতের কাছে সুলভ নয় বলে কিছু ঘটনা ও কাহিনীনির্ভর সম্ভাব্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আর সে জন্যই ‘বিনোদিনী’ যেমন ‘চোখের বালি’ হয়ে ওঠে তেমনি আপাতবিচারে এ উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী অবশেষ বিচারে তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে নি। অপরিণত মন ও বুদ্ধির আশা, কাজকর্মে ও জীবনাচরণে অপটু আশা, প্রেমিকা ও গৃহিণীর যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ বালিকা বধূ আশাই কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকায় পরিণত হয় এবং তার জন্য স্থান করে দিতে গিয়ে একদিকে হতাশা অন্যদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ধরনের মানসিক দীনতা সম্বল করে এক পর্যায়ে স্পর্ধিত চেতনার নায়িকা বিনোদিনীকে স্বেচ্ছানির্বাসনে যেতে হয়। আসলে এ অবস্থাকে স্বেচ্ছানির্বাসন না বলে লেখকের ইচ্ছারূপায়ণ বলা চলে যা অনেকটা অমোঘ নিয়তি-নির্দেশের মতো।

অন্যদের নির্দেশমাফিক চলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিত্বহীন আশা, যাকে অনেকটা গৃহসজ্জার উপযোগী পুতুলের মতো গড়ে তোলা হয়েছিল, হঠাৎ করে মাসিমার এক আদেশে তার পক্ষে দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক ও ঘটনা-পরম্পর বলে মনে হয় না। আশার হঠাৎ এ পরিবর্তন, আদেশ-নির্দেশদান শুধু বিনোদিনীকেই বিস্মিত করে না, পাঠকও সেক্ষেত্রে বিস্ময় মানেন। আসলে আশাকে হঠাৎ এভাবে তুলে আনার উদ্দেশ্য (অবশ্যই লেখকের) বিনোদিনীর প্রস্থান স্বাভাবিক করার জন্য। তাই 'আশার এ দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।' তবু লেখক এ অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে দ্বিধা করেন নি।

অথচ এ আশাই একসময় স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়ে অন্নপূর্ণার কাছে প্রশ্ন রেখেছে 'মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।' জবাবে মাসি বলেন— 'স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিযত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।' অন্ধ পতিভক্তি ও সংসারসেবা বিধাতার দোহাই দিয়ে নারীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে সমাজ, তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পূর্বোক্ত ঘটনাচিত্র এবং মাসির পতিভক্তিবিষয়ক কথাবার্তা প্রকৃতপক্ষে লেখক রবীন্দ্রনাথেরই। ধর্ম ও ভগবানের দোহাই দিয়ে সনাতন কাল থেকে নারীর যে অবিচল পতিভক্তি ব্যক্তি ও সমাজ যুগ যুগ ধরে দাবি করে এসেছে, দাবি করে এসেছে স্ত্রীধর্ম হিসেবে, এ কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ ঐ রক্ষণশীল ধারণায় বিশ্বাসী বলেই আশাকে আদর্শ স্ত্রীর মর্যাদায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক প্রবন্ধে গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণীরূপ যে-কোনো মূল্যে তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সংসারসেবা তার মতে 'গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার; ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান' (নববর্ষ, ১৯০২)।

নারীকে স্তবস্তুতির মাদকতায় ভুলিয়ে রাখার এ কৌশল যে আসলে এক্সপ্লেইটেশনেরই অন্যরূপ, এ সত্য ঐতিহ্য-অন্ধ নারীর পক্ষে বোঝা একসময় সহজ ছিল না। আশ্চর্য যে রবীন্দ্রচেতনায় দীর্ঘদিন ঐ বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে থেকেছে। 'স্ত্রীশিক্ষা' থেকে একাধিক রচনায় কথাটা তিনি নানাভাবে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে মেয়েদের কর্তব্য সংসারের কাজে, স্বামী ও সংসারের অন্যান্য সদস্যের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত রাখা। এটা সমাজের দাবি। দাবি পরিবারের শুদ্ধতা, স্বাস্থ্য ও সমাজের সংহতি বজায় রাখার জন্য। এদিক থেকে মনে হয় স্বামী বা পুরুষের কোনো দায় নেই। আশ্রমপর্বের রবীন্দ্রনাথ এমনি ধারার, এমনকি এর চেয়ে কঠিনতর অন্ধ পতিব্রত্য ধারণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি'র পরও কোনো কোনো উপন্যাসে কিছুটা হলেও এ জাতীয় ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে রবীন্দ্রচেতনার পূর্বাপর চরিত্র স্ববিরোধিতার জালে আবদ্ধ।

'চোখের বালি' তথা 'বিনোদিনী' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ মোটামুটি হিসেবে ১৮৯৯ সাল থেকে শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য জ্যোতির্ময় ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসভাবনা'য় লিখেছেন যে 'চোখের বালি' উপন্যাসের রচনাকাল ১৩০৭ বঙ্গাব্দ থেকে, তবে ১৩০৫-এর শেষ থেকেও রচনা আরম্ভ হয়ে থাকতে পারে।' এ উপন্যাসের খসড়া 'বিনোদিনী' রবীন্দ্রনাথ প্রায় চার বছর ধরে অর্থাৎ ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল অবধি লিখেছেন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে 'বিনোদিনী' বিষয়ক উল্লেখ থেকে জ্যোতির্ময় ঘোষ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ১৮৮০ সাল ও তার সন্নিকটবর্তী সময়ের (ইউরোপ প্রবাসীর পত্রলেখক বঙ্গীয় যুবক) কিংবা ১৮৮৭ সাল ('হিন্দু বিবাহ' রচনাকাল) ও ঐ সময়ের অব্যবহিত পরে অনুরূপ রচনার লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯০০ সালে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে চিঠির লেখক কিংবা ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও আদিব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর প্রভেদ। এমনকি পরবর্তী চার-পাঁচ বছরের রবীন্দ্রনাথ সময়ের সামীপ্য সত্ত্বেও বিশ্বাস ও মানসিকতার দিক থেকে এক রবীন্দ্রনাথ নন। শেষোক্ত কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী, প্রথারীতিনীতি ও জীবনাচরণে পরম রক্ষণশীল। তাঁর সেসময়কার নারীবিষয়ক ভাবনা যে অনুরূপ রক্ষণশীলতা ও নিজস্ব মতবাদ তথা তত্ত্বে আক্রান্ত তা ইতিহাসসম্মত সত্য।

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রমানসলোকের এ অবিশ্বাস্য পরিবর্তন চার বছর ধরে ধীরে সুস্থে লেখা 'বিনোদিনী'র নাম বদল ('চোখের বালি') এবং কাহিনীর ঘটনা-বিন্যাস ও নায়িকার পরিণতিতে যে প্রভাব ফেলে নি এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যায় ? বরং কাহিনীর প্রথম দিকে বিধবা বিনোদিনীর দৃপ্ত চারিত্র্য-দীপ্তি ও সরস বাকচাতুর্যের তুলনায় শেষ দিকের বিনোদিনী যেমন নিষ্প্রভ তেমনি তার কথাবার্তা ও আচরণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব ও দীনতার প্রকাশ সুস্পষ্ট। 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্রবিশ্লেষণে এ ধরনের স্ববিরোধিতা কিয়ৎপরিমাণে হলেও লক্ষ করার মতো। এ সবই রবীন্দ্রচেতনায় নিহিত দ্বন্দ্ব ও বিশেষ কালক্ষণের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্বভাবত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির চরিত্রবিচারে সনাতন ঐতিহ্য, স্বাপ্নিক অতীত, সামাজিক রীতিপ্রথা ও পরিবেশ, এমনকি পারিবারিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রভাবের কথা এসে পড়ে। যে-কোনো শিল্পস্রষ্টার জীবনে এ ধরনের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক ভূমিকা রাখে। তবে যে-প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা তরুণ বয়স থেকেই সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্য যেমন অতীত বা সমকালীন দেশকাল পরিবেশ প্রভাব ধারণ করতে পারে, আবার তেমনি পারে কোনো কোনো পর্যায়ে সেসব অতিক্রম করে ভিন্ন গুণগত মাত্রায় পৌঁছে যেতে। এক কথায় ইতি ও নেতি দুভাবেই ঐতিহ্য ও পরিবেশ প্রভাব শিল্পীচৈতন্যে ছায়া ফেলতে পারে এবং তা সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হওয়া এক অনিবার্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁর উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছরের রচনা, বিশেষ করে উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে উল্লিখিত সমকালীন রক্ষণশীল প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে কিছুটা পূর্বপ্রভাব (তারুণ্যের নারীবিষয়ক বলিষ্ঠ ধারণা) এসে কিছুটা হলেও দ্বিচারিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। এ বিষয়টা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কাজে যথেষ্ট দেখা যায়।

দুই

'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্রবিচারে তাই জ্যোতির্ময় ঘোষের মূল্যায়ন অংশত গ্রহণযোগ্য, তবে পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলে না। মেনে নেওয়া চলে না যখন তিনি বলেন, 'চোখের বালি ঠিক তদানীন্তন ঐতিহ্য-অনুগামী বাংলা উপন্যাস নয়', কিন্তু একমত হওয়া চলে যখন তিনি একই বিষয়ে বলেন যে, "আবার একেবারে অভিনব কোনও নবধারার একক সৃষ্টিও 'চোখের বালি'কে বলা যায় না। 'চোখের বালি' কতকাংশে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যাশ্রয়ী, কতকাংশে তা আবার নৌকাডুবি-গোরার পরবর্তী চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে পর্যায়ের অভিমুখী।"

তবে এটা ঠিক যে, 'সামগ্রিক বিচারে চোখের বালি বাংলা উপন্যাসের যুগ সন্ধিক্ষণের, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর, পুরনো নতুন সঙ্গম স্থলের সৃষ্টি।... চোখের বালি বাংলায় যুগসন্ধির উপন্যাস'— এমন মূল্যায়ন উনিশ শতকের রেনেসাঁসীয় ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীলতা এবং বিশ শতকের আধুনিক চেতনার মিশ্র প্রতিফলন হিসেবে স্বীকার্য। তাই 'চোখের বালি'তে বিধবা নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে হঠাৎ ঝলসানির তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের পাশাপাশি প্রচলিত রক্ষণশীল সমাজের নারীবিষয়ক রীতিনীতির সাত্ত্বিক প্রকাশ অধিকতর প্রভাব নিয়ে প্রতিফলিত। বিশেষ করে বিনোদিনীর অবশেষ পরিণতি তেমন কথাই বলে অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের শুদ্ধতা রক্ষারই প্রমাণ দেয়।

তবে এ ক্ষেত্রে কথাটা মনে রাখা দরকার যে জ্যোতির্ময় ঘোষের 'চোখের বালি' বিষয়ক মূল্যায়নে যে বিষয়টি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তা হলো 'চোখের বালি' উপন্যাসে 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ' আর চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে কোন দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিকতার সে নিরিখটাই ছিল তাঁর বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানে 'আঁতের কথা বের করে দেখানো' কতটা হয়েছে সে হিসাবই আলোচক করেছেন। এ কারণে তিনি প্রুস্ত, জয়েস, উলফ প্রমুখ পাশ্চাত্য ধীমানদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করেন নি 'বিনোদিনী' কেন 'চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালি'তে রূপান্তরিত হলো। অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা কতটা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা সে ঘটনা-পরম্পরাতে হোক কিংবা চরিত্রচিত্রণেই হোক, কাজেই এক্ষেত্রে ভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা গুরুত্বহীন।

এ প্রসঙ্গে নারীস্বাধিকার ও নারীস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনায় পূর্বে উল্লিখিত নানাবিধ প্রভাব কতটা পড়েছে বিচার করতে গেলে অতীত ও সমকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথাও ভাবতে হয়। আর কথাটা সবারই জানা ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত যে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আলোকিত প্রভাবের পথ ধরে এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্‌ঘাটিত অতীত গরিমা ও ধর্মীয় জাত্যাভিমান বহন করে উনিশ শতকে যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা তা ছিল খণ্ডিত। অর্থাৎ ঐ রেনেসাঁস বাস্তবে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, ঐতিহাসিক কারণে তা মুসলমান সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে নি।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ঐ রেনেসাঁসের চরিত্রে আধুনিকতার চেয়ে ঐতিহ্যসন্ধান, অতীতচারণা এবং ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ প্রধান হয়ে উঠেছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি সমাজে ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রকাশ ছিল প্রবল। এবং তা মূলত হিন্দুসমাজে হলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ ঐ আবহাওয়া থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। অন্যদিকে অনগ্রসর মুসলমান সমাজে তাদের নিজস্ব ধারায় রক্ষণশীলতা অপ্রকাশ থাকে নি।

পূর্বোক্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রক্ষণশীলতা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছিল। উনিশ শতকের প্রধান সাহিত্যকর্ম তার প্রমাণ। আর সমাজ-সংস্কৃতির ঐ ধারা পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকে রাজনীতির স্বাদেশিকতাকেও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্পর্শ করেছিল। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' বা 'সীতারাম' যদি সম্প্রদায়গত জাত্যাভিমান ও রক্ষণশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাহলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিনী-গোবিন্দলাল-ভ্রমর প্রসঙ্গ বা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নাম মাহাত্ম্য ও কুন্দনন্দিনীর পরিণতি সামাজিক রক্ষণশীলতারই প্রকাশ যা নারীর সামাজিক অবস্থানেরও পরিচয় বহন করে। কাছাকাছি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'হিন্দুধর্ম' (১৮৯৪) প্রবন্ধ ধর্মীয় জাগরণের ভূমিতে উর্বর সারের কাজ করেছে। ধর্মীয় নবজাগরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাত্যাভিমানের প্রকাশ ঘটেছিল আহার-বিহার আচার-প্রথা রীতিনীতির সর্বত্র, ঘটেছিল সংস্কারবিরোধী রক্ষণশীলতায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে চন্দ্রনাথ বসু বা অনুরূপ একাধিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন রক্ষণশীলতার আধার ও প্রবক্তা। হিন্দুত্ববাদের প্রচারক ও মুখপাত্র।

এসব বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসু বা শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সেক্রেটারি (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-আধুনিকতার জের মিটিয়ে, তাঁর ব্রাহ্মচেতনা একপাশে রেখে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যকেন্দ্রিক সনাতন হিন্দুত্ববাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। রেনেসাঁসের নেতিবাচক দিক হিসেবে ঐতিহ্য, উপনিষদ, জাত্যাভিমান ও অতীত সংস্কৃতির প্রতি টান, ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রভাব-বলয়ের সদস্যদের। ব্যতিক্রমী ধারায় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অনুসারীগণ। স্বর্ণকুমারী দেবী আপন 'র‍্যাডিকাল ধারণার' কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ক্রমশ অধিকতর রক্ষণশীল হয়ে ওঠার' ঘটনা। এ প্রভাব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহমান ছিল যদিও সত্যেন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী প্রভাব এবং বিলেতের পরিবেশ-প্রভাব তরুণ রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কয়েক বছর নারীস্বাধিকারের উদার প্রবক্তায় পরিণত করেছিল ('য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র')।

কিন্তু মূল প্রভাব অর্থাৎ পিতা, উপনিষদ এবং স্থানিক রেনেসাঁসীয় ধর্মীয় জাত্যাভিমান ও সনাতন ঐতিহ্যপ্রীতি যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল তার প্রমাণ মেলে অভিদ্রুত তারুণ্যের প্রগতিমনস্কতার বদলে সনাতন ধর্মীয়-সামাজিক রক্ষণশীলতা নির্বিচারে গ্রহণ করার মধ্যে। সনাতন ধারার সামাজিক রীতিপ্রথা রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন অগ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। নারীস্বাধিকারের বিষয়টি স্বভাবতই রক্ষণশীল চেতনায় পরিস্রুত হয়ে ওঠে। সনাতন ঐতিহ্যসম্মত সামাজিক রীতিনীতি, নারীর পত্নীত্ব-সতীত্ব-মাতৃত্বের গরিমা, সেবিকা গৃহিণীতে গৃহলক্ষীর কল্যাণীরূপ এবং পতিভক্তি ও পতিসেবাতে স্ত্রীধর্মের প্রকাশ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের অন্তর্গত হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

তিন

'চোখের বালি'-'নৌকাডুবি' রচনাপর্বে এমনটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে রবীন্দ্রচেতনায় তখন সনাতনপন্থার ধারা প্রবল। একথা রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচক সবাই স্বীকার করে থাকেন। তবে এর গুরুত্ব যে কতটা গভীর তা বুঝতে পারা যায় যখন দীর্ঘকাল পরে লেখা (উপন্যাসটি রচনার প্রায় ৪০ বছর পর) 'চোখের বালি'র 'সূচনা' (ভূমিকা)-য় রবীন্দ্রনাথ সচেতন বা অসচেতনভাবে স্বীকার করে নেন যে 'বঙ্গদর্শনের নব পর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক-সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-একদিকে এনেছিল গল্পে এমনকি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে।' এখানে দ্বিচারিতার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বঙ্গদর্শন' পর্বের রক্ষণশীলতা রবীন্দ্রচেতনায় পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মৌলবাদিতায় এবং হিন্দুত্ববাদী ব্রহ্মচার্যাশ্রমের সনাতনী ধ্যানধারণার উত্তাপে। তাঁর সামাজিক চিন্তায় এবং উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে যে ঐ প্রভাব বাস্তবিকই সক্রিয় থেকেছে উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। 'চোখের বালি'র নামকরণ থেকে শুরু করে পাত্রপাত্রীর বক্তব্যে এবং সবশেষে নায়িকা বিনোদিনীর পরিণতি তথা তাকে কাশীধামে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে সমকালীন রবীন্দ্রমানসের রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। সে প্রকাশ যেমন পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিসত্তার অস্বীকারে তেমনি নারীর গৃহধর্মের সেবিকা মূর্তির প্রশস্তিতে, এমনকি বিধবাবিবাহের পরোক্ষ অস্বীকৃতিতে।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসটির খসড়া পর্যায়ে নামকরণ করেছিলেন 'বিনোদিনী'। নামকরণে পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও নায়িকা বিনোদিনী রোহিণী না হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে চিত্রিত হবে এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে ১৮৮৮ বা ১৮৮৯'র রবীন্দ্রনাথ আর ১৯০১-'২ এর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সময়ের সামীপ্য সত্ত্বেও মানসবৈশিষ্ট্যে ছিল যথেষ্ট প্রভেদ। তাই ১৯০২ সালের ৩০ মে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, "এই অল্পদিন হলো 'চোখের বালি' ('বিনোদিনী'নয়) সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি।" তখন এমন সম্ভাবনা কি বাতিল করা চলে যে 'বিনোদিনী' শিরোনামের উপন্যাসে বিনোদিনীকে নায়িকার প্রত্যাশিত মর্যাদায় তুলে ধরায় বাধার কারণে নামবদলই বরং লেখকের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। নারীভাবনায় রক্ষণশীল ১৯০১-০২ সালের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্ত্রীধর্ম ও সামাজিক-পারিবারিক আদর্শ রক্ষার সেটাই ছিল উত্তম পন্থা। হতে পারে গোটা সিদ্ধান্তটাই কষ্টকল্পনা।

কিন্তু এ সত্য তো অস্বীকারের নয় যে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীকে শুরুতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবনের ব্যক্তিত্বময়ী, বুদ্ধিমতী নারী রূপে চিত্রিত করেছিলেন। 'প্রভুত্বে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ' বিনোদিনী তখন সত্যিই আকর্ষণীয় আগুন। বিধবার সমাজ-নির্যাতীত রূপ ও হীনম্মন্যতা তার মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত। ব্যক্তিত্বের রূপ ও গুণের সমন্বয়ে যথার্থ নায়িকার গরিমা নিয়ে কাহিনীমঞ্চে বিনোদিনীর আবির্ভাব। 'জাদুকরের মন্ত্রশক্তি নিয়ে বিনোদিনী সবাইকে অভিভূত করবে এটাই যেন তার পক্ষে স্বাভাবিক।' কিন্তু এ চিত্রণ ছিল স্বল্পসময়ের সত্য।

তাই নায়িকার সর্বগুণ ও যোগ্যতা নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত বিনোদিনীর কপালেই কিনা লেখক ঘটনা-পরম্পরায় একের পর এক পরাজয়ের তিলক এঁকে দিলেন, অমর্যাদার কালিমাও সেখানে বাদ পড়ল না। বিহারীর চোখে বিনোদিনী এমনই এক শিখা যে একভাবে ঘরের প্রদীপ রূপে জ্বলে, আর-'একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়।' আবার অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে তার এমনও মনে হয়েছে যে, আপাতবিচারে 'বিনোদিনী বিলাসিনী যুবতী, কিন্তু অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।'

যে-বিনোদিনী নাম্নী অগ্নিশিখাকে বারবার নানারূপে দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিহারী কখনো অভিভূত, কখনো তাকে মর্যাদা দিতে আগ্রহী সেই বিনোদিনীর ভালোবাসার সব গর্ব নিঃশেষ হয়ে যায় যখন বিহারীর কাছে তার প্রেম নিবেদনে নির্লজ্জ দীনতা প্রকাশ পায়, আর শাস্ত্রের মহিমা প্রকাশ করে বিহারী জবাবে বলে, 'হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক, *আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।*' এমনকি ঐ পর্যায়ে বিনোদিনীকে বিহারীর মনে হয়েছে 'নাটকের নায়িকা যাকে স্টেজের উপরেই শোভা পায়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পর্যায়ে লেখকের মন্তব্য 'কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প!' স্বভাবতই এ বিনোদিনীকে দিয়ে বিহারীর পদযুগল বারবার চুম্বন এবং শেষপর্যন্ত তার ওষ্ঠাধরের উদ্যত চুম্বন বিহারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এ সব কিছুই লেখকের ইচ্ছাপ্রসূত বলে মনে হয়, এবং তা ঘটনার কোনো অমোঘ নির্দেশে নয়। তাই বিনোদিনীর আকুল আহ্বান 'একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালাবাসিয়া একটু মন্দ হও' বিহারীর মনে দাগ কাটে না, সে ঐ আত্মনিবেদন অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

এ বিনোদিনীকে চেনা যায় না। এ দীনতা ও কাঙালপনা তাকে মানায় না। তবু বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বময়ী বিনোদিনীকে তার স্রষ্টা অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর স্তরে ঠেলে দিয়েছেন। এ বিনোদিনীর পক্ষেই সম্ভব বিহারীকে 'প্রভু' সম্বোধন করে চিঠি লিখে বলা— 'আমার পাপমনে অহঙ্কারের সীমা ছিল না— কাহারো কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্তু আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচিতে দাও।' বলা বাহুল্য এ বিনোদিনী পাঠকের কাছে তার প্রাপ্য সম্মান হারিয়েছে। এর দায় রবীন্দ্রনাথের যে তিনি তাকে নতুন করে এক আত্মমর্যাদাহীন নারীতে রূপান্তরিত করেছেন সঙ্গত শৈল্পিক কারণ ছাড়াই।

অন্যদিকে বিহারীকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে তুলে আনা হয়েছে, নীতি-নৈতিকতার বিচারক বিহারী বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়ক হিসেবে গণ্য হতে পারত যদি না শেষ পর্যায়ে এসে মহেন্দ্রর অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিনোদিনীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে কারণ হিসেবে তার ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার কথা জানাত। কিন্তু বিনোদিনীর পক্ষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিক হলেও এর কারণ স্বাভাবিক নয়। বিনোদিনীর ভাষায় 'আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না।... পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব, এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই।... আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে।'

কথাগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো বিধবা নায়িকার মুখে ভালো মানাত, রবীন্দ্রনাথের কথিত বিদ্রোহী নায়িকার মুখে নয়। আসলে কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের এবং বিহারীরও মনের কথা। তাই বিনোদিনীকে কাশীধামে নির্বাসনে পাঠাবার পূর্ব মুহূর্তে বিহারীর সর্বশেষ বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। 'এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। যদি সমস্ত অতীত কাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ কি এ পর্যায়ে বিধবা বিয়ের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এ কথার পরপরই বিনোদিনী কাশীধামে স্বেচ্ছানির্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সেজন্যই মনে হয় বিহারীর পূর্বোক্ত বিয়ের প্রস্তাব তারই পূর্বেকার ভাষায় বলা চলে এক ধরনের 'স্টেজ রিহার্সেল', তার জানা ছিল যে এতবার প্রত্যাখ্যানের পর বিনোদিনী তার প্রস্তাবের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবে না। দেবী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা চলে 'রবীন্দ্রনাথের বিহারী বিনোদিনীর ঐকান্তিক আহ্বান ও আত্মসমর্পণকে মূল্য দেয় নি, তার নারীত্বকে সম্মানিত করে নি, তার মধ্যে বিনোদিনীর প্রতি প্রেম ছিল না বলে নয়, কিন্তু সমাজের মূল্যবোধে আঘাত লাগবার আশঙ্কায়।'

এ আশঙ্কা শুধু বিহারীর নয়, এ আশঙ্কা সনাতন ঐতিহ্যের ধারকবাহক রবীন্দ্রনাথের। এর অন্যতম কারণ বিনোদিনী বিধবা। আর বিধবা বিবাহ সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করবে এমন ভয় কি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, নাকি রক্ষণশীল সমাজবাস্তবতার কথা ভেবে এবং নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে মেলাতে না পারার কারণে বিনোদিনীর জন্য কাশীধামে নির্বাসন নির্ধারিত হলো ? অন্যদিকে অপটু 'বালিকা বধূ', কথিত 'ননীর পুতুল' ব্যক্তিত্বহীন আশাকে শেষ মুহূর্তে 'সংযম ও দৃঢ়তার' প্রতিমূর্তি ও ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকারূপে চিত্রিত করা হলো শুধু মূল কাহিনীর প্রথম পর্বের নায়িকা বিনোদিনীকে স্থানচ্যুত করে তার কপালে গৃহদাহের কালিমা লেপন করতে ? আশার এ আকস্মিক পরিবর্তন যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। বরং তাকে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত গৃহলক্ষ্মী ও কল্যাণী নারীর পতিপরায়ণা সেবিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেই তার চরিত্রধর্মে হঠাৎ এ পালাবদল।

AMARBOI.COM

চার

রবীন্দ্র-উপন্যাসের একাধিক আলোচক বিনোদিনীকে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছেন। সূচনায় বিদ্রোহী, বিধবা বিনোদিনী শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্ন, কর্মনিপুণ ও উজ্জ্বল বা খর ব্যক্তিত্বের হওয়া সত্ত্বেও বিহারীকে ভালোবেসে সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি। ফলে ক্ষুব্ধ বিনোদিনীর হাত দিয়ে গৃহদাহের সূচনা এবং শেষ পর্যায়ে নিতান্ত দীনতা ও ব্যক্তিত্বহীন পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনী-মঞ্চ থেকে তার মর্যাদাহীন প্রস্থান। প্রস্থান হিন্দুবিধবাদের জন্য নির্ধারিত চিরাচরিত স্থান কাশীধামে। তার নারীত্বের দাবি, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার দাবি, বিধবার প্রেমজ বিবাহের দাবি বাতিল হয়ে গেছে তার স্রষ্টার ইচ্ছায়, বিদ্রোহী বিনোদিনী অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় তুলে বিদ্রোহের ধ্বজা নামিয়ে ফেলে পরাজয় বরণ করে নেয় গভীর হতাশায়।

'চোখের বালি' তাই 'বিনোদিনী' নয়। 'চোখের বালি'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যতটা আধুনিক, পরবর্তী পর্যায়ে তুলনায় অনেক বেশি অনাধুনিক তথা ঐতিহ্য সচেতন সনাতনপন্থী, প্রচলিত রক্ষণশীল রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এ দিক থেকে বিচার করতে গেলে বিনোদিনীর পরিণাম নিয়ে 'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের যুক্তিগ্রাহ্য নারীভাবনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জতুগৃহ। লেখক ইচ্ছা করলেই সেখানে রক্ষণশীলতার আগুন লাগিয়ে নারীস্বাধিকারের চেতনা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। দিয়েছেনও কিছুটা। সর্বশেষ বিচারে 'চোখের বালি' উপন্যাসে এমন কিছুই ঘটেছে পূর্বসূরির (বঙ্কিমচন্দ্র) ধারাবাহিকতা নিয়ে এবং পরবর্তী উপন্যাসে (নৌকাডুবি) সতীত্ব-পত্নীত্বের জয়যাত্রার মধ্য দিয়ে। অথচ বিস্ফোরক ভিন্ন সম্ভাবনা ঐ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেই ছিল স্বাভাবিক ও সর্বাধিক।

প্রশ্ন উঠতে পারে 'চোখের বালি'র সমকালীন রচনা 'নষ্টনীড়' গল্পের ভিন্ন চরিত্র-লক্ষণ নিয়ে। কারণ 'নষ্টনীড়' রচনাকালের দিক থেকে 'চোখের বালি'র প্রায় সমসাময়িক, রবীন্দ্রনাথের সনাতন ঐতিহ্যপ্রীতির প্রায় সমকালীন রচনা। কিন্তু সেখানে সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটে নি। 'নষ্টনীড়'-এর রবীন্দ্রনাথ ও 'চোখের বালি'র রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের বৃত্তে আশ্রিত। রচনা দুটোর ট্রিটমেন্টগত ভিন্নতার কারণ সম্ভবত একাধিক।

প্রথমত রবীন্দ্রচেতনায় দুই বিপরীত ধারার উপস্থিতির কথা বহু-কথিত, বহু-উচ্চারিত। হতে পারে 'নষ্টনীড়'-এর ক্ষেত্রে পূর্বেকার নারীভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল বলে চারুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ততটা নির্মম হতে পারেন নি, গৃহদাহের পরিণতির জন্য তাকে পুরোপুরি দায়ী করেন নি। তাছাড়া ঘরে আগুন লাগা সত্ত্বেও তা একেবারে পুড়ে ছাই হয় নি। এ জন্য চারুর স্বামী ভূপতির দায় কম ছিল না, নীড় নষ্ট করেছিল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলা, আর এমন ভাবখানা যে 'স্ত্রী তো খাঁচার বন্দি খাঁচার পাখির মতো, উড়ে যাবে কোথায়।'

কিন্তু মন যে, অবস্থাবিশেষে, পরিবেশ-প্রভাবে উড়তে পারে সে তথ্য ও সত্য ভূপতির মতো স্বামীদের জানা না থাকতেও পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তা ভালোভাবেই জানা ছিল। আর জানা ছিল বলেই তার প্রশ্রয়ে অবহেলিত স্ত্রীর সঙ্গে তরুণ সঙ্গীর সর্বক্ষণিক সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সেকালের রবীন্দ্রনাথ এর বেশি এগোন নি, কিন্তু তখনকার সমাজে 'মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি, মরেছি অনেক মরণে' যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিল।

এই মনস্তাত্ত্বিক কারণ এবং চরিত্রপ্রাধান্যের কারণে 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র সমাপন সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পর (১৩৪৭) 'চোখের বালি'র ভূমিকা (সূচনা)য় পুরনো দিনের অর্থাৎ রচনাকালের কথা মনে করে লিখেছিলেন 'এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা-স্তরে,... নামতে হলো মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।'

'নষ্টনীড়'-এ ঐ আগুন জ্বালানো, এবং অদৃশ্য হাতুড়ি পিটানোর কাজ চমৎকার পরিবেশ মাফিক করা হয়েছে, আর ঘটনা তো আছেই, কিন্তু সে ঘটনার মাধ্যমে আঁতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বের করে এনে চরিত্রবিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এ গল্পের চেহারাচরিত্র 'চোখের বালি' থেকে ভিন্ন হয়েছে। এখানেও শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ হয়েছে, কিন্তু ফল্গুপ্রবাহের মতো তা অন্তঃশীলা চরিত্র অর্জন করার কারণে এর পরিণতিতে শৈল্পিক গুণগ্রাম অনেক বেশি। তাছাড়া এখানে ঘরভাঙার খেলায় বিধবা বিবাহের অনুষঙ্গ না থাকায় রবীন্দ্রনাথের জন্য সম্ভবত কোনো অস্বস্তির কারণ ঘটে নি। অথচ 'নষ্টনীড়'-এর ধারা ও লেখকমানসিকতা উপস্থিত থাকলে 'চোখের বালি'র সমাপনও অধিক চমকপ্রদ হতে পারত, এবং নবপর্যায়ের গল্পকাহিনীর মতো তা বিশ শতকের সূচনা লগ্নকে বাংলা উপন্যাসের নয়া-আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারত। সে ক্ষেত্রে 'চোখের বালি' উপন্যাসে দ্রোহচেতনার পাশে রক্ষণশীল চেতনা অধিকতর প্রাধান্য পেত না। দুইয়ের সঠিক মিশ্রণেও আধুনিক বোধের পরিণামই মাথা তুলে দাঁড়াত।

'চোখের বালি'র কাহিনীগত ও চরিত্রগত পিছুটানের সঙ্গে পরবর্তীকালে লেখা *চতুরঙ্গের* (১৯১৫) চিত্রচরিত্রের একচিলতে রোদ্দুরের মিল রয়েছে। সন্দেহ নেই ঐ অসাধারণ উপন্যাসিকার ত্রিকোণ প্রেমে সংশ্লিষ্ট নায়িকা দামিনীর চরিত্রটিও আঁকা হয়েছে অসামান্য করে যা সমকালীন অন্য কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। জনৈক নারীবাদী আলোচকের (মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়) মতে 'দামিনী' চরিত্রের অসামান্য চিত্রণ, তার যৌনক্ষুধা ও ভালোবাসার ক্ষুধার স্বীকৃতি তাকে রবীন্দ্র-নায়িকাদের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষটা বিধবা বিবাহ সত্ত্বেও রক্ষণশীলই রয়ে গেছে।'

এ প্রসঙ্গেই মনে করতে হয় স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী প্রকৃতির দামিনীর মধ্যে শেষ অঙ্কে পিছুটানের কথা যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য তাত্ত্বিক পরাজয়ের শামিল। পরাজয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, বরং প্রচলিত সংস্কারের কাছে। তাই মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ দামিনীকে স্বামী শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলা নিয়ে বলতে শোনা যায়, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।' অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাগুলো 'ট্রাজেডি'র বাহন বিনোদিনীর মুখেই সঠিক ছিল, দামিনীর মুখে নয়। আরো একটি বিষয়ে উভয়ের মিল কাকতালীয় হলেও সত্য, তবে অভাবনীয়। বিহারীর আঘাতে সৃষ্ট বিনোদিনীর হাতের কাটাঘায়ের চিহ্ন যেমন সে তার 'অঙ্গের ভূষণ', গোপন স্মৃতি, মূল্যবান স্মৃতি হিসেবে বহন করেছে এবং শেষ মুহূর্তে বিহারীকে সগর্বে দেখিয়েছে তেমনি গুহায় শচীশের পদাঘাতে সৃষ্ট দামিনীর বুকের ব্যথা ঐ বিদ্রোহী নায়িকা 'গোপন ঐশ্বর্য' ও 'পরশমণি' মনে করে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করেছে। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে স্বামী শ্রীবিলাসের কাছে সেই আঘাতের পরিণামে সৃষ্ট ব্যথার কথা প্রকাশ করেছে এই বলে যে 'এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি।' এমন কথা কি বিদ্রোহী চেতনার দামিনীর মুখে শোভা পায় বা মানায় ?

এসব শুধু সতীসাধ্বী রমণীর মুখের কথাই নয়, সংসারে পুরুষের উঁচুস্থান নির্দেশ করা এবং নারীর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া বই কিছু নয়। এ জাতীয় ঘটনা ও বক্তব্য সনাতন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর অধস্তন অবস্থানের প্রতিফলন এবং এ ট্র্যাডিশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিম সাহিত্যের নায়িকাদের যদি বা মানায়, আধুনিক চেতনার রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের (বিশেষ করে দামিনীর) ধ্যানধারণা বা আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে মানানসই নয়।

কিন্তু আশ্চর্য যে রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকার মতো শরৎসাহিত্যের কোনো কোনো নায়িকাও মানসিকতার দিক থেকে একই রকম পতিভক্তি বা পুরুষভক্তিপরায়ণা সতীসাধ্বীর ভূমিকা পালন করেছে যা আধুনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খায় না বা আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটায় না। শরৎসাহিত্যের একাধিক নায়িকা এ জাতীয় হীনম্মন্যতায় অবিশ্বাস্যরকম আক্রান্ত। *শেষ প্রশ্নের* কমল বা অভয়া ব্যতিক্রম।

এমনি এক ঐতিহ্যবাহী সতী-সাধ্বীচেতনা এবং পতিভক্তি ও পুরুষভক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী তার কথিত বিদ্রোহী চেতনারই (দীপ্তি চক্রবর্তী) অবসান ঘটায় নি, নিজেকে দীন ও হীন পর্যায়ে নামিয়ে এনে নারীত্বের দাবি, প্রেমের দাবি, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার দাবি নস্যাৎ করেছে। সূচনার সতেজ, ব্যক্তিত্বময়ী নারী বিনোদিনীর প্রাণবন্ত সত্তা এভাবেই আত্মমর্যাদাহীন পরাজিত নারীসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিনোদিনী তাই রবীন্দ্রউপন্যাসে তথা 'চোখের বালি'তে বিদ্রোহী নারীসত্তার প্রতীক নয়।

নয় রবীন্দ্রসাহিত্যের একাধিক আপাত-বিদ্রোহী নায়িকা। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে আলোচনা স্থান পাবে। আর এ প্রসঙ্গে দেবী মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তাঁর ভাষায় "পরবর্তীকালে (গোরা-পরবর্তী সময়ে) অনেক রচনায় কাহিনীর দাবিতে অথবা পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমাজের ঘটনা প্রতিক্রিয়ায় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সৃষ্ট কিছু নারী বিদ্রোহী হয়েছে নারীত্বের দাবিতে, কিন্তু শেষপর্যন্ত স্রষ্টার মানসিকতায়... দোলাচলবৃত্তি অপ্রকাশ থাকে নি। এর প্রমাণ ১২৯৮ সালের 'স্ত্রী শিক্ষা' থেকে ১৩৪৩-এর 'নারী' প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে মিলবে।" অবশ্য মিলবে 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর প্রাথমিক রূপচরিত্রের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের চরিত্রচিত্রের তুলনার ক্ষেত্রে।

সব শেষে বলতে হয় লেখকের সৃষ্ট ঘটনাবিন্যাস ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পতিভক্তিপরায়ণা আশা'র সংসার রক্ষা পেয়েছে, জতুগৃহে আগুন লাগে নি বা এমন কথাই সঠিক হবে যে জতুগৃহে আগুন ধরানো হয় নি। অথবা ধরানো হলেও ঘটনাই, চরিত্রবিশেষের প্রভাবই তা নিভাতে সাহায্য করেছে। শুধু সংসার রক্ষা পাওয়াই নয়, স্বামী মহেন্দ্রর ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে আশা'র সংসারধর্মও রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু আশা কি ভেবে দেখেছে, যে-মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে-মহেন্দ্রই ঘরে ফিরেছে কি না ? তাদের মধ্যে বিনোদিনীর স্মৃতি কি কাঁটার মতো উপস্থিত থাকবে না ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে ? লেখক তেমন ইঙ্গিত রাখেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে-কলঙ্কে বিনোদিনীকে তার কুল হারানোর' মতো অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সে কলঙ্ক-কালিমা থেকে মুক্ত মহেন্দ্রকে কি তার স্ত্রী আশা ফিরে পেয়েছে ? নাকি মহেন্দ্র পুরুষ বলেই পুরুষশাসিত সমাজে কোনো কলঙ্কই মহেন্দ্রকে স্পর্শ করে নি, অন্তত কাহিনীশেষের স্নিগ্ধ সমাপনে তাই মনে হয়। অন্যদিকে সমাজ ও মানুষের সেবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে বিনোদিনীকে, আর সে বঞ্চনার নায়ক বিনোদিনীর কথিত প্রেমিক বিহারী। অথচ এদিকে বালিকা বধূ আশা, অপরিণত-বুদ্ধি আশা, গৃহকর্মে নৈপুণ্যহীন আশা লেখকের একটানে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকা-চরিত্রে ও যথার্থ গৃহলক্ষ্মী রূপে 'প্রমোশন' পেয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে শেষপর্যন্ত আশাই এ কাহিনীর প্রকৃত নায়িকা, বিনোদিনী নয়। এ রূপান্তর কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, কতটা শিল্পনীতিসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নায়িকাদ্বয়ের অবশেষ চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রচৈতন্যের কথিত দ্বিচারিতা বা 'দোলাচলচিত্ততা'ই যে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাহিনীর টানে কিংবা চরিত্র বিশেষকে যুক্তিগ্রাহ্য পূর্ণতা দানের প্রয়োজনে উক্ত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে লেখকের চেতনায় ধৃত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা এ জন্য দায়ী। হতে পারে 'বিনোদিনী' শিরোনামে উপন্যাস লেখা শুরুর সময়কার মানসিকতা চার বছর শেষে রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অর্থাৎ ইতোমধ্যে তাঁর চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন ঘটেছিল।

এসব যদিও অনুমান তবু 'বিনোদিনী' উপন্যাস শেষ করার সময় রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে নারীবিষয়ক ধারণার যে রীতিমতো পরিবর্তন ঘটেছিল রবীন্দ্রজীবনের ইতিবৃত্ত ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাদি তার সাক্ষ্য দেয়। তাই কাহিনীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে যে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে উপস্থিত করেছিলেন ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে শেষ অঙ্কে সেই স্বাধীনচেতা, সার্থক প্রেমের প্রত্যাশী নারীকে ব্যক্তিত্বহীন, পরাজিত, হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত এবং নির্বাসনযাত্রার শাস্তি পাবার যোগ্য বিধবা রমণীরূপে চিত্রিত করেছেন। তাই তার শেষ গন্তব্য কাশী না হয়ে পারে না।

প্রেমে ব্যর্থ বিনোদিনী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় (ক্ষোভ বিহারীর আচরণে) মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শেষোক্তের গৃহদাহের যে-আয়োজন শুরু করেছিল তা ব্যর্থ হয় বিহারীর তৎপরতায়। এ আয়োজনের দায় যদিও মহেন্দ্র-বিনোদিনী উভয়ের (মহেন্দ্রর আবেগ-উত্তেজনার প্রবলতা কম দায়ী নয়) তবু এর তিক্ত পরিণাম একা বিনোদিনীকেই ভোগ করতে হয়েছে, মহেন্দ্রকে নয় (অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর মতো)। তুলনীয় 'নষ্টনীড়'-এর গৃহদাহ ভূপতি ও চারু উভয়কে স্পর্শ করে তাদের ঘর-সংসার নষ্ট করেছে, দু'জনকেই গৃহহীন করেছে (চারুর অভিশপ্ত বা অগ্নিদগ্ধ ঘরে থাকা গৃহহীনতারই শামিল)। কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্যনীড় নষ্ট করে নি। কিন্তু নষ্ট করেছে বিনোদিনীর ঘর-সংসার বাঁধার স্বপ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য যে 'নষ্টনীড়' উপন্যাসিকায় (বড় গল্পের চেয়ে ছোট উপন্যাস বলাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত) নায়ক-নায়িকার ভুল-ভ্রান্তির দায়ভাগ যে হিসাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, উভয়কে যে দুই পথে যন্ত্রণাভোগের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে, 'চোখের বালি'তে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একদেশদর্শী। শাস্তির পুরোটাই বিনোদিনীর কপালে জুটেছে। এর কারণ কি এই যে মহেন্দ্র পুরুষ এবং বিনোদিনী বিধবা নারী! তাই প্রচলিত সমাজ, সংস্কারবদ্ধ সমাজ এ দু'জনকে দুই ভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করেছে ? আসলে সমাজ তো নয়, বিচার রবীন্দ্রনাথের। এবং সম্ভবত তা প্রচলিত সামাজিক বিধান তথা সমাজবাস্তবতা সামনে রেখে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা-ঋদ্ধ নারীভাবনা সক্রিয় হয়ে বিনোদিনীর পাশে এসে দাঁড়ায় নি। 'চোখের বালি' উপন্যাসের এ চরিত্রধর্মী দুর্বলতা, ঘটনাবিন্যাসগত দুর্বলতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘নৌকাডুবি’
সামাজিক রক্ষণশীলতার চিত্রচরিত্র

‘চোখের বালি’র বিনোদিনী ভুল করে নি, বরং হিসাব-নিকাশ করেই সে এগিয়েছে একটি সফল প্রেমের স্বপ্ন নিয়ে, স্বামী-ঘরসংসার নিয়ে স্থিতির আকাঙ্ক্ষায়। ‘নষ্টনীড়’-এর ভূপতি ভুল করেছিল স্ত্রী চারুর প্রতি অবহেলা করে এবং অবহেলাজাত প্রতিক্রিয়া গ্রহণের উপযোগী আধার সরবরাহ করে। হয়তো মানব চরিত্রের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথার্থ ধারণা ছিল না বলেই ভূপতির নিজ হাতে গৃহদাহের আয়োজন। অবশ্য সে ভুলের মাশুল ভূপতি দিয়েছিল সাময়িক হলেও ঘর ছেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। অথচ ভুল না করেও বিনোদিনী ভুলের মাশুল গুনেছে কাশীধামে স্বেচ্ছানির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করে।

বিনোদিনীর এ শাস্তি প্রসঙ্গে অধিকাংশ সমালোচকই একমত যে বিনোদিনীর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রক্ষণশীল চিন্তা ও বিশ্বাস এজন্য দায়ী। কেউ বিনোদিনীর নির্বাসনকে বলেছেন ‘তুচ্ছ পরিণাম’ (বুদ্ধদেব বসু); পরবর্তী কালে কেউ বলেছেন ‘সেকালে আপন পারিবারিক-সামাজিক সৃষ্টিসিদ্ধ মূল্যবোধের অনুগত থেকে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর নারীত্বকে সম্মানজনক কোনো আসনে স্থান করে দেবার কথা হয়তো ভাবতে পারেন নি’ (দেবী মুখোপাধ্যায়)। বিনোদিনীর পরিণতি নিয়ে অভিযোগ করেছেন জ্যোতির্ময় ঘোষ থেকে একাধিক রবীন্দ্রসাহিত্যের (উপন্যাসের) আলোচক।

বিনোদিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত আচরণের কারণ কী এমন তাৎপর্যময় সত্য যে বিনোদিনী বিধবা, এবং সনাতন ঐতিহ্যের ধারণায় বিধবার প্রেম, বিবাহ, ইত্যাদি সমর্থনযোগ্য নয়; দাম্পত্যজীবন, পরিবার ও সমাজের স্বাস্থ্য ও শুচিতা রক্ষার জন্যই নয়। তাই বিধবার প্রেম-বিবাহ সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করবে সম্ভবত এমন আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ সমাজের বাঁধাধরা পথে চলেছেন। এর চেয়েও বড় কারণ ‘চোখের বালি’ ও ‘নৌকাডুবি’ রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ সনাতন সভ্যতার রক্ষণশীল চৌখুপিতে আবদ্ধ ছিলেন, তাই আশ্রমগুরু কিংবা সমাজপতির ভূমিকা তিনি বর্জন করতে পারেন নি। অথচ এ সময় ‘রবীন্দ্রনাথ যদি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মোহে আবিষ্ট না থাকতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে বাংলা উপন্যাসই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া উলফ-কথিত... নতুন দিগন্তের সমাচার দর্পণ হয়ে উঠতে পারত' (জ্যোতির্ময় ঘোষ)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাস— বিশেষ করে 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' প্রসঙ্গে এমন মূল্যায়ন সর্বাংশে সঠিক। 'নৌকাডুবি'র কাহিনী তথা আখ্যানভাগ যত দুর্বল বা নড়বড়ে হোক এ অঘটন-ঘটনার কাহিনী ও এর চরিত্রে আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটানোর প্রচণ্ড সম্ভাবনা নিহিত ছিল যা 'চোখের বালিতে'ও নেই। এ উপন্যাস রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ সে কথা ভেবেছিলেন কিনা তা কখনো জানা যাবে না, তবে উপন্যাসটি রচনার দীর্ঘকালপর ১৩৪৭ সালে রবীন্দ্ররচনাবলি প্রকাশের সময় সংযোজিত 'নৌকাডুবি'র ভূমিকা তথা 'সূচনা'র বক্তব্য (রবীন্দ্রনাথের লেখা) থেকে ঐ সম্ভাবনা আরো প্রকাশ পেয়েছে।

রচনাকালে এমন সম্ভাবনার কথা মনে থাক বা না থাক 'নৌকাডুবি'র ভূমিকা (সূচনা) লেখার সময়, রবীন্দ্রনাথ বেশ সরস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছেন। তার ভাষায় 'একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনাগ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্যসন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।... এর চরম সাইকোলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।' চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও শৈল্পিক প্রস্তাব!

এ প্রশ্নের জবাব রবীন্দ্রনাথ ঐ ভূমিকাতেই দিয়েছেন এই বলে যে, 'কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার, দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য এখানে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে, ঐতিহ্যবাহিত সংস্কারের পক্ষে যা অচলায়তনের মতো সমাজকে, পরিবার ও ব্যক্তিকে এক অসম্ভব বন্ধনের জড়ত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে। আধুনিক চেতনাও সহজে সে বন্ধন কাটতে পারে না।

অবশ্য একই লেখায় রবীন্দ্রনাথ বিকল্প সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন যে 'বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষপর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তাহলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্রাজিক শোচনীয়তার ক্ষত চিহ্ন।' কিন্তু তাঁর কথিত ঐ সম্ভাবনাময় পথ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন 'নৌকাডুবি'র লেখক রবীন্দ্রনাথ। ফলে ঘটনা ও চরিত্র ধারাবাঁধা পথে চলতে গিয়ে হয়ে উঠেছে নিষ্প্রভ, আকর্ষণহীন, গতানুগতিক ও সাদামাঠা। হয়তো এজন্যই মাঝে মধ্যে চমকপ্রদ কাব্যগুণ তথা কাব্যরস আনতে হয়েছে কাহিনীতে। আবার তাতে ইঙ্গিতময়তাও ছিল চমকপ্রদ যা গল্পের ভবিষ্যৎ-বাস্তবতার প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন জাহাজে কমলাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমে যাবার সময়ে বিশেষ অর্থবোধক তাৎপর্যময় একটি দৃশ্যচিত্র। কমলা রমেশের খোঁজে জাহাজের ছাদে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কারণ তখন 'চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়াছিল— সে মুখ যেন দূরে, বহুদূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।' রমেশ সচেতনভাবে তার ও পরস্ত্রী কমলার মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি করে চলেছিল তা-ই কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্যচিত্রের মাধ্যমে কমলার অনুভবে তুলে ধরেছেন। ছবিটি যেমন কাব্যগুণসম্পন্ন তেমনি ইঙ্গিতার্থময়।

ঐ জাহাজ যাত্রায় ঝড়ের সময়ে অনুরূপ একটি চিত্র আঁকা হয়েছে যখন রমেশ ও কমলার মধ্যে রমেশের কারণেই ব্যবধান বেড়ে চলেছে। এক ধরনের অজানা শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা কমলার মনে জেগে উঠেছে যার অর্থ বা তাৎপর্য তার নিজেরও জানা নেই। কমলার মনের ঐ অবস্থার প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে ঝড়ের মাতামাতি ও বাধাহীন শক্তির উদ্দাম আবহে। "এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকে বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মতো অব্যক্ত। একটা কোন অনির্দিষ্ট অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশ পাতালে এই মাতামাতি।... বাতাস কেবল 'না, না' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে— একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার। কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না— কিন্তু না— কিছুতেই না, না, না, না।" রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মাধ্যমে কমলার অবচেতন মনে নিহিত অস্থিরতা এবং তাদের সম্পর্কের নেতিবাচকতার প্রকাশ ঘটিয়ে কমলার প্রকৃত স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতার পক্ষে ভিত তৈরি করে দিলেন। কিন্তু এ ছবি ও মানসিকতা কতটা যুক্তিসম্মত এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করা চলে। কারণ, ঘটনা বলে কমলা তখনো রমেশকে স্বামী ভেবে নিয়ে পথ চলছে। প্রকৃত স্বামীর কথা সে তখনো জানে না।

সত্যই নৌকাডুবি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সনাতন ঐতিহ্যসম্মত সামাজিক সংস্কারের ভিত গড়তে গিয়ে সাহিত্যের বাস্তবতা ও আধুনিকতার আহ্বান উপেক্ষাই নয়, বলা যায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। সতীত্ব-পত্নীত্বের জয়, দাম্পত্যসম্পর্কের চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঘটনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে নারাজ ছিলেন তিনি। স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে বালিকা কমলার চরিত্র যেমন আরোপিত ঘটনার সঙ্গে মেলাতে চাইলেন তেমনি তা হয়ে ওঠল সঙ্গতিহীন। ঐ স্বামীসম্বন্ধের নিত্যতার তত্ত্ব বাস্তবের সত্য হিসাবে তুলে ধরতে চেয়ে কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ লেগে গেলেন তার ফলে সৃষ্ট ট্রাজেডির অসঙ্গত বাহন হলো রমেশ। রমেশ তার আচরণে কোনো ভুল না করেই ভুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাশুল গুনেছে ট্রাজেডির বাহন হয়ে। কমলার সঙ্গে তার নীতিসম্মত আচরণ কি তাহলে ভুল ছিল, তাতে কি মানবিক বিচারে অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটেছে?

সম্ভবত তাই। আর সে জন্যই রমেশ চরিত্র শুধু অনুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বহীনই হয়ে ওঠে নি, তার শিক্ষিত চেতনার মধ্যে যুক্তিবাদী আধুনিকতার হৃদয়বাদী কোনো প্রতিফলনও দেখা দেয় নি। রমেশ মনে হয় রক্তমাংসের সজীব পুরুষ নয় যার মধ্যে স্বাভাবিক কামনাবাসনা উপস্থিত। কমলাও অনেকটাই পুতুলের মতো, রমেশও তাই। কে যেন পর্দার আড়াল থেকে তাদের চালিয়ে নিচ্ছে। তাই রমেশ কখনো সদর্থে তার ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটাতে পারে নি। এক পর্যায়ে অক্ষয়ের কল্যাণে ঘটনার সংকট পর্যায়ে প্রেমিকা হেমনলিনীকে মন থেকে দূর করে দিয়ে স্ত্রীরূপে উপস্থিত অসহায় বালিকাকেই পত্নী হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েও রমেশ আবারও অনিশ্চয়তার শিকার হয়েছে, বাস্তব থেকে পিছিয়ে গিয়েছে। দ্বিধা, সংশয়, অনিশ্চয়তার অস্থিরতা রমেশের নিত্যসঙ্গী।

রমেশের এ অস্বাভাবিকতা, আচরণে অসঙ্গতি সব কিছুই লেখকের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। লেখকের সে-ইচ্ছার মূল কারণ তার ঐ তত্ত্ব প্রমাণের জন্য কমলার সতীত্ব-পত্নীত্ব রক্ষা করা; নারীত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ, পুরুষ-নারীর সান্নিধ্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটানো নয়। দাম্পত্যসম্পর্কের চিরন্তন ভাষ্যের সত্য-শুচিতা রক্ষা করাই ছিল এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র লক্ষ্য। লেখক সব কিছু একপাশে সরিয়ে রেখে তার ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ঘটনার জটিল জাল বিস্তার করেছেন, তাতে করে প্রধান চরিত্রে কোথাও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেলেও তা গ্রাহ্য করেন নি। নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে সনাতন সংস্কারকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, আর সেখানেই অন্তত রমেশ-কমলার স্বাভাবিক সম্পর্ক ও চরিত্রের বিকাশ ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যুক্তির স্বাভাবিক নিয়মে অস্বীকার করা চলে না যে রমেশ ও কমলা যতদিন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাস্তবতায় আবদ্ধ ছিল, লেখকের ভাষায়ই তা 'প্রায় তিনমাস সময়কাল ধরে, যখন রমেশ ঐ বালিকা বধূর সঙ্গে প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না' যাকে রমেশ ঐ ক'টা দিন 'ভবিষ্যত গৃহলক্ষ্মী হিসেবে কল্পনা করেছে', যাকে 'বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে ধ্যান করেছে, তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে মাদুর পাতিয়া বসিবার সাহচর্যের ঘনিষ্ঠতায়' বা অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় তাদের দৈহিক মিলন ঘটতে পারার কথা এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানে এমন কিছু ঘটাই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ঘটতে দেন নি। যদিও ঐ তিন মাসের মধ্যেই লেখকের ভাষ্যমতে 'রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।' তিনমাস স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের পক্ষে কম সময় নয়। কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্ক, সতীত্ব-পত্নীত্বের শুদ্ধতা রক্ষার বিধান মানার কারণে সে বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে নি। বিষয়টা নিয়ে হয়তো নববধূ কমলার মনে খটকা লেগেছে। লাগতে পারে এ কারণে যে বয়সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম হলেও বিবাহিত মেয়েরা এ ধরনের সম্পর্কের জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকে। আর লেখকের ভাষ্যমতে 'যদিও পূর্বে শুনা গিয়াছিল, (কিন্তু) বধূ তেমন নিতান্ত বালিকা নয়, এমন কি গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিক বয়স্কা বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল'— সেক্ষেত্রে উভয়ের যৌন মিলন ছিল নববিবাহিতের জীবনাচরণের স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পরিণতি এড়িয়ে গেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। 'কমলা-রমেশের বহু-অপেক্ষিত, বহু-তৃষ্ণিত, নিতান্ত সুস্থ-স্বাভাবিক যৌন মিলন ঠেকিয়ে রাখার জন্যেই রূপদক্ষ কবি, শিল্পী, স্রষ্টা ব্রহ্মচর্য আশ্রম-গুরু, তখন-প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কারসম্মত হিন্দু দাম্পত্য আদর্শের রক্ষক ও প্রায়-প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সচেষ্ট, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঘটনা-গ্রন্থনকে গৌণ জেনেও তিনি যখন ঘটনা জালের দুর্মোচ্য জটিলতা সৃষ্টিতে তৎপর হতে থাকেন' (জ্যোতির্ময় ঘোষ)।

উপরে উদ্ধৃত সমালোচকের অভিযোগ অস্বীকারের উপায় নেই। অবশ্য প্রমথনাথ বিশীর মতে হিন্দু বালিকার পক্ষে স্বামীকে ভক্তি করা এত স্বাভাবিক যে, কমলার পক্ষে নলিনাক্ষকে স্বামী বলিয়া পূজা করার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। কারণ, কমলা বালিকা, তাহার হৃদয়ে যে-'স্বামী' প্রতিষ্ঠিত সে হইতেছে তাহার হিন্দুসংস্কারের স্বামী, ধর্মের স্বামী। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও একই সুরে বলেছেন, 'যাঁহারা বাঙালি মধ্যবিত্ত গ্রাম্য উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকার মনস্তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে কমলার চরিত্রের মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নাই।' অন্যদিকে জ্যোতির্ময় ঘোষ পুতুল প্রতিমা কমলা চরিত্রকে 'অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব' বিবেচনা করেছেন।

কিন্তু আসলে সমস্যা ও কৃত্রিমতা অন্যত্র, অর্থাৎ ঘটনার মধ্যেই, যা প্রভাতকুমারও স্বীকার করেছেন এই বলে যে 'রবীন্দ্রনাথ উভয় উপন্যাসে ('চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি') যথাযথভাবে ঘটনা সৃষ্টি করিতে না পারিয়া— ভুলক্রমে পরিত্যক্ত পত্র ও পরস্পরকে লিখিত পত্র আশ্রয় করিয়া ঘটনাকে আগাইয়া দিয়াছেন ও উপন্যাসের ঘটনাক্রমে এ অস্বাভাবিকতা তাই একালের আলোচকদের অভিযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে আরো এজন্য যে এ অস্বাভাবিকতা চরিত্রগুলোর কোনো কোনোটিকে কম বেশি স্পর্শ করেছে।

আর 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক সংস্কারকে আঘাত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, 'নৌকাডুবি'তে সে সংস্কার অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় ততখানি পিছু হটেছেন। সমাজব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে, খুঁজে পেতে যেসব অদ্ভুত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা অনেক সময় কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।' এ মন্তব্য পূর্বোক্ত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের। তাঁর মতে লেখক রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে 'সমস্যা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সমাধান দিতে পারেন নি।'

আসলে সমস্যা সমাধানের চেয়েও বড় কথা ঘটনা ও চরিত্রের অস্বাভাবিকতা যা বিশেষ কিছু বিশ্বাস ও সংস্কারের দায়ে তৈরি। যদি হিন্দুস্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচলাভক্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিপূজার বিষয় সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মতামত মেনেও নেওয়া যায় তবু প্রশ্ন থাকে ঘটনার শুরুতে রমেশ-কমলা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী বলেই জেনেছে, তখন কমলার পক্ষে স্বামী রমেশের কাছে আত্মনিবেদন যেমন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল তেমনি রমেশের পক্ষেও স্বাভাবিক ছিল নববধূর সঙ্গে যৌন-মিলন। তখন কমলার জানা ছিল না স্বামী নলিনাক্ষ'র কথা, তাই অজানা স্বামীকে পূজা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সেটা ঘটতে পারত ঘটনা জানার পর।

বরং রমেশের সঙ্গে মিলনের আকুলতাই নববিবাহিতা কমলার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সেটা রমেশের পক্ষে হতে পারত না-জেনে শুনে বিষপান করা। কিন্তু 'জেনে শুনে বিষপানের' ব্যবস্থাপত্র তো রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া (মায়ার খেলা)। এ ক্ষেত্রে কমলা-রমেশের মিলনের পর ঘটনা তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেত, চরিত্রগুলোর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত হতো খুব স্বাভাবিক পরিণতির পথ ধরে। তাতে জৈবনিক আধুনিকতার বাস্তবতাই প্রতিফলিত হতো।

আগেই বলা হয়েছে সে সময়ে সামাজিক সংস্কার ও রক্ষণশীলতার দুর্গে বন্দি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না যদিও সাঁইত্রিশ বছর পর লেখা ভূমিকায় নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঐ স্বাভাবিক পরিণতির কথা তুলে নারীর মনে বন্ধন ও সংস্কারের অন্তরালাচালির পরিণাম সম্পর্কে চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন। হয়তো 'নৌকাডুবি' রচনাকালে তাঁর মনের ধাঁচ, তার মধ্যে শৈল্পিক আধুনিকতাবোধ ভূমিকা-('সূচনা') লেখকের মতো ছিল না। তাই সনাতন পন্থায়ই তিনি ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্রের রূপদান সম্পন্ন করেছিলেন। ভিন্ন সম্ভাবনার দিকে তাঁর নজর পড়ে নি।

যদি তাঁর কলম 'নৌকাডুবি'তে স্বাভাবিকতা আশ্রয় করত তাহলে তার সম্ভাব্য পরিণাম উপন্যাস বিচারে চিত্তাকর্ষকই শুধু হতো না তাতে চরিত্রগুলোতেও সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আধুনিক রূপায়ণ ঘটতে পারত। আবারো জ্যোতির্ময় ঘোষের বক্তব্য উদ্ধার করতে হয়, 'ধরা যাক কমলার সঠিক পরিচয় জানার আগেই, বিবাহিত স্ত্রীজ্ঞানেই রমেশ যদি কমলার সঙ্গে সুস্থ, স্বাভাবিক ও পূর্ণাঙ্গ যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করত— তাই ছিল স্বাভাবিক— এবং ধরা যাক তখন যদি সেই যৌন মিলন থেকে মাতৃত্বে পৌঁছত,— এবং ধরা যাক তখন যদি কমলা ও রমেশ দুজনেই জানতে পারত, রমেশ নয়, নলিনাক্ষই কমলার স্বামী আর নলিনাক্ষও জানতে পারত সব কথা : কী পরিণাম হতে পারত প্রধান তিনটি চরিত্রের অর্থাৎ তাদের মনের ছবিটা কী অদ্ভুত জটিল ও অবিশ্বাস্য গভীর তীব্র যন্ত্রণার্ত হয়ে উঠত!' কিন্তু "রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার সেই সত্যকে স্বীকার করার মতো আধুনিক মানসিকতায় তখন ছিলেন না, তাই 'নৌকাডুবি'র গল্পাংশে বারবার রোমান্সের বাতাবরণ তৈরি করেছেন।"

এক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত 'ধরে নেওয়া' অনুমান নয়; নর-নারীর, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মানসিকতা ও যৌন আকর্ষণের তত্ত্ব ও সত্য বিচার করে দেখলে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের 'সূচনা'ধৃত অস্ত্র চালাচালির কথা বিচার করে দেখলে বলতে হয় সদ্যবিবাহিতা রূপসী স্ত্রীর সঙ্গে মিলনই জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। অর্থাৎ রমেশ-কমলার যৌন মিলনই ছিল স্বাভাবিক বিষয়, আর পরবর্তী জটিলতা হয়ে উঠত এ ঘটনার পরিণাম স্বরূপ। তাতে এমন হতে পারত যে রমেশ না-জানা ভুলের আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতো (সে পথে পা না বাড়ানো সত্ত্বেও তাকে ট্রাজেডির বাহন হতে হয়েছে), কিছুটা রক্ষণশীল নলিনাক্ষ সম্ভবত অশুচিজ্ঞানে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারত না অথবা অতিউদারতা বশত শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহিত স্ত্রীকে তার না-জানা ভুলের জন্য ক্ষমা করে ঘরে স্থান দিলেও দু'জনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থেকে যেত এবং সে ব্যবধান দূর না হয়ে সময়ের ধারায় দুজনকেই আঘাতে রক্তাক্ত করে তুলত। অন্যদিকে কমলার পক্ষে অদৃশ্য সামাজিক-নৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে হয়তো বা সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া কালের হিসাবে খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠত। মানসিক চাপ তো কমলার জন্য অনিবার্যই ছিল।

এ সবই সম্ভাবনার কথা, তবে বাস্তবতা-বিবর্জিত নয়। বরং 'নৌকাডুবি'তে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সমাজ-পরিবার-দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে সনাতন হিন্দুঐতিহ্য ও প্রচলিত প্রথারীতির প্রতি সম্মান জানাতে যেয়ে বাস্তবতা, আধুনিকচেতনা ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনবোধ ও জীবনাচরণ থেকে সচেতনভাবেই দূরে সরে ছিলেন। আর সেকারণে ঘটনা যেমন অনেক ক্ষেত্রে পারম্পর্যসূত্রহীন (যেমন মাতৃভক্ত নলিনাক্ষের তার বিয়ের কথা, ঝড়ে স্ত্রী হারানোর কথা তার মাকে না-জানানো, কমলার মতো বালিকার পক্ষে গৃহত্যাগ করে বিনাসহায়তায় নিরাপদে বিভিন্ন স্থানে বসবাস, ঠিক সময়মতো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উমেশের দেখা পাওয়া এমনি একাধিক ঘটনায় কাহিনীর সুষ্ঠু পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি। আর চিঠির প্রসঙ্গ তো প্রভাতকুমারই উল্লেখ করেছেন অস্বাভাবিক বলে), চরিত্র সৃষ্টিতেও অবাস্তবতা লক্ষ করার মতো। শুধু কমলাই নয়, রমেশও হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বহীন, ফাঁপা রোমান্সে ঠাসা যুবকের বাস্তবতাবর্জিত এক চরিত্র যার পক্ষেই সম্ভব তিন মাস নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে একত্রবাস করে, রোমান্টিক প্রণয় চর্চা করেই দিন কাটানো এবং স্ত্রীর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব না করা, তার সঙ্গে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত না হওয়া। তাই তাকেই হতে হয়েছে 'ট্রাজেডি'র একমাত্র বাহন'। আর নলিনাক্ষ তো সনাতন ধর্মের সামাজিক ও জৈবনিক রূপের প্রতীক এক নিষ্প্রভ চরিত্র যার মধ্যে আধুনিক চেতনার ছায়াও দেখতে পাওয়া যায় না।

তাই স্বীকার করতে হয় 'নৌকাডুবি'র চরিত্রগুলোকে যে ঘটনা ও সম্ভাবনার বাস্তবতাসম্মত তপ্ত-কটাহে স্থান করলে আগুনের আঁচে যন্ত্রণার্ত ঐসব চরিত্রের সঠিক পরিণতি ঘটাতে পারত আধুনিক চেতনার উদ্‌ঘাটন ও উন্মোচন, রবীন্দ্রনাথ সামাজিক-পারিবারিক শুচিতা রক্ষার টানে তা সযত্নে পরিহার করেছেন। তাই 'নৌকাডুবি' আধুনিক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস না হয়ে সনাতন রীতিপ্রথার সাত্ত্বিক কাহিনী হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে নারীত্বের স্বাভাবিক প্রতিফলন যেমন ঘটে নি তেমনি নারীর স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিসত্তার প্রকাশও ঘটে নি। এ সবই হার মেনেছে সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যশুচিতার সনাতন ধ্যান-ধারণার কাছে। পতিভক্তির নিঃশর্ত সমর্পণে দাম্পত্যমহিমার জয় ঘোষিত হয়েছে এবং নারীত্ববোধ সেখানে অপাংক্তেয় বিবেচিত। এ উপন্যাসের নায়িকা দ্রোহে নয় স্বামীর প্রতি আত্ম-নিবেদনের আদর্শে রচিত, আর সেই আদর্শসম্মত নায়িকা কমলা। সমকালে নগেন্দ্র গুপ্তের উপন্যাসে ('তপস্বিনী') 'রিয়ালিজমের নির্ভীক নগ্নতা' প্রকাশ পায় নি বলে রবীন্দ্রনাথ যে সমালোচনা করেছিলেন এবং 'বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা' খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন, সে ধরনের অভিযোগ কম বেশি 'চোখের বালি'র বিধবা সম্পর্কে খাটে। আর 'নৌকাডুবি' ? ঐ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও নারীত্ব ভাবনায় বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই সেখানে বাস্তবতার নগ্ন প্রকাশ ঘটানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের যে-মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা কেন রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে প্রয়োগ করেন নি, সে রহস্যের ব্যাখ্যা মেলে তৎকালীন রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার মধ্যে। কথাটা পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও সত্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীভাবনায় দুই বিপরীতের প্রকাশ গোরা উপন্যাসে

'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়া থেকে যদি 'নৌকাডুবি' রচিত হয়ে থাকে (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) তাহলে বলা চলে সময় ও বিশ্বাসের হাওয়াবদলের ওপর নির্ভর করে বা ঐ ধারায় 'নৌকাডুবি'তে প্রতিফলিত সনাতন বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নতুন করে ঐ বিশ্বাস নিয়ে ভাবনা পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা'য় পরিস্ফুট। তবে এতে দুই বিপরীত ধরনের নারীভাবনা স্থান পেয়েছে, যদিও সমন্বয়ের চেষ্টা সেখানে দেখা যায়। মহর্ষি পিতার মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সনাতন সমাজভাবনায় ক্রমশ যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে তার প্রাথমিক প্রতিফলন 'গোরা' উপন্যাসের নামচরিত্র থেকে একাধিক চরিত্রে ও ঘটনাবিন্যাসে ধরা পড়েছে।

'গোরা' শিরোনামে যে দীর্ঘ উপন্যাস ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, গ্রন্থাকারে সে উপন্যাসের প্রকাশ ১৯১০ সালে। এর প্রধান অংশে 'নৌকাডুবি'তে প্রতিফলিত সতীত্ব-পতীত্ব-দাম্পত্যশুচিতা ও পরিবারধর্ম বিষয়ক রাবীন্দ্রিক বিশ্বাস তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক ধারণার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। পেয়েছে বেশ কিছু চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে। 'গোরা'য় হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বা সীমাবদ্ধতা এবং ব্রাহ্মধর্মের দোষগুণ সম্পর্কে পরিবেশিত বক্তব্য এবং সেই আলোকে চরিতচিত্রণ আমাদের আলোচ্য বিষয় না হলেও সে সুবাদে পরিস্ফুট নারীর সামাজিক অবস্থান ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিষয়ক রবীন্দ্রভাবনা বিচার্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও নায়িকা চরিত্রের মতো 'গোরা' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার প্রতিফলন কতটা ঘটেছে, নায়িকা চরিত্রে প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দ্রোহে বা সমর্পণে কতটা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই দেখবার বিষয়। সন্দেহ নেই কাহিনীর প্রথমাংশে, আসলে প্রায় অনেকাংশে হিন্দুধর্মের বর্ণবাদ, আচার-আচরণের শুচিতা বিচার, জাতপাতবিচার এবং ধর্মচেতনা ও স্বাধিকার চেতনাকে একাকার করে দেখার প্রবণতা গোরা চরিত্রে পরিস্ফুট যদিও কাহিনীর শেষে এক অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাবে তার বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন ঘটে, ফলে উগ্রধর্মনিষ্ঠা উদার মানবিক চেতনায় উত্তীর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে 'গোরা' প্রসঙ্গ বাদ দিলেও কৃষ্ণদয়াল, তার পুত্র মহিম থেকে অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে স্বধর্মাচরণ ও সংস্কারবাদিতা উগ্রভাবে পরিস্ফুটিত, যদিও যুক্তিতর্কের সাহায্যে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। 'গোরা'র মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই। 'গোরা' উপন্যাসের মূল চরিত্র গোরা রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র— এমনটাই সমালোচকদের অভিমত। এর বিপরীত প্রান্তে রয়েছে কট্টর ব্রাহ্মবাদী চরিত্রগুলো। এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী সহিষ্ণু মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ চরিত্রের মধ্যে এক পাশে হিন্দু আনন্দময়ী, অন্য পাশে ব্রাহ্ম পরেশ বাবু। এদের ছায়ায় বিনয়, সুচরিতা, ললিতা এবং কাহিনীর শেষ পর্যায়ের গোরা। এরা অবশেষে চরিত্রধর্ম বিচারে হিন্দু নয়, ব্রাহ্ম নয়, খ্রিষ্টান নয়, এদের বড় পরিচয় এরা মানুষ।

দুই

সত্য যে 'গোরা' উপন্যাসে পটভূমি, কাহিনী ও চরিত্র বিচারে দেশের ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির অভিক্ষেপে। ধর্ম, জাত্যাভিমান ও দেশের স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বিচার-বিশ্লেষণই ছিল 'গোরা' উপন্যাসের লক্ষ্য। তাই দেখা যায়, গোরা বা পরেশ বাবুর মুখ দিয়ে ঐসব বিষয়ে উচ্চারিত মতামত রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধে উপস্থিত। ক্ষেত্রবিশেষে প্রবন্ধে উপস্থাপিত মতামত প্রায় একই ভাষায় উপন্যাসে পরিবেশিত হতে দেখা যায়, বিশেষ করে ধর্ম, সম্প্রদায়, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত পরেশ বাবুর বক্তব্যে।

AMARBOI.COM

হয়তো তাই এ উপন্যাসের দীর্ঘ বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার প্রতিফলন ঘটনা বা চরিত্রে ততটা ব্যাপক নয় যতটা দেখা গেছে 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' কিংবা পরবর্তী পর্বের উপন্যাসগুলোর ঘটনাবৈশিষ্ট্যে বা চরিত্রচিত্রণে। তবু গোরা ও সুচরিতার ধর্ম, সমাজ ও আচার বিষয়ক বিতর্কে এর কিছুটা আভাস মেলে, যেমন মেলে নারীর অধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে উচ্চারিত বক্তব্যে। শেষোক্ত দিক থেকে কখনো আনন্দময়ী বা বিনয় এবং পূর্বাপর ললিতা চরিত্র বিশিষ্ট। স্বাধীনচেতা ললিতা চরিত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার প্রকাশ শুরু থেকেই স্পষ্ট, যদিও এটি পার্শ্ব-চরিত্র। সুচরিতার ধীরস্থির ভাবুক চরিত্র যদি সংস্কারবাদিতার সঙ্গে সমন্বয়চেতনার প্রতীক হয়ে থাকে, গোরা যদি তার মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকে তাহলে বলতে হয় ললিতা চরিত্র এর ঠিক বিপরীত। তার আপাত-অপরিণত (বয়সের দিক বিচারে) চরিত্রের মধ্যে বাস্তবতা ও আধুনিক চেতনার উত্তাপ লক্ষ করা যায়, যদিও আবেগ সেখানে অনুপস্থিত নয়। তার মধ্যে সনাতন ভারতীয়ত্ব-নিরপেক্ষ নারীত্ব তথা ব্যক্তিসত্তা-নির্ভর নারীচেতনার প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী (তা নারী বা পুরুষ যারই হোক), অদ্ভুত রকম জেদি মেয়ে ললিতা তাই বিনয়ের ওপর গোরার প্রভাব প্রসঙ্গে অনায়াসে বলতে পারে : 'ওঁর বন্ধু (অর্থাৎ গোরা) ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেছে— ওরকম অবস্থায় কাঁচপোকার উপরেও আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও আমার শ্রদ্ধা হয় না।... আমাকে যদি কেউ ওরকম চাপা দিতে চেষ্টা করত আমি তাকে একদিনের জন্যেও সহ্য করতে পারতুম না।' এই হলো স্বাধীনচেতা তরুণী ললিতা যাকে শুরুতেই স্ফুলিঙ্গের আঁচ ও তাপের সাহায্যে তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু পাশাপাশি ললিতার দিদি সুচরিতাকে প্রথম থেকে লেখক বিপরীত চরিত্রের ও ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা হিসাবে উপস্থিত করেছেন। ধীরস্থির সহিষ্ণু ও শান্ত প্রকৃতির এ তরুণী সহজে আবেগাক্রান্ত নয়, সে ধীরেসুস্থে বুঝেশুনে তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নেয়, তারপর কখনো তা প্রকাশ করে, কখনো অপ্রয়োজন মনে হলে প্রকাশ করে না। সে যেমন উগ্র ব্রাহ্মমতাবলম্বী হারান বাবুর মতামতের আতিশয্য সহ্য করে তেমনি সহ্য করে বা শোনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মবিরোধী গোরার প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বক্তৃতা। পরেশবাবুর প্রভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণবোধের প্রতি তার আস্থা গভীর। তা সত্ত্বেও গোরার যুক্তিতর্কের প্রভাবে ব্রাহ্মবিশ্বাস থেকে হিন্দুত্ববিশ্বাসে পৌঁছাতে তার বাধে না। বুদ্ধি ও শিক্ষার আলোয় সে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করে।

স্বভাবতই সুচরিতা তরুণী হওয়া সত্ত্বেও তার বুদ্ধি শিক্ষা ও মাধুর্যের প্রতি গোরা আকর্ষণ বোধ করে। যে-গোরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও ব্রাহ্মবিরোধী, যে-গোরা শিক্ষিত ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে অতিআধুনিকতার উদ্ধত্য ও প্রগলভতা কল্পনা করে অরুচি বোধ করে, সেই গোরা সুচরিতা নাম্নী ব্রাহ্ম তরুণীর মধ্যে 'কোমল কল্যাণী রূপ' আবিষ্কার করে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার চোখে সুচরিতা যেন 'শান্ত সন্ধ্যার আলো, সেবাকুশলা নারী, যে-নারী যত্ন, স্নেহ ও সৌন্দর্যের' প্রতীক। সন্দেহ নেই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-কথিত নারীর কল্যাণী রূপের তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর সুচরিতাকে ঘিরে গোরার নারীধারণা প্রকৃতির সমান্তরালবর্তিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নারীধারণার আধার হয়ে উঠেছে। সুচরিতার ব্যক্তিরূপের প্রভাবে আক্রান্ত গোরা সন্ধ্যায় পরেশ বাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যমনস্কভাবে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ায়। 'প্রকৃতি কোনোদিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই।' কিন্তু 'আজ বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল।... হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।' প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে সুচরিতাকে অনুভব করে গোরা।

কিন্তু গোরার স্বভাবধর্ম ভিন্ন বলেই মায়াবিনী প্রকৃতির প্রভাবে অভিভূত না হবার সংকল্পবদ্ধ হয়ে 'গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমল কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল— কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলির স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুত চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে, সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল।' গঙ্গাতীরে প্রকৃতির রূপসুষমার মধ্যে নারীপ্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের নারী ও প্রকৃতিতত্ত্বের সূত্রই যেন তুলে ধরেছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নারীবাদে বহুকথিত প্রকৃতিবাদের প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ তার নারীবিষয়ক ভাবনায় বিভিন্ন মাত্রায় নারীর যে দুই বিপরীতের প্রকাশ স্পষ্ট করেছেন একাধিক প্রবন্ধে বা কবিতায় বা নাটকে সেখানে একদিকে নারীর লক্ষ্মী কল্যাণীর শ্রীময়ী রূপ অন্যদিকে প্রেয়সী রূপ (উর্বশী সুন্দরীর প্রশ্ন বাদ দিয়েই) যে-রূপ মোহিনী হয়েও উচ্ছৃঙ্খল নয়। কিন্তু তত্ত্বে প্রকাশ না পেলেও গল্পে বা উপন্যাসে শেষোক্তের বিদ্রোহী রূপ মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে, অবশ্য তা ঘটনা ও অবস্থার প্রকৃতিভেদে। কিন্তু প্রথমোক্তের কল্যাণীরূপ প্রধানত গৃহলক্ষ্মীরূপে, সেবার মাধুর্যে ও সহিষ্ণু শ্রমে যে সংসারের মঙ্গল ও গৃহধর্মের শুচিতা রক্ষা করে থাকে।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক দুই নারীতত্ত্বের একদিক প্রকাশ পেয়েছে সুচরিতা ও ললিতার দুই বিপরীত চরিত্রে। অবশ্য আনন্দময়ী সুচরিতার অনুসরণযোগ্য আদর্শ নারী— একাধারে গৃহলক্ষ্মী এবং ঘরের মঙ্গল ও কল্যাণের আধার, যার চরিত্রে মাধুর্য ও দৃঢ়তা সমান শক্তিতে পরিস্ফুট। দুই বিপরীতের সমন্বয় ঘটিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের সংহতিরক্ষায় তার ভূমিকা অসামান্যের। গোরা ও বিনয়ের মতো দুই ভিন্ন চরিত্রকে তিনি একাই ধারণ করতে পারেন, অন্যদিকে সহাবস্থান ঘটাতে সক্ষম ধর্মবাদিতার সঙ্গে মানবিকতার। সম্ভবত বাস্তবে এমন একটি নারীর কল্পনাই রবীন্দ্রনাথের বরাবর অন্বিষ্ট ছিল।

সুচরিতা ও ললিতার দুই বিপরীত চরিত্রধর্মের প্রকাশে গোরা ও বিনয়ের পরোক্ষ উদ্দীপক ভূমিকা থাকলেও তা গৌণ। ওরা আপন চরিত্রধর্মেই দুই ভিন্ন নারীপ্রকৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই সুচরিতা আপাত বিচারে গোরার প্রভাবে পরিস্ফুট মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে গোরাকে অতি উগ্রতা থেকে রক্ষায় পরিত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে ললিতা বিনয়ের অতিনম্রতা ও পরনির্ভরতার অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে ব্যক্তিত্বময়ী পরিপূর্ণ নারীতে (তরুণী বয়সেই) উত্তীর্ণ করেছে ললিতা।

বিনয়কে ঘিরে, বিনয়ের প্রতি তার প্রেমের প্রকাশের টানে তার স্বাধীন নারীসত্তার ক্রমউন্মোচন ঘটেছে যদিও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তার স্বভাবে-প্রকৃতিতে উপস্থিত ছিল। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাৎক্ষণিক আবেগের টানে সমাজের সংস্কারবাদী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আপন উদ্যমে জাহাজযাত্রায় একা বিনয়ের সঙ্গী হতে, যদিও সে যাত্রা ছিল কলকাতা পর্যন্ত। কিন্তু গোটা পরিবারের সদস্যদের পেছনে ফেলে রেখে তাদের আপত্তি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাপত্তির দিকে না তাকিয়ে এভাবে চলে আসাটা ছিল নিঃসন্দেহে দুঃসাহসের যা সুচরিতার পক্ষে সম্ভব হতো না। সুচরিতার ধীরস্থির বুদ্ধি ও বিচারভাবনাই এ কাজে তাকে বাধা দিত।

এ জন্যই অল্পবয়সী তরুণী হলেও নারীচরিত্র বিচারে ললিতা বিদ্রোহী। ভদ্রতার মুখোশ তার জন্য নয়। তাই তার মুখেই মানায় এমন কথা, 'মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝি নে। আমাদের পক্ষেও ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভব আছে।' এ সংলাপ একালের যে-কোনো নারীবাদীর মুখনিঃসৃত বলে মনে হতে পারে। ললিতার এ প্রতিবাদী বক্তব্যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিদ্রোহী নারী মেজবৌ মৃণালের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়, যদিও মৃণালের বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত ভক্তিবাদে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু ললিতা কাহিনীর সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার এ তেজস্বিতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বিদ্রোহী চরিত্র বজায় রেখেছে। বিশেষ করে যখন বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে উপলক্ষে তার পরিবার (পিতা পরেশ বাবু বাদে), সমাজ (ব্রাহ্মসমাজ) এবং আশপাশের সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে তখনো ললিতা ভেঙে পড়ে নি, তার তরুণী-ব্যক্তিত্বের কোথাও চিড় ধরে নি। সামাজিক রীতি প্রথার চাপ তাকে টলাতে পারে নি। বিনয় এদিক থেকে দুর্বলতার ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে। তার মধ্যে দেখা গেছে দোলাচলচিত্ততার প্রতিফলন।

ললিতার এ বিদ্রোহ নিছক ব্যক্তিক, পারিবারিক এবং সামাজিক বিচারে তা বড় মাপের না হওয়া সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ বৃত্তের তেজদীপ্তি অনস্বীকার্য। ললিতা চরিত্র এঁকে তুলতে রবীন্দ্রনাথকে তাই আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটাতে হয়েছে। হয়তো তাই লেখক তার মধ্যে 'লালিত্যের বদলে স্বাতন্ত্র্যের তেজ ও শক্তির দৃঢ়তা' পরিস্ফুট করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য তাকে ব্যক্তিত্বময়ী তরুণী রূপে তথা নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

রবীন্দ্রনাথ যে সত্যই ললিতাকে একটি বিদ্রোহী চরিত্রে রূপদান করেছেন তার প্রমাণ এ অল্প বয়সী মেয়েটির মধ্যে যুক্তিনির্ভর জেদ ও তেজের প্রকাশ। সমাজের সঙ্গে তথা মিথ্যার সঙ্গে লড়াইয়ের যখন প্রয়োজন দেখা দিল তখন "সে প্রতি রাত্রে শুইতে যাইবার আগে বলিতেছিল 'কখনোই আমি হার মানিব না' এবং প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে, 'কোনো মতেই আমি হার মানিব না।' শেষপর্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল।... য়্যুরোপের লোকহিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে সকল কীর্তি কাহিনী সে পাঠ করিয়াছিল সেইগুলি তাহার নিজের পক্ষে সাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

এমন দৃঢ়তা ও লড়াকু মানসিকতা সুচরিতার মধ্যে দেখা যায় নি যদিও রবীন্দ্রনাথ সুচরিতা চরিত্র তার মনের মাধুরী মিশিয়ে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন, বিশেষ করে গোরার প্রিয়সঙ্গিনী হিসাবে। কিন্তু তুলনায় ললিতা চরিত্র যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীচেতনার প্রতীক তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আর য়ুরোপীয় নারীস্বাধিকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেক্ষাপটেই যে রবীন্দ্রনাথ স্বকালের বিচারে আধুনিক চেতনার প্রতিভূ ঐ তরুণী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকেও তা বুঝতে পারা যায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা তার নানান স্ববিরোধিতার মধ্যেও আধুনিক চেতনার প্রতীক। এবং তা রবীন্দ্রচৈতন্যে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবজাত ফসল বলে ধরে নেওয়া যায়।

এদিক থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি আচারে ও দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে সম্পূরক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে আনন্দময়ীর বক্তব্যে। বিয়ের সামাজিক দিক ও ঘর-সংসারের দিক বিচারে রবীন্দ্রভাবনায় প্রায়শ রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু আনন্দময়ীর মুখে বিবাহ বিষয়ক যে-ভাবনার (যা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই) প্রকাশ ঘটেছে তা রীতিমতো আধুনিক। আনন্দময়ী তাই নির্দ্বিধায় বিয়ের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলেন : 'মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে— সে সময় কোন্ মন্তরটা পড়া হলো তা নিয়ে কী আসে যায় ? ... ব্রাহ্মই বা কে, হিন্দুই বা কে! মানুষের হৃদয়ের তো কোনো জাত নেই— সেইখানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন। তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি ?'

আনন্দময়ীর জাতপাত বিরোধী, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ও সংস্কার-বিরোধী হৃদয়বাদী যে মতামত এখানে পরিস্ফুট তাতে মানবিক চেতনার এতটাই প্রাধান্য যে এ মতামত বা চিন্তায় রবীন্দ্রভাবনার প্রতিফলন রয়েছে বলে মনে হয়। বিয়ে সম্পর্কে এ চিন্তায় সর্বাংশে আধুনিক মানসিকতার ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। বিবাহপ্রথার ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির শুদ্ধতা ও গুরুত্ব এবং পারিবারিক জীবনে এর ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বভাবনা বিশেষ করে 'নৌকাডুবি' পর্বের বিশ্বাসের সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত মতামতের একেবারে মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় প্রথাগত সংস্কারবাদী বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে বলে আনন্দময়ীর এ মতামত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে তিনি এ উপন্যাসের চরিত্র বিচারে প্রতিনায়িকা নন বলে।

এর অর্থ কি তাহলে এমন দাঁড়ায় যে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বের তথা 'নৌকাডুবি' পর্বের রবীন্দ্রনাথের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার বিষয়ক ভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছে ? কিন্তু এ উপন্যাসেই গোরার নারীবিষয়ক ভাবনায়, এমনকি বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে সংস্কারবাদী ও কিছুটা রক্ষণশীল, সনাতন-ঐতিহ্যবাদী বিশ্বাসের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এ বৈপরীত্য রবীন্দ্রচেতনায় উপস্থিত স্ববিরোধিতার পরিচয় তুলে ধরে, মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রচেতনায় 'অসমন্বিত দ্বন্দ্ব' সম্পর্কে কারো কারো অভিমত (মানসী দাশগুপ্ত)। তবু এ উপন্যাসের শেষে গোরার আমূল পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দিকবদলের ইঙ্গিত দেয়। তবে তা কাহিনীর শেষ পর্যায়ে।

তাই কাশীর গোঁড়া হিন্দুপরিবারের মেয়ে আনন্দময়ী, অবস্থা ও নানা কারণে পরিবর্তিত চেতনার আনন্দময়ীর উদার আধুনিক বোধের সঙ্গে তার কন্যাসম ললিতার সংস্কারবিরোধী বিদ্রোহী চেতনার সামঞ্জস্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও নারী-ভাবনায় বৈপরীত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারক রবীন্দ্রনাথ কি সচেতনভাবেই গোরার সনাতন চিন্তার ধারক রূপে সুচরিতাকে আনন্দময়ীর পাশে বসিয়ে পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন! যেন বলতে চান : গোরার চিন্তাভাবনার আলোকে দেখে নাও ভিন্ন এক নারী চরিত্রের সুচরিতাকে। এমন প্রশ্ন খুব অস্বাভাবিক ঠেকে না।

উপন্যাসের ঐ দৃশ্যপটে গোরার মানসী সুচরিতা যেন 'ভারতের নারীপ্রকৃতির প্রতীক! গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে প্রেমে মধুর ও পবিত্র করে তোলার জন্যই এর আবির্ভাব।' গোরার চোখে সুচরিতাকে মনে হয়েছে 'ঈশ্বরের অক্ষয় দান চিরসহিষ্ণু, ক্ষমা পূর্ণ প্রেমের প্রতিভূ এক নারী যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীর প্রকাশ যে-লক্ষ্মী শতদল পদ্মের উপর আসীন।' একমাত্র এ লক্ষ্মীর উপস্থিতিতেই ঘরে-সংসারে শুভ কল্যাণ ও শ্রী জন্ম নিতে পারে। বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী নারীর পরিবর্তে নারীর এ সতীলক্ষ্মী করুণাময়ী, প্রেমময়ী রূপই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর সাধনার ধন।

নানা প্রয়োজনের টানে, ঘটনাবৈচিত্র্যে বা সমকালের দাবি ও আধুনিকতার টানে রবীন্দ্রনাথ তার শিল্পকর্মে কখনো কখনো বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী নারীচরিত্র সৃষ্টি করলেও তা যেন তাঁর চিরাচরিত নারীভাবনায় সবসময় গরিমার আসন খুঁজে নিতে পারে নি। ধর্ম ও কল্যাণচেতনাকে গৃহলক্ষ্মী প্রেয়সী নারীর সঙ্গে একাকার করে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের যৌথ জীবনযাপনের আদর্শ ও সার্থকতা খোঁজ করেছেন। সুচরিতার মধ্যে গোরার এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ নারীরূপ প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে সনাতন ধারণার অনুসারী হিসাবে গণ্য করা চলে।

নারী ও সমাজবিষয়ক চিন্তার দুই ধারার মধ্যবর্তী পর্বে রচিত 'গোরা'য় নারীচরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সচেতন বা অচেতনভাবে দুই নারীরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এমন কি প্রথা, রীতিনীতি ও সমাজধারণার ক্ষেত্রেও একই ধরনের দুই বিপরীতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তা না হলে হরিমোহিনীর অনুরোধে গোরার লেখা চিঠিতে বিবাহ বিষয়ক এমন বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন না যা আনন্দময়ীর পূর্বোক্ত মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুচরিতাকে লেখা ঐ ছোট্ট চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ :

> "বিবাহই নারীজীবনে সাধনার পথ, গৃহধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম। এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যাণ সাধনের জন্য। সংসার সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, এক মনে সেই সংসারকে বরণ করিয়া, সতীসাধ্বী পবিত্র হইয়া ধর্মকেই রমণীগৃহের মধ্যে মূর্তিমান করিয়া রাখিবেন এই তাহাদের ব্রত"।

অস্বীকার করা যায় না যে গোরা তার সমাজ-সংসার বিষয়ক নিশ্চিত ধারণা ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই কথাগুলো লিখেছে। এ কথাগুলো যে রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাসের জগতে অন্তর্ভুক্ত, একাধিক সৃষ্টিকর্ম বাদ দিয়েও তাঁর প্রবন্ধাদি থেকে অনুরূপ বক্তব্য তুলে প্রমাণ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চান নি যে গৃহধর্ম শুধু একা নারীর হবে কেন, দাম্পত্যজীবনের যৌথযাত্রায় গৃহকর্ম ও গৃহধর্মে পুরুষের অর্থাৎ স্বামীরও ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্যের দায়। নারীর সতীত্বের পাশাপাশি পুরুষের সততার অভাব ঘটলে সংসার সুখের হতে পারে না। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' এ ধরনের আপ্তবাক্য নারীর হাত দিয়েই সূচিকর্মে ঘরে টানিয়ে রাখার প্রথা একসময়ই খুব প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরুষের গুণও যে তাতে যুক্ত হওয়া দরকার একথা বলার মতো সাহস সেকালের 'সতীসাধ্বী' নারীর ছিল না, একালেও ক'জন পারে তা বলতে।

গোরা তথা রবীন্দ্রনাথের এ নারীভাবনায় এ পর্যন্ত সনাতন ঐতিহ্যের সংস্কারবাদী রক্ষণশীলতার প্রকাশ তুলনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারা যায় এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তখনো নারীর জীবনাচরণ বিষয়ে পুরোপুরি আধুনিক ধারণা সর্বাংশে গ্রহণ করতে বা সে বিষয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যে ব্যক্তি হিসাবে নারীর হৃদয়ধর্ম ও চিন্তার স্বাধিকার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ সবই সতীসাধ্বীর পবিত্র গৃহধর্ম পালনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুচরিতা রাধারানী হয়ে সনাতন গৃহলক্ষ্মীর আদর্শই মর্যাদাবান করে তুলতে চেয়েছে, এমন কি চেয়েছে পরে গোরার প্রভাবে আত্মসমর্পণ করেও।

তা না হলে গোরার পূর্বোক্ত হাত-চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে সুচরিতা এমন চিন্তা প্রকাশ করতে পারত না যে 'লেখাটির মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাহা নূতন বা অসংগত। কথাগুলির সহিত সুচরিতার মতের যে অনৈক্য আছে তাহাও নহে।' এ বক্তব্য তৃতীয় পুরুষে পরিস্ফুট বলেই ধরে নিতে হয় যে রিয়ে, দাম্পত্যজীবন ও সংসার ধর্ম সম্পর্কে উক্ত মতামত যেমন গোরার, তেমনি সুচরিতার, যাতে রবীন্দ্রনাথেরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

AMARBOI.COM

তিন

পাঠক ও সমালোচকের কাছে রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের বৈপরীত্যময় ভূমিকা সত্যই দুর্বোধ্য। আসলে রবীন্দ্রনাথ তখনো নারীভাবনা বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত-সূত্রে পৌঁছাতে পারেন নি (এ বিষয়ে একমুখী বিশ্বাসে আদৌ পৌঁছাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না)। তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় তাঁকে স্ববিরোধিতার সম্মুখীন করে তুলেছে সৃষ্টিধর্মী রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাসে। প্রবন্ধে এ দ্বৈতরূপ তো এতই স্পষ্ট যে তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। এই দ্বৈতযাত্রার কারণে বিনোদিনী বা আশা, দামিনী বা বিমলা কিংবা কুমু, সুচরিতা বা ললিতা যেমন দুই ভিন্ন চরিত্রের, তেমনি মৃণাল ও সোহিনী একেবারে ভিন্নমেরুর। প্রবন্ধেও দুই ভিন্ন মতের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তবু সব মিলিয়ে যেন ঐতিহ্যনির্ভর সনাতন ভাবনার দিকেই ভার অনেকটা বেশি।

ঐ ভার যেমন গোরা পর্বে তেমনি পর্বান্তরেও চরিত্রবিশেষ নির্মাণে লক্ষ করার মতো। তাই গোরার সনাতন ভাবনার আলোয় রবীন্দ্রনাথ ঐ উপন্যাসের প্রধান নায়িকা সুচরিতা চরিত্রটি উজ্জ্বল করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এবং করেছেন তাকে পতিভক্তি, সতীধর্ম, গৃহধর্ম ও দাম্পত্যদায়ের সুকঠিন অনুশাসনের চৌখুপিতে বসিয়ে। ঐ চৌখুপিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দি গৃহলক্ষ্মীর কর্তব্য সর্বদা স্বামী, সন্তান, গুরুজন তথা সংসার সেবায় নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা। এটাই দাম্পত্যজীবনে নারীর মুখ্য কর্তব্য এবং এতেই তার মোক্ষলাভ, সেই মোক্ষ লাভ ইহজাগতিক না হলেও ক্ষতি নেই। এতেই সংসারের কল্যাণ, সকলের কল্যাণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভেবে বা হিসাব করে দেখেন নি যে ঐ সেবায় আত্মদানের বিনিময়ে নারীর ব্যক্তিগত পার্থিব কল্যাণ কতটুকু। পূর্বোক্ত গুরুভার গৃহলক্ষ্মী নারীর মাথায় চাপিয়ে দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবতে চান নি, একা ঐ ভার বইবার শক্তি স্ত্রী নাম্নী নারীর কতটা আছে এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে সার্বক্ষণিক সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার মধ্যে পারলৌকিক মুক্তির স্বপ্ন ও আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যক্তিনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আদৌ পূরণ হতে পারে কি না। এ ব্যবস্থার পরিণামে গৃহলক্ষ্মী নারীর জীবন ভারবাহী পশু বা ক্রীতদাসীর মতো হয়ে উঠারই তো কথা।

তাছাড়া এ ধরনের দায় থেকে পুরুষই বা মুক্তি পায় কেমন করে! কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের ঐতিহ্যবাহী বিধানের বলে পুরুষকুলের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে গৃহধর্ম পালন, সেবার দায়িত্ব ও কাজকর্ম এককভাবে নারীরই। এ ধারণা একুশ শতকের উচ্চশিক্ষিত, পাশ্চাত্য দেশে ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষের মধ্যেও যে প্রবল, বিদেশের অভিজ্ঞতা কিছুটা হলেও যে তাদের মনে প্রভাব ফেলে নি তার বিস্তর প্রমাণ আমাদের দেশে মেলে। মেলে এদেশে পুরুষ তথা গৃহস্বামীর আচরণে। স্বামী যে 'প্রভু'— প্রাচীন সভ্যতার এ আদি ধারণা সম্ভবত পুরুষের মস্তিষ্ক কোষে গেঁথে আছে।

আর রবীন্দ্রনাথও কেন জানি সনাতন সভ্যতার রীতিনীতি ও বিধানের প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে সংসারধর্ম প্রেম ও গৃহলক্ষ্মীতত্ত্বের ধারণা তাকে অভিভূত করে রেখেছিল। স্ত্রীধর্ম যে নারীর ব্যক্তিধর্ম অর্থাৎ তার নিজের প্রতি কর্তব্যপালন তথা সুবিচারের বাইরে নয় এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ভেবে দেখার কথা রবীন্দ্রনাথের মনে হয় নি। নারীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে তাকে বিপুল এক মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে, তাকে দেবীর মহিমায় উন্নীত করা হয়েছে এমন ধারণাই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই নারীর গৃহলক্ষ্মীরূপ ও কল্যাণী রূপের প্রশংসায় তিনি বরাবর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এমন বিশ্বাসের আলোয় নারীচরিত্র চিত্রণ তাঁর একাধিক উপন্যাসে দেখা যায়। একালের নারীবাদীদের কেউ কেউ তাই প্রশ্ন তুলতে পারেন : এ রবীন্দ্রনাথ সদর্থে কতটা আধুনিক, কতটা প্রগতিবাদী ?

রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার সঙ্গে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক না হলেও এমন সত্য অস্বীকার করা চলে না যে কাহিনীর শেষ অংকে পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ গোরাকে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান এবং সনাতন রীতিপ্রথার বিশ্বাস থেকে সরিয়ে আনতে পারেন নি। কাহিনী ও ঘটনা পরম্পরার ধারা ও সঙ্গতি বজায় রেখে তা সম্ভব ছিল না। সুচরিতার প্রেমও গোরার চিন্তাজগতে, মনোজগতে ঐ বিশেষ দিক বিচারে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত সে কারণেই গোরার মনোজগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার বিশ্বাসের মূল ছিন্ন করার জন্য তার অহিন্দু জন্মপরিচয় প্রকাশ করতে হয়েছে। ঘটনার স্বাভাবিক ধারায় গোরাকে সংস্কারহীন পরিপূর্ণ মুক্ত চেতনার আধুনিক মানুষে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। এটা গোরা চরিত্রের গঠনগত দুর্বলতা এবং সেই সঙ্গে শৈল্পিক দুর্বলতাও বটে।

তবে ঐ ঘটনার অর্থাৎ পরিচয় প্রকাশের ফলাফল ছিল ভয়ঙ্কর। মুহূর্তে গোরা বুঝতে পারে যে তার স্বাপ্নিক 'ভারতের সব মন্দিরের দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ এখন সে ব্রাহ্মণ নয়, হিন্দু নয়, সে ব্রাত্য। হিন্দু সমাজের চোখে সে পতিত।' বিষয়টা তার চোখে কিছু সত্যের উদ্ভাস ঘটিয়েছে তার পূর্ব-বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে যে ধর্মের পরিচয়ে মানুষের পরিচয় বড়ই সংকীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ। সেখানে মানবিক চেতনার সত্য প্রকাশ পায় না। ধর্মীয় সংকীর্ণতার সত্য তাহলে প্রকৃত সত্য নয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হবার পথ ধরেই তার ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। তাই এখন তার মধ্যে 'হিন্দু-মুসলমান খ্রিষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। সকলের জাতই তার জাত।'

এমন মানবিক বোধ নিয়ে গোরার পুনর্জন্ম। সে আর সমাজ বিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই বলেই পরেশ বাবুকে বলতে পেরেছে : 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না।' গোরার এ বোধ রবীন্দ্রনাথের বোধ। রবীন্দ্রনাথ এ বিশ্বজনীন মানবিক ভাবনার বাস্তবায়নই এরপর থেকে দেখতে চেয়েছেন, নিজেও চেষ্টা করেছেন এ সত্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে, যেমন তাঁর সৃষ্টিতে তেমনি তাঁর কর্মে।

সেক্যুলার চেতনা নিয়ে মানবহিতৈষণার চিন্তা তত্ত্ব হিসাবে আধুনিক মনের কাছে যত আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হোক বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অসহিষ্ণু রক্ষণশীলতা কিংবা সংকীর্ণতার উপস্থিতিতে এর বাস্তব অর্জন কতটা সম্ভব তা বিবেচনার বিষয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাল পেরিয়ে বর্তমান অতি আধুনিক কালেও এ প্রশ্নের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এ তো গেল গোরা ও রবীন্দ্রনাথের মানবিক জীবনভাবনার কথা— যা একালের আধুনিক মনেরও অন্বিষ্ট।

কিন্তু নব্য মানবিক ধর্মে দীক্ষিত গোরা সুচরিতার হাত ধরে (বা সুচরিতা গোরার হাত ধরে) তাদের প্রত্যাশিত পথপ্রদর্শক পরেশ বাবুর কাছে এগিয়ে যাওয়ার পর কি আমরা এমন বিশ্বাসে নিশ্চিত হতে পারি যে গোরা তথা রবীন্দ্রনাথের এ আধুনিকতার বোধ তাঁর নারী-ভাবনাকেও একই গুণগত মাত্রায় প্রভাবিত করবে, পরিবর্তিত করবে আধুনিকমনস্কতায়, পৌঁছে দেবে নারী-পুরুষের সমমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিমূল্যের মুক্ত অঙ্গনে? রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সৃষ্টিকর্মে নারীর অবস্থান থেকে এর প্রমাণ মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহী নারীব্যক্তিত্বের প্রতীক দামিনী

সাহিত্যপত্রিকা *সবুজপত্রে*র প্রকাশ (২৫ বৈশাখ, ১৩২১) সমকালীন বাংলা সাহিত্যের চত্বরে আধুনিক চেতনার যে জোয়ার এনে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সে জোয়ারে ভেসেছিলেন। অথবা এমনও বলা যায় ধীমান-সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীকে ঐ জোয়ার আনার ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেছিলেন। এমন ধারণা হয়তো অস্বাভাবিক নয় যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ রবীন্দ্রচৈতন্যের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পর্বান্তর যাত্রায় তথা পরিবর্তনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। প্রমাণ, 'সবুজপত্র' পর্বে রচিত এবং 'সবুজপত্র' বা অন্যত্র প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ('বলাকা' পর্বের) বা গল্প-উপন্যাসের চরিত্র-বদল। 'সবুজের অভিযান', 'ঝড়ের খেয়া' ও অন্যান্য কবিতা; 'স্ত্রীর পত্র', 'বোষ্টমী' বা অনুরূপ গল্প এবং 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে।

তাই ১৯১০ সালে 'গোরা' পর্বের (গোরা' উপন্যাস তার বিস্তার নিয়ে, গুণগত মর্যাদা নিয়ে নিজেই একটি পর্ব) শেষে 'বলাকা' পর্বের বলিষ্ঠ ও প্রাণময় কাব্যিক আবহাওয়ায় রচিত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কাহিনীর প্রাণশক্তি ও চরিত্রে বলিষ্ঠ পার্শ্বপরিবর্তন সুস্থ জঙ্গমতায় ভরপুর। আপাত বিচারে এতে নারীভাবনা-বিষয়ক পরিস্ফুট পরিবর্তন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এর প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে সমকালীন রচনা 'ঘরে বাইরে' (১৩২২ সালে *সবুজপত্রে*, ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) উপন্যাসের বিমলা চরিত্রে। 'গোরা' থেকে 'চতুরঙ্গ'— প্রায় অর্ধযুগব্যাপী এই সময়ের মধ্যে কি রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছিল! সনাতন চেতনার গৃহলক্ষ্মী নারী কি তার বহুবন্দিত কল্যাণী রূপের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ? 'চতুরঙ্গে'র দামিনী ও 'ঘরে বাইরে'র বিমলাকে কেন্দ্র করে যে-কাহিনী নির্মাণ ঐ দুইয়ের প্রেক্ষাপট অবশ্য ভিন্ন, ভিন্ন বক্তব্য, সিদ্ধান্ত ও চিন্তার সারাৎসারেও। তবু নারীর ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার মানসপ্রবণতার জন্যে শেষোক্ত কাহিনী ও বিমলা চরিত্র বিচারের দাবি রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বিধবা দামিনী বিদ্রোহী, জীবনরসে ভরপুর এক দীপ্তিময়ী নারী যার সঙ্গে অনেকটাই রয়েছে মিল 'চোখের বালি' উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনীর। তবে ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে, জীবন-অন্বেষার পরিণামে এবং আরো একাধিক দিক বিচারে এ দুই নায়িকার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। প্রভেদ কাহিনী-বিন্যাসে, প্রভেদ সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোর চিত্রণে এবং বিদ্রোহী নারীসত্তার প্রকাশে। কারণ ১৯০১-০২ সালের রবীন্দ্রনাথ আর ১৯১৪-১৫ সালের রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নন, যেমন সামাজিক-ধর্মতাত্ত্বিক চেতনা বিচারে তেমনি নারী-নারীত্ব বিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে। আর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তো বটেই।

উল্লিখিত সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রচেতনায় অনেকটা পালাবদল ঘটেছে। স্বদেশ-বিদেশ জুড়ে তখন বিস্তর রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের পালা। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকেও বিস্তর ঝড়-বাদলের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে। অবস্থার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্টতাও কম নয়। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন তাই নয়, প্রমত্ত জীবন তরী থেকে ঝড়ের খেয়াও তাকে বাইতে হয়েছে উত্তাল জলরাশিতে। এ যাত্রা তাই সহজ, সরল, সোজা ছিল না।

প্রাক-বিশ্বযুদ্ধকালের সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে ১৯১৪ সালে এসে যুক্ত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামার শব্দ ও আর্ত কোলাহল। এসব ঘটনা ও বিষয় সাহিত্যকে যেমন স্পর্শ করে তেমনি সাহিত্যস্রষ্টার মনোজগতেও পরিবর্তন ঘটায়, পুরনো বিশ্বাসের ভিত ভাঙে, নতুন বিশ্বাসের ভিত তৈরি হয়, প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে এ দিকবদলের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে, বা রক্ষণশীলতার ভিত বেশি শক্ত হলে পরিবর্তনে সময় লাগতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রচৈতন্য এ সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম ছিল না। বরং সেখানে কাল ও পরিবেশ প্রভাবে সাড়া জেগেছে বরাবর, সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের শিল্পীচেতনায় পর্বান্তরে নয়ামাত্রার প্রকাশ ঘটেছে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে চেতনার নয়া উত্তরণে রবীন্দ্রনাথ এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী প্রতিভা।

দুই

আর সেজন্যই পূর্বোক্ত বিনোদিনীর সঙ্গে দামিনীর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ বিস্তর। প্রভেদ যেমন আচরণের ক্ষেত্রে তেমনি দুজনের পরিণতিও একেবারে ভিন্ন। বিনোদিনী যেখানে লেখকের পরিচর্যায় ব্যক্তিত্বের অবশেষ-পরিচয়ে দীনতার প্রকাশ ঘটিয়ে পাঠক-সমালোচকের করুণার পাত্রী, দামিনী সেক্ষেত্রে তার জীবনাচরণে 'উত্তরে হাওয়া' বইয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। দুজনেই বিধবা, কিন্তু দামিনীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অধিক, তার ইচ্ছার জোর এত বেশি এবং এত সহজ স্বচ্ছন্দ চরিত্রের যে তা অনায়াসে প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করে যায়।

তাই যে-শচীশকে কাছে টানতে গিয়ে দামিনী হার মানে, তারই মতামতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ দামিনীকে লীলানন্দ স্বামীর ভক্ত পরিমণ্ডলে না-রাখার চিন্তার বিরুদ্ধে তার 'দুই চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন দপ করিয়া' জ্বলে ওঠে। সেই জ্বলন্ত চোখেই তার কথা : 'তোমাদের ভক্তরা এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে।' এমন কি শচীশ যখন বলে : 'আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক'... ইত্যাদি তখন দামিনীর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন : 'তোমরা ঠিক করিয়াছ ?' শচীশের উত্তর, 'হ্যাঁ', এবার দামিনীর ছোট্ট সাফ জবাব : 'আমি ঠিক করি নাই।' ব্যস ঐটুকুতেই তার কথা শেষ।

এরপর শচীশের দিক থেকে যখন প্রশ্ন উঠে : 'কেন, ইহাতে অসুবিধা কী ?' তখন দৃপ্তকণ্ঠে দামিনী জবাব দেয় : 'তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন— মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি ?' শচীশ কথা শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তার মুখে কথা নেই। দামিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে এবার সে হার মানে।

এমনকি দামিনীর কাছে হার মানে গুরুজি লীলানন্দ স্বামীও। হার মানে দামিনীর জেদের কাছেই নয়, তার যুক্তির প্রতাপের কাছে। তাই গুরুজি যখন ভক্তদের নিয়ে দূরযাত্রার প্রস্তুতি নেন দামিনীকে বাদ দিয়ে (পথে নারী বিবর্জিতা বলে কি ?) তখনো দামিনীর যুক্তি-তর্কের কাছে তাকে হার মানতে হয়, হার মেনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উচ্চারণ করতে হয়, 'মধুসূদন'। এমনকি দামিনীর হুকুমে শ্রীবিলাস তার পছন্দমতো কিছু আধুনিক বাংলা বই নিয়ে এলে গুরুজি সেগুলো জব্দ করে বালিশের নিচে রেখে দেন। এবার শুরু হয় গুরুজি ও দামিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের বাদ-প্রতিবাদী সংলাপ যা খুবই উপভোগ্য :

গুরুজি বলিলেন, মা, বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী : আপনি বুঝিবেন কী করিয়া ?

গুরুজির ভ্রূকুঞ্চিত : তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া ?

দামিনী : আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধহয় পড়েন নাই।

গুরুজি : তবে আর প্রয়োজন কী ?

দামিনী : আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই বুঝি কিছুতে প্রয়োজন নাই ?

গুরুজি : আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

দামিনী : আমি সন্ন্যাসিনী নই আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

এমনি কাটছাট সংক্ষিপ্ত কথার সহজ তীব্রতা গুরুজির সহ্য হয় না। তিনি বইগুলো নিঃশব্দে বের করে শ্রীবিলাসের দিকে ছুড়ে দেন। এই হলো দামিনী। দামিনী বাস্তবতার কঠিন ঠাঁই। অভিজ্ঞতাই তাকে কখনো নিজেকে আড়াল করতে, কখনো প্রকাশ করতে, কখনো পাথরের মতো কঠিন হতে শিখিয়েছে। এ দামিনীই শচীশকে নির্দ্বিধায় বলতে পারে : 'আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।' এরপর শচীশের স্তব্ধ হবার পালা।

শ্রীবিলাস তাই বলতে পেরেছে যে তাদের দুজনকে (শচীশ-শ্রীবিলাসকে) নিয়ে 'গুরুজির বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সাধনা মাটির পৃথিবীর টানে ভেঙে পড়ার জো।' তার ভাষায় 'এতদিন তিনি (গুরুজি) রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রইল না।' দেখা গেল বিদ্রোহী দামিনী ভাঙনের খেলায় কম যায় না, আবার জোড় লাগাতেও তার জুড়ি নেই।

আশ্চর্য, আধ্যাত্মিক সাধনা ও বৈষ্ণবীয় রসলীলা জমিয়ে তোলা থেকে সেসব ভাঙচুর করার শক্তিতে যে-দামিনীর তুলনা মেলে না, সে রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি; অথচ রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সাধনা, বৈষ্ণবীয় রস সাধনার বিরোধী ছিলেন না। এর চেয়েও বড় কথা তাঁর এই দামিনী সতীত্ব পত্নীত্ববোধের ক্ষেত্রে নির্বিকার, ওসব রক্ষণশীলতার দায় সে বহন করে না। এসব যুগলালিত ধারণা তাকে স্পর্শ করে না, তার জৈবনিক প্রয়োজনের বিষয়ই মাত্র তাকে স্পর্শ করে তা সেসব আত্মিক হোক বা জাগতিক ও ব্যবহারিক বিষয় হোক বা অনুভবের বিষয় হোক। দেহ নিয়ে, দেহের শুদ্ধতা বা পবিত্রতা নিয়ে তার মনে কোনো বিচার নেই। কথিত শুচিতার বাড়াবাড়ি সে বরাবর বর্জন করে এসেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ একদা এসব মেনেছেন।

অন্যদিকে বিধবা নারী দামিনী প্রেমের সার্থকতায় নিজেকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত, সেখানে কোনো আপোস নেই। গভীর তীব্রতার জ্বালা নিয়ে শচীশকে সে ভালোবাসে। তার ভালোবাসার পূর্ণ অধিকার পেতে চায় দামিনী। কিন্তু শচীশ— একদা-নাস্তিক জ্যাঠামশাইয়ের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধুতুল্য শচীশ গুরুজির কাছে এসে গভীর রসসাধনায় মগ্ন। এ পর্যায়ে আস্তিক শচীশ জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষায় নিজেকে তো বটেই যে-কোনো প্রিয় নারীকেও তার কাজে লাগাতে বা বিসর্জন দিতে পারে। তাই দামিনীর ব্যক্তিত্ব তার নাগাল পায় না। সে কেবলই দামিনীর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, তার স্পর্শ এড়ায়। কারণ তার মতে নারী তথা 'প্রকৃতি রস সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে পরম ব্যাঘাত'। তাই দামিনী তার ভাবের রাজত্বের সঙ্গী হতে পারে না। এসব ধারণাও কিন্তু রবীন্দ্রচৈতন্য থেকে উদ্ভূত।

শচীশের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদানে দামিনীর হার, কিন্তু সে হার অতিক্রম করে তার জয় তার প্রতি শ্রীবিলাসের ভালোবাসা আবিষ্কার করে তাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে এবং শ্রীবিলাসের তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে। দামিনী শচীশকে ঠিক বুঝতে পারে নি। আবার শচীশের চোখ ধাঁধানো ব্যক্তিত্বের আলোয় অন্ধ দামিনী তার পাশে-দাঁড়ানো ভালোবাসার মানুষটিকেও দেখতে পায় নি, বুঝতে পারে নি। বুঝতে পেরেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাখ্যানের আঘাত বুকে নিয়ে, গুহার অন্ধকারে শচীশের পদাঘাত বুকে নিয়ে ফেরারও অনেক পরে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দিকভ্রান্ত শচীশ, হালভাঙা নাবিকের মতো অধ্যাত্মপ্রেমী ও রসসাধনার রহস্যভেদে উন্মাদ শচীশ যে আত্মপ্রেমী এ সত্য বুঝতে দামিনীর অনেকটা সময় লেগেছে। এতদিনে তার আয়ু হাতের মুঠোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানেই দামিনীর জীবননাট্যের ট্রাজেডি, এখানে জীবনের জটিলতার কাছে দামিনীর হার।

এ ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথের তৈরি, তা কতটা শৈল্পিক পরিণামের তা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু জীবনে সর্বদা সময়ের দৈর্ঘ্য হারজিতের সীমানা নির্ধারণ করে না। জীবনের যতটা পরিসর তার মধ্যে তাকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার মূল্যেই ব্যক্তি ও জীবনের সার্থকতা। আর সে সার্থক প্রেমের উদ্ভাস বিধবা দামিনীর জীবনে সত্য হয়ে ওঠে যখন শচীশ সম্পর্কে তার মোহের অবসান ঘটে, আর তখনই সে প্রেমিক শ্রীবিলাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরেছে। এমনকি নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছে : 'আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।' শচীশ সম্পর্কে দামিনীর এ ধারণাই তাকে শ্রীবিলাসের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ শচীশের রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (ঊর্মিলা চক্রবর্তী) এমন ভাবা বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক হবে না। শচীশের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণই প্রবল মোহের মতো দামিনীর সব অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ঐ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে শ্রীবিলাসের মতো ধীমানও তার অনুগত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের যে-শিষ্য শচীশ ননীবালার দুর্দশায় অভিভূত হয়ে নিজ উদ্যোগে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব রেখেছিল সে-শচীশ আর লীলানন্দস্বামীর শিষ্য শচীশ এক ব্যক্তি নয়। ননীবালার ক্ষেত্রে ছিল উপকার করার ঝোঁক, হৃদয়ের উদারতা মেলে ধরার তাগিদ, কোনো প্রাণের তাগিদ নয়— প্রেমের তাগিদ যে সেখানে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তবে কাজটা ছিল সহজ।

কিন্তু দামিনীকে ও তার প্রেম স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে প্রয়োজন ছিল প্রাণের তাগিদ— সেটা দামিনীর বেলায় আবেগতপ্ত হয়ে তার প্রাণে দেখা দিতে পারে নি। তার আগেই শচীশের গোটা সত্তা দখল করে নিয়ে ছিল লীলানন্দস্বামী ও তার রসের সাধনা। সে রস দামিনী যোগান দিতে চায় নি, পুরোপুরি যোগান দিতে পারার কথাও নয়। এ সত্য শচীশের চেয়ে কে আর ভালো বুঝবে ? শচীশ নিজেই তার ডায়ারিতে দামিনী সম্পর্কে লিখেছিল : 'সে জীবনরসের রসিক। এমন প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু অধ্যাত্ম-প্রেমের লীলারসের সাধনা চলে না। কারণ সে অর্থাৎ দামিনী সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ'। এ রূঢ় সত্য বুঝতে সময় লাগার কারণেই দামিনীর জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাজেডি'র ছায়াপাত। তবু শেষপর্যন্ত সে যে এ সত্য বুঝতে পেরেছে সেটাই তার জন্য বড় কথা, আর সেটাই পাঠকের জন্য বড় স্বস্তি। স্বস্তি এ জন্য যে দামিনীর স্রষ্টা তার এ স্বল্পস্থায়ী জীবন তৃষ্ণার সার্থকতায় বাদ সাধেন নি। নারীত্ব চেতনা, দাম্পত্যপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা এখানে দামিনীর জন্য বাধা হয়ে ওঠে নি।

তবু রবীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে দামিনীর মুখ দিয়ে তাঁর নারীভাবনার পক্ষে কিছু কথা বলিয়ে নিয়েছেন। যেমন শচীশের স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে এক পর্যায়ে দামিনীর মতো স্বাধীনচেতা নারীও বলতে পেরেছে: 'আমি যে স্ত্রী জাত— ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।' কথাগুলো যতটা দামিনীর তার চেয়েও বেশি সেবাপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীতত্ত্বের উদ্ভাবক রবীন্দ্রনাথের। এ ট্র্যাডিশন পরবর্তী সাহিত্যে বিশেষত শরৎসাহিত্যে প্রবল।

এমনকি শচীশের মুখেও রবীন্দ্রনাথ তার নারীতত্ত্বের কিছু কথা, যেমন প্রকৃতি বিষয়ক কথা যা এর আগে গোরার মধ্যে দেখা গেছে, বসিয়ে দিয়েছেন। শচীশের মতে 'মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেই জন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই সমস্ত দূতগুলোকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।' এখানে সেই সনাতন পুরুষ-প্রকৃতির লীলা! কিন্তু দামিনীর এক কথায় শচীশের এসব তত্ত্ব গুরুজির সমর্থন সত্ত্বেও হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে। এখানে নারীত্ববাদী দামিনীর জয়।

এমন স্বাধীন সত্তার নারী দামিনীর পক্ষে রসতত্ত্ব নাকচ করে দিতে কষ্ট হবার কথা নয়। শচীশের উদ্দেশে তার বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ : 'তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ওছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম,... এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?' এসব কথার উপলক্ষ ছিল 'গুরুজির এক চেলার আত্মীয়' নবীনের প্রথমা স্ত্রীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার রসাত্মক ঘটনা। কিন্তু এ প্রসঙ্গেই দামিনীর মুখ থেকে আসল কথা বেরিয়ে এলো। কথাগুলো দামিনীর অন্তর-নিঙড়ানো অভিজ্ঞতার ফসল। শচীশের উদ্দেশে দামিনী তাই বলে :

> আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী কুৎসিৎ তার চেহারা সে তো দেখিলে।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না।... তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস— যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।

দামিনী চেয়েছিল শচীশের কাছে প্রেমের স্বীকৃতি, প্রেমের দীক্ষা। কিন্তু শচীশ যদিও দামিনীর কাতর আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে বলেছে, 'তাই হইবে'— কিন্তু ঐ দীক্ষা দেবার সাধ্য বা মনের অবস্থা তার ছিল না। তবু শেষপর্যন্ত শচীশ বুঝেছিল যে রসের আঙ্গিনা তাকে শান্তি দিতে পারবে না, সেজন্য অন্য পথের সন্ধান চাই। এ অন্বেষা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের আত্মচৈতন্যের অন্বেষা। শচীশ তাই শেষ পর্যায়ে এসে শ্রীবিলাসকে বলতে পেরেছে, অবশ্য লীলানন্দ স্বামীকে ছেড়ে আসার পর :

একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই।

জ্যাঠামশাইয়ের একদা-নাস্তিক শিষ্য শচীশ তাহলে কি রসের আধ্যাত্মিক সাধনার পালা শেষ করে সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিল ? কারণ এ আত্ম-সমালোচনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তো রবীন্দ্রনাথের। আসলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞানের ধীমান সাধক শচীশের চোখের আলোয় রবীন্দ্রনাথ বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। এজন্যই শচীশের মুখ দিয়ে তিনি মুক্তি ও বন্ধনের দর্শনতত্ত্বও প্রসঙ্গত হাজির করেছেন দামিনীর কাছে।

কিন্তু দামিনী বাস্তব চেতনার নারী, জীবন তাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে, সে শচীশের মতো ভাবের ফানুস নয়, বরং একদিক থেকে তার সঙ্গে শ্রীবিলাসের বাস্তববোধের অনেকটাই মিল। সেজন্যই শচীশের আবেগতাড়িত আহ্বান 'দামিনী, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও' শেষপর্যন্ত সে মেনে নিতে পেরেছে। দামিনী 'শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না,' বরং শচীশের ভাববাদী ঘোর তার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। কারণ এভাবে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আত্মঅন্বেষা সেখানে থই পায় না। এটা জীবনের বাস্তব সত্য।

এভাবেই শচীশ, একদা-নাস্তিক শচীশ তার আধ্যাত্মিক ভাববাদিতা নিয়ে দামিনীর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। দামিনী নানাভাবে চেষ্টা করেও তাকে ঐ ঘোরের মগ্নতা থেকে টেনে তুলতে পারে নি। তাই বন্ধনমোচন মেনে নেওয়ার উপলক্ষেই তার প্রতি শ্রীবিলাসের প্রেমের আন্তরিক উদ্ভাস দামিনীর অবশেষে চোখে পড়েছে যা এতকাল শচীশের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম আড়াল করে রেখেছিল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দামিনী বুঝতে পেরেছে যে শ্রীবিলাস মানুষ হিসেবে 'সাধারণের মধ্যে পড়ে না', তার স্থান অনেক উঁচুতে। এই মানবিক চেতনার পুরুষকেই অবশেষে দামিনী স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। বিধবা দামিনীর এ বিয়েতে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল আরো একটি শর্ত বা কাজ, আর তা হলো রসের কারবারি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মঅন্বেষায়-আত্মআবিষ্কারের ঘোরে মগ্ন গুরুপ্রতিম শচীশকে দিয়ে এ বিয়ের সম্প্রদান কাজ শেষ করা এবং এ অসম্ভবও দামিনী সম্ভব করে তুলেছিল।

বিধবা নারীর প্রেম-নির্ভর বিয়ে— বিনোদিনীর পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, দামিনীর বেলায় বাস্তবে রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তত এ একটি ক্ষেত্রে নারী সত্তা, প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক তাঁর দীর্ঘদিন-লালিত স্থির বিশ্বাসের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন, বিধবা নারীর প্রেম ও তার জীবনতৃষ্ণার স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেসবের মর্যাদাও রেখেছেন। তার অন্য কোনো উপন্যাসের নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে এমন অঘটন ঘটতে দেখা যায় না। প্রায় সমকালের রচনা 'ঘরে বাইরে'র জমিদারপত্নী বিমলার স্বামীর বন্ধুর প্রতি অনুরাগ ও প্রেম শেষপর্যন্ত চিহ্নিত হয় উগ্র আধুনিকতার বিভ্রান্তিকর আকর্ষণ হিসেবে এবং সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে নিখিলেশের আহত হওয়ার অঘটন কেন্দ্র করে বিমলার সতীত্ব ও পত্নীত্বমর্যাদা রক্ষা পায়। ঘরের বউ বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েও ঘরে ফিরে আসে। আর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিনায়ক সন্দীপকে স্থূলরুচির কামাসক্ত 'ভিলেন' হিসেবে এঁকে তুলতে হয়েছে। কিন্তু বিমলার চরিত্রে দামিনী-চরিত্রের দীপ্তি একটুও নেই। সেখানে আবেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

কিন্তু দামিনী প্রথম থেকেই গতানুগতিকতাবর্জিত ব্যক্তিত্বময়ী নারী, এমনকি গুরুভক্তির কাদায় নিমজ্জিত অমানুষ স্বামী শিবতোষ যখন বেঁচেছিল তখনো দামিনীর প্রতিবাদী চেতনা নিষ্প্রভ ছিল না। তার মধ্যে নারীর স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা যেমন প্রবল তেমনি সুস্পষ্ট তার দৃপ্তব্যক্তিত্ব। বিদ্যুতবিভার মতো আকর্ষণীয় তার ব্যক্তিত্বের রূপ। তার বিদ্রোহ ফানুসের মতো নয়, তা প্রকাশ পেয়েছে নারীর জীবনতৃষ্ণার প্রয়োজনে। স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে যেমন সোচ্চার তেমনি দৃঢ়চেতা গুরুজির অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এমনকি শ্রীবিলাসের মতো রসিক ধীমানকে সে ইচ্ছামতো ভাঙে ও গড়ে। একমাত্র শচীশের মতো ভাবরসে ভরপুর ব্যক্তিত্বকে সে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারে নি। এর কারণ শচীশের আধ্যাত্মিক সাধনার ঘোর। দামিনীর বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ লীলানন্দস্বামীর রসের সাধনায় প্রয়োজনমতো আঘাত করেছে, আবার সমাজ ও তার রক্ষণশীলতাকে সে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে চলার শক্তি অর্জন করেছে, এখানেই তার নারীত্বের সার্থকতা। ব্যক্তিজীবনেও এ নারীর আকাঙ্ক্ষা অংশত হলেও সফল হয়েছে। বিধবার প্রেম ও বিবাহ ঘর না বেঁধেও ব্যর্থ হয় নি।

তিন

সব দিক বিচারে *চতুরঙ্গ* উপন্যাস ও দামিনী চরিত্র (নারীত্বের প্রতিভূ হিসেবে) রবীন্দ্রনাথের হাতে এক অসামান্য সৃষ্টি। নারীত্ব-চেতনার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ সাহসী চরিত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসে ক্বচিৎ দেখা যায়। গল্পে আঁকা চরিত্রের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ্য সোহিনী ('ল্যাবরেটরি')। *তিন সঙ্গীর* আধুনিকারাও (১৩৪৬-৪৭) তাদের আড়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশক পূর্বে সৃষ্ট দামিনীর নাগাল পাবে না যেমন নারীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তেমনি নারীর দেহচেতনা, স্বামীসম্পর্ক, দাম্পত্যসম্পর্কের শুচিতা ইত্যাদি দিক থেকে দামিনীর রক্ষণশীলতা-বিরোধী মানসিক শক্তি, বাস্তবতাবোধ ও জীবনবোধের স্বাধীন প্রকাশের ক্ষেত্রে। অবশ্য এক্ষেত্রে সোহিনীর কথা আলাদা।

দামিনীর আগে ও পরে নারীচরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ তার নারীতত্ত্বের দুই বিপরীতকে মেলাতে (যদি সমন্বয়বাদিতাও বলা যায়) চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববিশ্বাস, প্রচলিত সামাজিক সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষ করে পতিভক্তি, সংসারসেবা ইত্যাদি সনাতন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। অত যে যত্নে গড়া কুমু চরিত্র তাও স্বামীগৃহ, মাতৃত্ব, পত্নীত্ব ইত্যাদি সনাতন বিশ্বাসে ভর করে 'ট্রাজিক আয়রনি'র শিকার হয়েছে। এ পরিণাম ছিল খুবই দুঃখবহ। কিন্তু এর দায় কাহিনী-পরম্পরার নয়, এ দায় রবীন্দ্রনাথের।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রপর্বের উপন্যাসে মূলত পুরুষশাসিত সমাজের উচ্চমন্যতার আলোকেই অধিকাংশ নারীচরিত্র সৃষ্টি। নারীর সংসারবদ্ধ গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণী রূপ এবং এর বাইরে অনাচারী অকল্যাণী রূপ নিয়ে চরিত্রগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে। কাহিনীও ঐ চরিত্রধর্মকেই অনুসরণ করেছে, কচিৎ যে ট্রাজেডির সৃষ্টি করেছে তাতে পাঠকের সহানুভূতি অর্জনের অবকাশ সামান্যই রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও ক্বচিৎ তার উপন্যাসে বা প্রবন্ধে নারীবিষয়ক ঐ দুই ধারণার বাইরে পা রেখেছেন। ব্যতিক্রম সামান্য।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের অসামান্য গুণময়তার মধ্যেও ননীবালার পরিণতি কতটা মানবিকতাজাত এবং কতটা ঔচিত্যবোধের প্রতীক তা নিয়ে পাঠককে ভাবতে হয়। এ উপন্যাসের মুখ্য নারী চরিত্র দামিনী ও গৌণ নারী চরিত্র ননীবালা পরোক্ষে হলেও, কিছুটা হলেও ঐ দুই নারীসত্তার প্রতীক। অবশ্য দামিনী একাই একশ'র প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। কিন্তু বিধবা ননীবালা, দুর্বলচিত্ত ও সনাতন-চেতনার প্রতীক ননীবালা প্রতারিত হয় বিবাহিত নষ্ট চরিত্রের পুরুষ পুরন্দরের স্তবে, প্রশংসায় ও প্রেমের ছলাকলায়। পরিণামে বিবাহ-হীন মাতৃত্বের দায়ে লাঞ্ছিত ননীবালা এক মৃত সন্তান প্রসব করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। শচীশের জ্যাঠামশায় তাকে আশ্রয় দিলেও তার সাধ্য কি ঐ সনাতন চেতনায় বিদ্ধ নারীকে বাঁচাবেন! পাষণ্ড পুরন্দরের (শচীশের দাদা) প্রতি তার প্রেমের ঘটনা অবশ্য প্রকাশ পায় তার মৃত্যুকালে জ্যাঠামশাইয়ের উদ্দেশে লেখা চিঠির বয়ানে : 'বাবা, পারিলাম না। তোমার কথা ভাবিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।' একেই বলে আত্মঘাতী সর্বনাশা প্রেম, যা সনাতন স্বামীভক্তির অচলা রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ননীবালার অহেতুক মৃত্যুতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহিত পুরন্দর যে অবৈধ যৌনসংসর্গের মাধ্যমে ননীবালাকে সমাজে অস্বীকৃত মাতৃত্বে পৌছে দিয়েছিল এবং তার ঐ পাপাচারে যে পিতা হরিমোহনের (শচীশেরও পিতা) নির্বিচার সমর্থন ছিল উপন্যাসের বয়ানে তা জানা যায়। জ্যাঠামশাইয়ের প্রতিবাদ ও ননীবালাকে আশ্রয় দেওয়ার পর সমাজ বরং নাস্তিক জগমোহনেরই বিরোধিতা করেছে কিন্তু পুরন্দর কিংবা তার পিতার অনাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নি। ওদের সামাজিক শাস্তি তো দূরের কথা। এমনটাই ছিল তখনকার সমাজবাস্তবতা। সমাজ বরাবর ছিল বিত্তবান ও শক্তিমান উচ্চবর্ণের মানুষের পক্ষে। আর যৌন অনাচার ও চরিত্রবিচ্যুতির সব দায় ঐ সমাজ বরাবর নারীর ওপরই চাপিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পুরুষকে অনাচারের দায় বহন করতে হয় নি। সমাজের এ চরিত্র একালে কতটা পালটেছে তা বাস্তবিকই বিচারের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে এ ধরনের অনাচার ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং ন্যায্যত নারীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। যেমন ননীবালার মৃত্যুর করুণ পটভূমি তিনি রচনা করেছেন, এমনকি জ্যাঠামশাই জগমোহনের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু ননীবালার সমস্যা-সঙ্কট সমাধানের ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা রাখতে পারেন নি। শচীশের ননীবালাকে বিয়ের অস্বাভাবিক প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েও ননীবালাকে স্বাভাবিক সন্তান-প্রসবের মাধ্যমে জগমোহনের আশ্রয়ে রেখে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। অনাচারী সমাজ ও সমাজপতিদের এক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়েছে। কিন্তু তা ভয়ে না বিস্ময়ে?

সমাজের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সর্বদা রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতে লৌহকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন নি তার ব্যাখ্যা মেলে তাঁর সমাজ প্রগতিবিষয়ক রচনাদির বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজ শাসকগণেরই নয়, সংস্কৃতি অঙ্গনের শক্তিমান ও রক্ষণশীল এলিটদের প্রবল বাধা ও অশালীন আচরণের তীব্রতার মধ্যে। রবীন্দ্রচরিত্র বিদূষণে এদের দাপট ছিল অবাক হয়ে লক্ষ করার মতো। ভাবতে পারা যায় কি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র'-এ নারীবিদ্রোহ প্রতিফলিত হবার অভিযোগে বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তি গল্প লিখে, চিত্তরঞ্জন দাসের মতো উদার রাজনীতিক পরোক্ষভাবে পত্রিকার মাধ্যম যুগিয়ে কী তীব্র রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন! প্রসঙ্গত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা সজনীকান্ত দাস প্রমুখের নাম উল্লেখ করা চলে। এদের পত্রিকাগুলো ছিল রবীন্দ্র বিদূষণের ঈর্ষাকালো উৎস।

এসব কারণে কি উপন্যাসের সর্বত্র প্রগতিবাদী তথা নারীত্ববাদী চরিত্রচিত্রণে কিংবা বেশ কিছু প্রবন্ধে নারীবিষয়ক বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সাহসী ভূমিকা নিতে পারেন নি? হতে পারে তখনকার সমাজবাস্তবতার চরিত্র ক্ষুণ্ন হবে ভেবে তিনি জোর কদমে এগিয়ে যান নি। তবে এমন সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না যে রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীচরিত্র চিত্রণে তাঁর নারীভাবনা-বিষয়ক বিশ্বাসের বা নিজস্ব তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করতে চান নি। এক্ষেত্রে প্রচলিত সনাতন রীতিপ্রথা এবং নারীত্বের আধুনিক চেতনার মধ্যে এক ধরনের আপোসরফার চেষ্টা যে তিনি করেছেন এমন কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে দুই বিপরীতের উপস্থিতি বা দ্বিচারিতা এবং ঘটনা-পরম্পরা, চরিত্র-পরিণতির সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজে না-লাগানোর প্রবণতা ও উদাহরণ থেকে এমন কথা মনে আসে। এমন অভিযোগ অনেকের।

এখানে নারীবাদী রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতার দিকটা স্পষ্ট। এজন্যই তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের মধ্যে অতি সামান্য ক'জনই কাহিনীর যথার্থ প্রেক্ষাপটে নারীত্বের পক্ষে, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে, অধিকাংশই গতানুগতিক পথ বেছে নিয়েছে, কিংবা সাময়িক বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে গিয়ে আপোসবাদিতার প্রমাণ দিয়েছে। প্রধানত তাঁর উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এ প্রবণতা ধরা পড়বে।

কিন্তু সত্যদ্রষ্টা কথাশিল্পীর দায়িত্ব তো সমাজ-বাস্তবতা ক্ষুণ্ন না করেও সমকালীন প্রচলিত ধারণা থেকে দু'কদম এগিয়ে সমাজের প্রতি, ব্যক্তির প্রতি মানবিক চেতনার দিকনির্দেশ তুলে ধরা যা ভবিষ্যৎ সমাজকে, ব্যক্তিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কারণ যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এক ধরনের 'দোলাচলচিত্ততার' শিকার— এমন অভিযোগও কয়েকজন নারী ও পুরুষ লেখকের সংশ্লিষ্ট রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত সাহিত্যিকের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের পটভূমিতে যদি রবীন্দ্রভাবনার সন্ধান নিতে হয় তাহলে এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রভাবনায় নিরপেক্ষতার দিকটাতে অধিক ভার লক্ষ করার মতো। যে জন্য এ প্রসঙ্গে টলস্টয়ের মতামতের সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তা যে মেলে না সে তথ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই জানা যায়।

এছাড়াও নারী যে পুরুষের ভোগের সামগ্রী ও কামনার ধন এমন বিশ্বাস এবং অন্যদিকে তার সেবাপরায়ণা গৃহলক্ষ্মী ও নিবেদিতপ্রাণ মাতৃমূর্তিতে দেবিত্ব আরোপ— এই উভয় রূপের যে 'মিথ' সনাতন কাল থেকে একাল পর্যন্ত রচিত হয়েছে তাতে সাহিত্যশিল্পী ও বুদ্ধিজীবী ধীমানদের অবদান মোটেই কম নয়। সাধারণ বুদ্ধির নারীর পক্ষে সত্যই বোধগম্য হওয়ার কথা নয় যে এসবের উদ্দেশ্য নারীকে ব্যক্তিসত্তার আধার হিসেবে মর্যাদা দেওয়া নয় বরং তাকে শোষণ করা এবং অসচেতনতার সুযোগে ব্যক্তিস্বার্থে তাকে নিঙড়ে নিয়ে শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট ছোবড়া আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা পুরুষশাসিত সমাজের অবদান এবং সমাজের পৌরুষ শক্তির প্রকাশ বই কিছু নয়। আর সেজন্যই সমাজে, সাহিত্যে এমন উদাহরণ বিস্তর যেখানে পুরুষের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে কদাচিৎ বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু একই কারণে নারী অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি পায় না। আর সে শাস্তির রূপ বড় ভয়ঙ্কর। 'চতুরঙ্গ'-এর চরিত্র ননীবালার উদ্ধৃত প্রসঙ্গ অতিসাধারণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য। বাস্তবে কী সমাজপতি কী বুদ্ধিজীবী বা সাহিত্যিক এদের অর্থাৎ কথিত অনাচারী নারীর পরিণাম সম্পর্কে বড় নির্মম মনোভঙ্গি প্রকাশ করে থাকে। প্রসঙ্গত 'বিচারক' গল্পটি স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় বা তার উপন্যাসে নারীচরিত্র চিত্রণে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ নারীসত্তার প্রতি মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। নারী-নির্যাতনের করুণ আলেখ্য তাঁর নারীচিত্রণে বাস্তব রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে। বিদ্রোহী নারী বা প্রতিবাদী নারীর বিস্ফোরক চরিত্র যথেষ্ট সংখ্যায় চিত্রিত না হলেও সমাজে তাদের অবহেলিত, নিপীড়িত ও শোষিত রূপের চিত্রণ প্রায়শ দেখা যায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনা নারীর দুঃখ-বেদনার অংশীদার হয়েছে। এমন উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মে এমনকি উপন্যাসেও বিরল নয়। ছোটগল্পে ঐ প্রকাশ সর্বাধিক।

তবে সার্বিক বিচারে রবীন্দ্রউপন্যাসে নারীচরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে নারীবাদী লেখক-লেখিকাদের অভিযোগ বিবেচনায় আনতে গিয়ে বলা চলে, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনী চরিত্র সৃষ্টি ও তার পরিণাম রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীভাবনা বিষয়ক উল্লিখিত দোলাচলচিত্ততা, স্ববিরোধিতা বা দ্বিচারিতা কিংবা রক্ষণশীল পিছুটানের জবাব দিয়েছেন। এমনকি বলা চলে যে তিনি ঐসব অভিযোগের দায় থেকে এক্ষেত্রে মুক্ত হতে পেরেছেন। অবশ্য ঐ অভিযোগের জবাব আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা একাধিক ছোটগল্পে ও কবিতায় এবং বেশ কিছু প্রবন্ধে।

তবে নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ রূপায়ণে, তার যৌনতাবোধের (দেহবিষয়ক) স্বাধীনতা, স্বামী-স্ত্রীর সমতাভিত্তিক স্বাভাবিক সম্পর্ক (অবশ্যই দাম্পত্যসম্পর্ক) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশে এবং অনুরূপ মূল্যবোধের প্রতিফলনে দামিনী এক সম্পূর্ণ নারীচরিত্র। সে অবশ্যই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্ট 'অর্ধেক মানবী ও অর্ধেক কল্পনা' নয়। অন্যদিকে স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার বাস্তবতা বিচারে দামিনী রক্তমাংসের সজীব প্রতিমূর্তি এবং পরিপূর্ণ জীবনবোধ ও প্রাণসত্তার প্রতীক এক নারী। সে বিধবা হয়েও সমাজের কাছে এক কানাকড়ি ভিক্ষা গ্রহণের বিরোধী, সমাজকে রীতিমতো উপেক্ষা ও অবহেলা করে সে নিজের চলার পথ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের যত্নলালিত একাধিক নারীচরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে গেলেও দামিনীর চরিত্রের অসাধারণত্ব চোখে পড়ে। বাস্তবিকই সে অন্য সবার থেকে ভিন্ন। তাই সে 'শেষের কবিতা'র রোমান্টিক, ভাববিলাসী, সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা লাবণ্য নয়, এমন কি নয় নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধে আক্রান্ত বহির্মুখী চেতনার টানে দিগভ্রান্ত নায়িকা অভিজাত সংসারের গৃহবধূ বিমলা। কিংবা নয় ভাবের ঘোরে চালিত দুর্বলচিত্ত, অসহায়, নম্রস্বভাব অভিজাত পরিবারের কন্যা এবং বিত্তবেসাতির টানে স্থূল রুচিসম্পন্ন কামুক স্বামীর রমণী-পত্নী কুমুদিনী, যে তার অনাচারী লম্পট স্বামীর জবরদস্তির বিরোধী হয়েও শুধু মাতৃত্বের 'মিথ' বা দোহাই মেনে ঐ স্বামীর লালসা-সিক্ত শয়নকক্ষের অন্ধকারে ফিরে যায়। যায় তার ব্যক্তিত্ববোধ ও নারীত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে।

এদের সঙ্গে তুলনায়, আগেই বলা হয়েছে, দামিনী শুধু প্রতিবাদী চেতনার বিদ্রোহী নারীই নয়, সে নানামাত্রায় এক মুক্তমনের নারী। অন্য কারো কারো মতো দুর্বলচিত্ত নয় বলেই সামাজিক সংস্কার ও প্রচলিত রীতিপ্রথার জীর্ণ রক্ষণশীলতার অনুসারী সে নয়, ধারক-বাহকও নয়। অভিজ্ঞতা দিয়ে সে যা বোঝে বা বুঝেছে তাই তার পথ চলার পুঁজি, সৎসাহস নিয়ে সেই দিকনিশানার কথা সে অনায়াসে প্রকাশ করে। তার বিশ্বাসের সঙ্গে আপোস করতে রাজি নয় বলেই শচীশের ভাষায় 'যে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সার খাজনা দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়া আছে'। এই হলো রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট দামিনী। একটি সাহসী, বলিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত, স্বাতন্ত্র্যবাদী নারী-চরিত্র।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দামিনী-শ্রীবিলাসের সর্বশেষ সম্পর্ক ও দামিনীর শেষ মুহূর্তের কিছু মন্তব্য শুনে অবাক হতে হয়। অবশ্য স্বীকার্য যে অদ্ভুত স্বভাবের শচীশ ভাবের ঘোরে আধ্যাত্মিক সাধনায় রস সন্ধানের মগ্নতার জের হিসেবে ব্যক্তিত্বময়ী ও আকর্ষণীয় দামিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে নারীত্বের প্রতি যে-অবমাননা ছুড়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষতিপূরণ করেন শচীশেরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর প্রেমঘটিত মিলন ঘটিয়ে তথা বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ করে। বিয়ের প্রস্তাব যে এসেছিল শ্রীবিলাসের দিক থেকে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। দামিনীর প্রত্যাখ্যাত নারীত্ব মুক্তি পায় গ্লানি ও লজ্জার হাত থেকে। সন্দেহ নেই দামিনী তার নারীত্বের মূল্য ফিরে পেয়েছে এই প্রেম নিবেদন ও বিয়ের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু অবাক হতে হয় দামিনীর শেষ মুহূর্তের হীনম্মন্যতামূলক আচরণে যখন সে মৃত্যুর কিছু আগে শচীশের অজান্তে দেওয়া পদাঘাতে সৃষ্ট বুকের ব্যথা প্রসঙ্গে বলে : 'এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি' কিংবা বলে 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই' তখন কি মনে হয় না যে প্রথম বক্তব্যে রয়েছে নারী হিসেবে দীনতা বোধের স্পর্শ, যেন পুরুষ সর্বদাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতার উচ্চমঞ্চে আসীন। আর দ্বিতীয় মন্তব্যে দামিনীকে লেখক অধ্যাত্মবাদী চেতনার অঙ্গনে এনে তুলেছেন যা দামিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় না। এ সংস্কারবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা দামিনীর নয়, রবীন্দ্রনাথের। বিদ্রোহী দামিনীর চরিত্রে শেষমুহূর্তে কয়েক বিন্দু সংস্কারের ছিটে না দিলেই সম্ভবত ভালো হতো এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এ নারীচরিত্রটি অতুলনীয় বৈভব নিয়ে সবার জন্য গর্বের কারণ হতে পারত, এমনকি একালের নারীবাদী প্রবক্তাদের কাছেও। 'স্ত্রীর পত্র'গল্পেও শেষমুহূর্তে ভক্তিবাদের চোরাবালি তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ যেজন্য বিদ্রোহী মৃণাল আর বিদ্রোহী থাকে না। ভক্তিবাদ বা সংস্কারের পিছুটানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ কী আশ্চর্য 'অবসেসন'!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ঘরে বাইরে’
দাম্পত্যসম্বন্ধের পটভূমিতে সতীত্ব-নারীত্বের দ্বন্দ্ব

সমাজের শক্তি প্রবল, সমষ্টির শক্তি হিসাবেই সে প্রবলতার প্রকাশ। তবু তার সীমা অন্তহীন নয়, কিন্তু হৃদয়ের সে সীমাবদ্ধতা নেই। তার বিচরণের শক্তি ও বিস্তার অনেক অনেক বেশি। সে প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় অনায়াসে সমাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, শক্তিতে তাকে পরাস্ত করতে পারে। ‘চতুরঙ্গ’-এর দামিনী আপন অন্তরের তেজে সামাজিক বিধিবিধানের শক্তি জয় করে ইচ্ছামতো পথ চলেছে আপন হৃদয়বৃত্তির নির্দেশে। সেখানে সে আপোস করে নি। সে মুক্তি খুঁজেছে আলোয় আলোয়, যে-আলোর উদ্ভাস প্রেমের সার্থকলোকে।

দামিনীর আত্মঅন্বেষা ছিল সার্থক প্রেমের অন্বেষা— সেই সূত্রে জীবনের সত্যকে হাতের মুঠোয় এনে চিনে নেওয়ার সাধনা। এর জন্যই সে আর সব কিছু হারাতে প্রস্তুত ছিল। এমন কি জীবনকেও, যে-জীবন তার প্রেম-তৃষ্ণার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ‘চতুরঙ্গ’ থেকে সময় বিচারে খুব দূরে নয় পরবর্তী উপন্যাস ‘ঘরে বাইরে’র ধারাবাহিক প্রকাশ (১৩২২, সবুজপত্র, পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। এর জটিলতা কাহিনীতে নয়, চরিত্রচিত্রণে, তবে তা ‘চতুরঙ্গে’র নায়ক-নায়িকার মতো নয়, এর প্রেক্ষাপটও ভিন্ন।

আশ্চর্য, ‘চতুরঙ্গ’ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে যে প্রতিকূলতা ও আলোড়ন তোলার কথা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আন্দোলন তৈরি করেছিল ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের প্রকাশ। এর কারণ সাধারণভাবে সমাজের হাত বাড়ানোর শক্তি ও পরিধি যতটা তা অনেক বেশি গুণ হয়ে দেখা দেয় যখন রাষ্ট্র-রাজনীতির উপকরণ বিষয়বস্তুতে যুক্ত হয়। ‘ঘরে বাইরে’-র কাহিনীতে বিষয়বস্তুতে শুধু ব্যক্তি, দাম্পত্যজীবন ও সমাজ-সংসারই নয়, রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে সমকালের উদ্বেল রাজনীতি তার সম্প্রদায়চেতনা নিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছিল। দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিচেতনার প্রেক্ষাপটে রাজনীতির উদ্বেল চরিত্র অনুধাবন এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়, বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, বিলেতি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি উপলক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গোরা'য় যা ছিল মূলত ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি নিয়ে বিচার, 'চতুরঙ্গে' তা সীমাবদ্ধ ছিল ব্যক্তি-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্রণে যদিও ধর্মীয় সমাজ ছিল এর প্রেক্ষাপটে, আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিচার্য বিষয় হিসাবে ঐ দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংঘাতবহুল রাজনীতির উত্তাপ-উত্তেজনা। হয়তো তাই সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল যথেষ্ট বিস্তার ও তীব্রতা নিয়ে। রবীন্দ্ররচনাবলীর 'গ্রন্থপরিচয়'-এ তাই লেখা হয়েছে 'উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল তখনই ইহার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু সমালোচনা ও চিঠির লিখিত জবাব দেন যা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। আরো চমৎকার যে ঐ সমালোচনায় মহিলারাও অংশ নিয়েছিলেন। সমালোচনার এ ধারা 'ঘরে বাইরে' গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের পরও বন্ধ হয় নি। তাই শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্য বিচার' শিরোনামে প্রবন্ধও লেখেন।

সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। যেমন 'সাহিত্যবিচার স্মৃতি-শাস্ত্র বিচারের অঙ্গ নয়। আর নায়িকা চরিত্রে কতটা হিন্দুরমণীত্ব রয়েছে তার হিসাবনিকাশ করে উপন্যাস লেখার দায় লেখকের নয়।' এ বিষয়ে সমালোচক-লেখিকার প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও লেখেন : 'প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সর্বত্রই মানবচরিত্র কি মনুসংহিতার বশে মেনে চলে ? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না ?' না পড়লে বলতে হয় 'তারা সংহিতার কলের পুতুল।'

মানুষ সত্যই শাস্ত্রসম্মত 'কলের পুতুল' নয়, আর নয় বলেই সে যেমন ঘটনা ঘটায় তেমনি তার ফল ভোগও করে। রবীন্দ্রনাথও তাই যুক্তি হিসাবে এমন কথাই বলেছেন যে, 'মানব প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করবার একটা বেগ আছে।' কথাটা যেমন কথিত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সঙ্গে জড়িত, তেমনি সমান্তরাল আধুনিক অস্তিত্ববাদী ভাবনার সঙ্গে। এমন কি এমন দর্শনচিন্তার সঙ্গেও পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-ভাবনার কিছুটা মিল লক্ষণীয় যে মানুষ তার অন্তরে নিহিত প্রকৃতির টানে কখনো বিনাশের কখনো অঘটনের দিকে ছুটে চলে। আলবেয়ার ক্যামুর কোনো কোনো গল্পের নায়ক অজ্ঞাত বা দুর্বোধ্য কারণে (সম্ভবত আত্মচেতনার টানে) উল্লিখিত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। এ মানসিকতার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন।

দুই

'ঘরে বাইরে' রচনাকালেও দেশের সমাজ এমনিই এক রক্ষণশীলতার বৃত্তে বাঁধা ছিল যে সাহিত্যে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে শাস্ত্রসম্মত বিধিবিধান অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করা রীতিমতো বিপজ্জনকই ছিল, প্রতিক্রিয়ার রূপ ছিল ভয়াবহ। তা সত্ত্বেও রক্ষণশীল স্বদেশী সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হাসিকান্না' অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম নেয়, বিশেষ করে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে তারই ট্রাজিক বা 'ট্রাজি-কমেডিক' রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছেন নারীর ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ানোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিক বা সামাজিক স্তরে বিপজ্জনক হতে পারে কিনা বা কতটা হতে পারে।

সে কারণেই উপন্যাসের নাম 'ঘরে বাইরে' এবং লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেই ত্রিভুজের অন্যতম নায়ক নিখিলেশ (গোরার মতোই রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র) স্ত্রী বিমলাকে ঘরের চৌখুপি থেকে বাইরে এনে বহুজনার মধ্য থেকে তাকে এবং তার ভালোবাসা পেতে চেয়েছে। কারণ ঘরে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নারী, সাত পাকে শাস্ত্রীয় বিধানে বাঁধা স্ত্রী নিয়মতান্ত্রিকতার অধীন। সেটা একধরনের সত্য। কিন্তু ঘরের বাইরে মুক্ত পরিবেশের স্বাধীনতায় স্ত্রীকে প্রেমের যথার্থ প্রতিফলনে পাওয়ার মধ্যেই ভালোবাসার সত্যকে পাওয়া যায়। নিখিলেশের ভাষায় 'আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই।... সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।' কারণ জবরদস্তির অধিকার বা ভালোবাসায় নিখিলেশের বিশ্বাস ছিল না।

এ দিক থেকে নিখিলেশ আধুনিক চিন্তার মানুষ যদিও শ্রেণীবিচারে সামন্ত-পরিবারের মানুষ, জীবিকার বিচারে জমিদার (এদিক থেকে এবং জীবনসত্যের বিশ্বাসে নিখিলেশ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি)। বিধিবদ্ধ বিশ্বাসের চেয়ে মানবিক চেতনাই তার জীবনযাপনের আদর্শ যেমন ব্যক্তিক বিচারে তেমনি সমষ্টিগত বিচারে। সে জন্যই নিখিলেশ সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বন্ধনে স্ত্রীকে বাঁধতে চায় না তেমনি চায় না আদর্শের বা 'আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে'। ভালোবাসার মুক্ত আলোতে সে স্ত্রীকে কাছে পেতে চায়, 'সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করার জবর্দস্তির' মধ্য দিয়ে নয়।

এটাও এক ধরনের পরীক্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, বৃহত্তর অর্থে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আসলে নিখিলেশ-চরিত্রের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্র এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম। প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও প্রেমের ত্রিভুজ বা নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষার চেষ্টা চলেছে 'চোখের বালি' উপন্যাসে মহেন্দ্র, বিহারী ও বিনোদিনীকে নিয়ে; মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে, যেখানে শাস্ত্রীয় বিধিবিধানসহ সমাজ রয়েছে পেছনে।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন যে, আধুনিক কালে গল্প বলার (উপন্যাস বা ছোটগল্প) ক্ষেত্রে ঘটনা-পরম্পরার চেয়ে মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাত বিশ্লেষণ ('আঁতের কথা বের করে দেখানো') এবং এর অবশেষ পরিণাম এঁকে তোলাই শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 'চোখের বালি'তে তাই যেমন শাশুড়ি ও পুত্রবধূ সম্পর্ক নিয়ে, প্রথমোক্তের নবাগতার প্রতি ঈর্ষার বিষয়টি গৌণ ঘটনা হলেও তাৎপর্যময় ঘটনা হিসাবে চরিত্রগুলোকে প্রভাবিত করেছে, তার চেয়েও প্রভাবিত করেছে বিধবার প্রেম পূর্বোক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিভুজের ফ্রেমে। সেখানে বিধবার প্রেম পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নির্বাসনে গেছে। সতী গৃহলক্ষ্মীর জয় হয়েছে স্বামী ও ঘর-সংসারের অধিকার ফিরে পেয়ে।

আর 'নৌকাডুবি'তে তো লেখক নিজেই বলেছেন 'স্বামী-সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে স্ত্রীর মনে যে সংস্কার ঐতিহ্য হিসাবে বিরাজমান তার সঙ্গে অন্যপুরুষের প্রতি প্রেম অথবা সাময়িক কোনো বন্ধনের সংঘাতে কে জয়ী হতে পারে— বন্ধন না সংস্কার ?' এ দুইয়ের সম্পর্ক নিয়ে মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট ঘটন-অঘটন বা পরিণাম উপন্যাসের চমৎকার বিষয় হতে পারে। 'নৌকাডুবি' সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম। এখানে ঐতিহ্যনির্ভর সংস্কারেরই জয়। জয় সামাজিক বিধিবিধানের এবং শাস্ত্র-নির্ধারিত ধারণা-বিশ্বাসের। জয় নায়িকা কমলার, রমেশের নয়।

এখানেও সতীসাধ্বী নারীর আদর্শ সামনে ধরে রাখা হয়েছে সূত্র হিসাবে, যেমন পূর্বোক্ত উপন্যাসে। এবং যথারীতি সতীত্বের বা পত্নীত্বের পরীক্ষায় গৃহলক্ষ্মী-কল্যাণী নারীর সতীত্বের এবং ঘর-সংসারের শুচিতা-শুদ্ধতার জয় ঘোষিত হয়েছে। হিন্দু সমাজে এই সূত্র এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয় যা বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান কথাশিল্পী সবাই কম-বেশি ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরৎচন্দ্র সবাই তাদের উপন্যাসে এ ধারণার সত্যাসত্য বা বাস্তবতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ফলাফল বা পরিণাম সব ক্ষেত্রে এক না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নারীর সতীত্ব-পত্নীত্ব বিষয়ক নারীত্বের এবং ঘর-সংসারের রক্ষক গৃহলক্ষ্মী নারীর পক্ষে গেছে, ব্যতিক্রমের সংখ্যা তুলনায় যথেষ্ট কম।

'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' রচনার পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানসজগতে ঐতিহ্যবাহী সনাতন সভ্যতার রীতিনীতিপ্রথা এবং শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ও সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রতি আকর্ষণের বিষয়টি বহুল-আলোচিত। হয়তো তাই ঘটনা-পরিণাম ও চরিত্রগঠনে ঐ প্রভাব কাজ করেছে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে বাইরে' রচনার পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে 'গোরা' রচনার কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐসব রক্ষণশীলতার বন্ধন থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে চেষ্টা করেন।

তা সত্ত্বেও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চরিত্র বিন্যাসে ঐ পূর্বোক্ত সতীত্ব ধারণা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। শুরুতে বিমলার কাজে কর্মে, স্বামী-সংসারের প্রতি ধ্যান-ধারণায় এর প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ সংস্কারের তলানি তখনো লেখকের মনে থেকে গেছে। না হলে শুরুতেই জমিদার বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর বিমলার স্বগতোক্তিতে সতীত্ব ধারণার প্রকাশ ঘটবে কেন বা ঘটার দরকারই বা কী ছিল যেখানে স্বামী শিক্ষিত জমিদার হয়েও আধুনিক রুচির মানুষ, সামন্তরুচির স্থূলতা থেকে যার মন মুক্ত। এমন বক্তব্য বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়িকার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

তবু বিমলা আত্মগতভাবে তার সতীসাধ্বী মায়ের কথা, 'সিঁথের সিঁদুর' ও ঐতিহ্যবাহী 'লাল পেড়ে শাড়ি'র প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে— 'সুন্দরী তো নই কিন্তু মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম।... বিবাহের সম্বন্ধ হওয়ার সময়... দৈবজ্ঞ এসে হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে।' এমন কি স্বামী সম্পর্কে বিমলার ভক্তিবাদী আচরণেও ছিল ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীলতা ('ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হতো আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল'— বিমলার কথা) যা নিয়ে নিখিলেশের ছিল অস্বস্তি। আর বিমলার ভাবনা— নারীর হৃদয়ের ভালোবাসা পূজা করতে অভ্যস্ত।

এসবের পেছনে রবীন্দ্রচিত্তের সনাতন ধারণা কাজ করেছে নাকি উপন্যাস কাহিনীতে বৈপরীত্যের টানে বা অবশেষ পরিণামে সতীত্ব ও ঘরসংসার রক্ষার ইঙ্গিত ও অর্থময়তার প্রতীকী টানে রবীন্দ্রনাথের হাতে এ ধরনের শৈল্পিক তুলির টান ? কারণ বিমলা তো অঘটন-ঘটনের দুর্বিপাক সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত সতীত্ব রক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, উত্তীর্ণ প্রেমের বিজয় নিশ্চিত করে। সেক্ষেত্রে নিখিলেশের জীবন-মৃত্যু কোনো নির্ধারক বিষয় নয়। তবে সে প্রেম কতটা রাহুর প্রভাবমুক্ত তা বিচার্য বিষয়।

অথচ রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চেতনা মনস্তাত্ত্বিক চরিত্ররচনার তাগিদে অনায়াসে পূর্বোক্ত অন্তর প্রবৃত্তির রহস্যময় যাত্রার সূত্রটি ব্যবহার করেই নারী-পুরুষ সম্পর্ক, প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পরিণাম রচনা করতে পারতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকটাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার কথা ভাবেন নি। চিরাচরিত নারীত্ব-সতীত্ব ধারণার প্রেক্ষাপটে প্রেমের সংঘাত ও পরিণাম যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন। সে উদ্দেশ্যেই গঠিত প্রেমের ত্রিভুজ।

সেজন্য দুই নায়কের মধ্যে আদর্শের সংঘাত (রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে— 'Clash of ideals or value', 'প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের মধ্যকার দ্বন্দ্ব') মূল 'থিম' হিসাবে পরিবেশিত— চারপাশে চরিত্রগুলোর আবর্তন। তবে এক্ষেত্রে সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ ও আধুনিক ইউরোপের রেনেসাঁসীয় মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের চেয়ে ব্যক্তিত্বের সংঘাতই বড়, বড় দুই নায়কের নিজস্ব মতাদর্শের সংঘাত। কারণ সন্দীপ স্বদেশী রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারক, তার আধুনিকতা সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি। সেদিক থেকে সন্দীপ প্রকৃত অর্থে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রতিনিধিত্ব করে না যদিও সেখানকার নারী স্বাধীনতা এবং প্রেম ও যৌনতাবিষয়ক স্বাধীনতার বিষয়টি পরোক্ষভাবে তার বক্তব্যে এসেছে।

অন্যদিকে নিখিলেশকে সনাতন সংস্কৃতির ধারকবাহক বলা চলে না। একদিকে তার বিশ্বাসে ব্যক্তিত্বের মুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে যে জন্য স্ত্রী বিমলাকে ঘরে পরিপূর্ণভাবে ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে পাওয়ার পরও সে-পাওয়া তার চোখে পরম নয়। স্ত্রীকে বাইরের জগতের মুক্ত পটভূমিতে স্ত্রীর নিজস্ব প্রেরণায় উদ্ভূত ভালোবাসার অধিকার অর্জনে তার বিশ্বাস ও আগ্রহ। এদিক থেকে নিখিলেশ ব্যক্তিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মুক্ত ধ্যানধারণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসারী। একই কারণে সামন্তবাদী মূল্যবোধ স্ত্রীর ওপর চাপাতে নিখিলেশ অনিচ্ছুক, এমন কি ইচ্ছুক নয় সনাতন মূল্যবোধের অনুসরণে স্ত্রীর প্রেমপূজা বা স্বামীর পদধূলি গ্রহণের মতো প্রাচীন প্রথার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে।

নিখিলেশ তাই পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিরোধী নয়, বরং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আধুনিকতার যুক্তিবাদী প্রকাশ ঘটাতে আগ্রহী। কিন্তু সন্দীপের মতো সে 'স্থূল রুচি বা লালসায় আসক্ত' নয়। তার মতে 'প্রবৃত্তি তখনই সত্য যখন তার মধ্যে নিবৃত্তির সত্যও উপস্থিত থাকে।' এমন ধারণায় শুদ্ধ চিন্তার প্রকাশ ঘটলেও সনাতন রক্ষণশীলতা প্রকাশ পায় না। বরং প্রকাশ পায় আবেগের চেয়ে যুক্তিবাদিতার অধিকতর প্রভাব। আর এ জন্যই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো নিখিলেশ স্বদেশপ্রেম সত্ত্বেও বিদেশী কাপড় পোড়ানোর যুক্তিহীন উন্মাদনায় যোগ দিতে রাজি নয়। আশ্চর্য যে প্রজাহিতৈষণার আদর্শে জমিদারি পরিচালনা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবেগ-উত্তেজনার পরিবর্তে যুক্তিবাদী পথের অনুসরণে রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শ পুরোপুরি নিখিলেশের মধ্যে পরিস্ফুট। সম্ভবত এ কারণেই 'ঘরে বাইরে' নিয়ে সমাজে কোলাহল এত তীব্র হয়ে উঠেছিল। এবং তা সামাজিক রীতিপ্রথা ও রাজনীতির তাত্ত্বিক ধারণার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর অমিলের কারণে।

তাই বলতে হয় সনাতনী ধ্যানধারণা নয়, আধুনিকতার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েই নিখিলেশ স্ত্রী বিমলাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছে এবং ঘটনাক্রমে বন্ধু সন্দীপের সঙ্গে বিমলার মেলামেশার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিষয়টা আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে মেলামেশার উপলক্ষ ছিল সন্দীপের উগ্র স্বদেশী রাজনীতি। সন্দীপ সুবক্তা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে দেশসেবা প্রসঙ্গে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। বিমলা যে এ নতুন উপলক্ষ এবং ঝকমকে ব্যক্তিত্বের আপাত-বাহারে মুগ্ধ ও আকর্ষিত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

নতুনত্ব ও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ মানব-মানবী মনের সহজাত বৃত্তি (প্রবৃত্তি শব্দ ব্যবহার না করেও বলা যায়)। তাই দুই আদর্শ তথা দুই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণে দিশাহারা গৃহলক্ষ্মী নারী— ঘরের অতিচেনা মানুষ অচেনা ব্যক্তিত্বের পাশে স্বাভাবিক নিয়মেই ম্লান হয়ে ওঠে, অচেনাকে জয়ের নেশা মনে আগুন ধরাবে এমনটাও স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, আগুন ধরানোর উপযোগী স্ফুলিঙ্গ নিখিলেশই যুগিয়েছে, বন্ধু সন্দীপকে প্রতিনায়ক হতে এবং প্রতিযোগিতার ত্রিভুজ তৈরিতে সাহায্য করেছে।

সংঘাত বা দ্বন্দ্বের শুরুতে সন্দীপ আগুন, বিমলা পতঙ্গ। উপমা প্রাচীন হলেও বিমলার আচরণে সেই প্রাচীন সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে এ কথিত প্রতিযোগিতায় যোগদানে রুচিবান নিখিলেশের নিস্পৃহার কারণে। এখানেও তার সেই পুরনো যুক্তি— অধিকার জোর করে অর্জন করা যায় না। কিন্তু পরিস্থিতি যেখানে বিস্ফোরক চরিত্রের, সেখানে অতিভদ্রতা-সুরুচি হালে পানি পায় না। বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিনায়কের মধ্যে যেখানে যে-কোনো মূল্যে জয়ের নেশা প্রবল। তাই নারীকে ঘিরে প্রতিযোগিতায় (হলোই বা স্ত্রী) যুক্তিবাদী 'ভালো মানুষ' নিখিলেশের সাময়িক পিছু হটাই সত্য হয়ে ওঠে। শূন্য মন্দিরের বিরহকাতরতা নিয়ে নিখিলেশ স্ত্রী বিমলাকে জবরদস্তির বন্ধন থেকে 'মুক্তি' দিতে চেয়েছে, 'সম্পূর্ণ মুক্তি'।

অর্থাৎ বিমলা তার নিজের অবস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নিক, নিখিলেশের স্বামীত্ব যেন সেখানে বাধা না হয়, প্রভাব না ফেলে বিধিবিধানের ভার চাপিয়ে। এমনটাই নিখিলেশের ভাবনা। তার বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তোলা হয়েছে'। তাতে যদি ঘর পুড়ে তো পুড়ুক। এই হলো যুক্তিবাদী নিখিলেশ, আদর্শবাদী নিখিলেশ! তাকে তাই কিছুতেই অনাধুনিক বা সনাতনপন্থী বলা চলে না।

কিন্তু বিমলার কাছে আবেগের টানে, আপাত ঝকমকে ব্যক্তিত্বের টানে স্বদেশীয়ানার ক্ষেত্রে 'উপায় এবং লক্ষ্য দুইই যেখানে ঝাপসা হয়ে যায়' সেক্ষেত্রে যুক্তির গতানুগতিকতা তুচ্ছ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। শান্ত স্থিরতা তখন বড় অনাকর্ষণীয় মনে হতে থাকে, নিয়ম আর বন্ধন ছিঁড়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই তখন প্রবল হয়ে ওঠে। সন্দীপের 'মক্ষীরাণী' বিমলা তাই অভিনবত্বের টানে ও ব্যক্তিত্বের টানে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি নতুনত্বের টানে ও ভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকর্ষণে সন্দীপের দিকে ছুটে যায়; দেশসেবা সেখানে উপলক্ষ মাত্র।

এ পর্যায়ে কথিত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া অর্থাৎ সন্দীপের আকাঙ্ক্ষার কাছে বিমলার আত্মদান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষণিকের হলেও স্বাভাবিক ছিল, এবং তাই নিয়ে পাঠক-সমালোচকের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। আবার সমালোচনারও সমালোচনা বা জবাব থাকে। যেমন 'নারী ও পুরুষ দৈহিক বিস্ফোরণের চরম মুহূর্তে পৌঁছে গিয়ে ফিরে এসেছে এটা মোটেই অসম্ভব ঘটনা নয়; বাস্তব জীবনেও যেমন ঘটে, তেমনি সাহিত্যেও এর নজির আছে' (গুণময় মান্না)। পাশ্চাত্য-সাহিত্যেও রয়েছে এমন উদাহরণ।

বিমলা-সন্দীপের ক্ষেত্রে বিমলার ফিরে আসা বা ঝাঁপ দিতে না পারার ঘটনা ব্যতিক্রমী চরিত্রের হলেও একেবারে অবাস্তব হয়তো নয়। নয় এ কারণে যে বিমলা কাহিনীর তথ্যমতে সন্দীপের লালসা ও কামনার বিষয়ে অচেতন ছিল না, যে জন্য বারবার সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে দুই দিকের টান যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি তা বিমলার একাধিকবার স্বগতভাবনায় ধরা পড়ে। যেমন 'আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। একদিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহঙ্কারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসঙ্কোচ অহঙ্কারটাই আমাকে টানে।' বিমলার দিক থেকে উভয় পুরুষের মূল্যায়নে এমনি দ্বিধাসংশয় ও দুই স্রোতের টান একাধিক উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে বারবার ফিরে আসা, চরম মুহূর্তটিকে পরম করে না তুলে ছুটে বেরিয়ে আসা কেমন যেন লাগে, কিছুটা অস্বাভাবিকই মনে হয়। অস্বাভাবিক মনে হয় একই ভাবনার পুনরাবৃত্তির কারণে— 'মানুষের বোধহয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর একটা বুদ্ধি ভোলে।' অর্থাৎ একদিকে ঘরের টান ও পূর্বলালিত সংস্কার (পূর্বেই উল্লেখিত) অন্যদিকে বাইরের তথা ঝকমকে নতুনত্বের প্রবল আকর্ষণ— নিশ্চিতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন বিমলাকে দোলাচল চিত্ততায় ছুড়ে ফেলে। সেই একই বুদ্ধির দ্বৈত বিচারে সন্দীপ যেমন 'ভয়ঙ্কর, তেমনি মধুর'।

কিন্তু এ দ্বিধার ওপর আঘাত পড়ে যখন পরিস্থিতির প্রবলতা লক্ষ করে নিখিলেশ শেষপর্যন্ত বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। বাঁধভাঙার পূর্বমুহূর্তের এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যখন নিখিলেশ নির্দ্বিধায় বলে, বলতে পারে— 'আমার পিঁজরের মধ্যে চারিদিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্য এখানে ধরে রাখব ? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।' এরপর সর্বশেষ ভয়ঙ্কর উচ্চারণ— 'আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হবো না।' নিখিলেশ মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখতে চেষ্টা করে নি। কারণ এটা স্বভাবের বাইরে।

এমন আঘাত নিশ্চিন্ত আয়েশ-আরামের জীবনযাত্রায় অস্তিত্বের সঙ্কট সৃষ্টির মতো বিস্ফোরক চরিত্র অর্জন করতে পারে। সে একটা শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে যে শিকড়ে টান পড়তে পারে। বিমলাকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পক্ষে এ আঘাত যথেষ্টই ছিল। কিন্তু স্বাদেশিকতার টান আর দেবীত্বের মোহ কাটিয়ে, পূজার আকর্ষণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার কাজ মোটেই সহজ নয়, বিমলার জন্যও সহজ ছিল না। তাই সব কিছু বুঝে বা সন্দীপের 'মুখে চোখে মত্ততা ফেনিয়ে ওঠা' দেখেও তাকে বাতিল করা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হয় নি বিমলার পক্ষে। বিষয়টা তো আসলে আত্মরতির। ভুয়ো প্রেম বাতিল করা কঠিন হয় না, কিন্তু আত্মরতির মোহ কাটানো বড় কঠিন কাজ।

বিমলার একটি কথাই এ সত্য প্রমাণ করে। বিমলার মুখে সে উক্তি প্রকৃতপক্ষে তার পরাজয়ের প্রমাণ হলেও বুঝে শুনেই বিমলা তার চারদিকে গড়ে তোলা স্তবস্তুতির চালচিত্র অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছে; তার কথা— 'আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।' তাই তার জন্য সন্দীপের তৈরি পূজার বেদিটা অন্তঃসারহীন এবং মিথ্যা জেনেও ভেঙে ফেলতে পারে নি।

এ না-পারাটা তার জন্য ছিল অবমাননাকর। এমন কি সন্দীপের মোহজাগানিয়া বক্তৃতা ও ব্যক্তিত্বের ভেতরে যে সত্য নেই, সেখানে সবই যে রঙিন কাব্য ও শব্দের মোহন ফুলঝুরি তা জেনেও বিমলা ঐ মোহের আবেশ ভাঙতে পারে নি। বেরিয়ে আসতে পারে নি কথামালার জাদুকরী সম্মোহন থেকে। বিদায় করতে পারে নি সত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোশধারী মিথ্যাকে। বিদায় জানাতে পারে নি সন্দীপকে। বরং পরিস্থিতির জটিল দুর্বিপাকে পড়ে সন্দীপই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, বলা যায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। এখানে বিমলার হার শুধু সন্দীপের কাছে নয়, বরং তার ব্যক্তিসত্তার কাছে, পূর্বোক্ত সতীত্বচেতনার কাছে, আর পরোক্ষে হার নিখিলেশের কাছে।

কিন্তু ঘটনা ও তার প্রভাব এতটা সহজ-সরল নয়। জটিলতা এর সর্বাঙ্গে জড়ানো। যে বিমলা নিখিলেশের ইচ্ছা মেনেই ঘর থেকে বাইরে এসেছিল এবং সন্দীপের মাধ্যমে বাইরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে বিমলা আগের বিমলা নয়। ইতোমধ্যে বহু জ্ঞান, বহু অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করেছে। সব মিলিয়ে সে বিমলা দ্বৈতসত্তার আধার। তার ব্যক্তিত্বে দুই বিপরীতের অবস্থান তেলেজলে নয়, জলেজলে মিশ খেয়ে গেছে। এই বিভাজিত সত্তা (Split Personality) নিয়ে সে যেমন না চাইতে সন্দীপের কাছে গেছে, তেমনি গেছে নিখিলেশের কাছেও। এভাবে সে দ্বিচারিতার শিকার হয়েছে। এ উপন্যাস যদি ট্রাজেডি হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ নিখিলেশের মাথায় আঘাত পেয়ে জীবন সংশয়ের কারণে নয়, এ ট্রাজেডির যথার্থ বাহন বিমলা।

কারণ বিমলার স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া, নিখিলেশের কাছে আত্মনিবেদন তথা পরিপূর্ণ সমর্পণের পরও সন্দীপের ব্যক্তিত্বমোহ থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে সন্দীপের ওপর আসক্তি (প্রেম ?) জন্ম নেবার পর থেকে বিমলা এক ধরনের আত্মিক সঙ্কটে ভুগেছে। সে জন্যই সন্দীপ সম্পর্কে তিক্ত অনুভূতি লালন করেও সন্দীপের বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে সন্দীপের প্রতি বিমলার আবেগসিক্ত মোহ ফিরে এসেছে, একে যদি কেউ আসক্তি না বলে প্রেম বলে চিহ্নিত করে তাহলে তা অস্বীকার করা কঠিন। বিমলার মনোভাবে তেমন স্বীকৃতি স্পষ্ট। তাই সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার স্বগতোক্তি তাৎপর্যপূর্ণ—

> আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে সন্দেহ নেই। ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়, যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা; কিন্তু তবুও— আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো; আপনাকেও জানিনে।

বিমলার পক্ষে তাই এমন অনুধাবন আমাদেরও ভাবায় যে কোনো কিছুরই শেষ কথা আমাদের জানা নেই। আর নেই বলেই বিমলার ঐ 'কিন্তু তবুও' কথাটাও ভাবায় এ জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সন্দীপ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা বিমলার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সে জন্যই তার একটি মন চেনে সন্দীপের প্রলয়রূপ, ভয়ঙ্কর রূপ, আরেক মন তাকে চেনে 'মধুর' রূপে। অর্থাৎ সন্দীপ বিমলার অস্তিত্ব থেকে নিঃশেষে মুছে যায় না।

এই দ্বিচারিতা নিয়েই বিমলার নারীচেতনার সজীব সত্তা, সন্দীপের তীব্র আকাঙ্ক্ষার তাপে যে-সত্তার সচেতন উপলব্ধি বিমলার মধ্যে তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিমলার ভাষ্যেই মেনে নিতে হয়, এসব বিষয়ে সে নিজেকেই ভালো করে চেনে না, জানে না, যা এক ধরনের সর্বজনীন সত্য বলে তার মনে হয়েছে। তার ভালো লাগা না-লাগার সঠিক চরিত্রও তার জানা নেই। তাই বাইরে থেকে সে ঘরে ফিরে এলেও, প্রতিনায়ক সন্দীপ বিদায় নিলেও বিমলার মনোজগতের রহস্য অনেকাংশে রহস্যই থেকে যায়।

কারণ ঘটনার যেমন মৃত্যু নেই তেমনি ঘটনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া চেতনায় যে গভীর ছাপ রেখে যায় তা যেমন মুছে যায় না, তেমনি সবার চোখে তা ধরাও পড়ে না। সন্দীপের সংশ্রবে পরিবর্তিত বিমলা তাই মনের দিক থেকে ভিন্ন এক বিমলা হতে বাধ্য, এবং সবশেষে ঘরে ফেরা বিমলাও তাই আগেকার বিমলা নয়। অথচ এর সন্ধান নিখিলেশের না পাওয়ারই কথা। এমনকি তার জানার কথা নয় যে বিমলার মধ্যে দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব বিমলাকে আজীবন তাড়া করে ফিরবে। অথচ এটাই তাদের ত্রিভুজপ্রেমের প্রেক্ষাপটে বিমলার জন্য এক মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা। তাই বিমলাকে পেয়েও পুরনো 'বিমলা'কে না-পাওয়া নিখিলেশের ভবিতব্য, তার এ মানসিক ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

এমন সিদ্ধান্ত তাই সঠিক নয় যে নিখিলেশ 'সন্দীপের মোহ থেকে মুক্ত' বিমলাকে ফিরে পেয়েছে (গুণময় মান্না)। আপাতদৃষ্টিতে বিমলার সতীত্ব রক্ষা পেয়েছে ঠিকই, ঘরও রক্ষা পেয়েছে, জতুগৃহে আগুন লাগলেও ঘর পোড়ে নি। কিন্তু বিমলার সতীত্ব কতটা রক্ষা পেয়েছে সে তাত্ত্বিক প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠতে পারে। কারণ সন্দীপের সঙ্গে বিমলার দৈহিক মিলন না ঘটলেও সন্দীপের প্রতি বিমলার অক্ষুণ্ন মুগ্ধতা তো তার সতীত্বহানিরই নামান্তর। এখানে 'বিমলা'কে পেয়েও নিখিলেশের হার সন্দীপের কাছে।

এমন কি একথাও সত্য যে বিমলার সতীত্ব যতটা রক্ষা পেয়েছে তা সবটাই সন্দীপের দাক্ষিণ্যে। তার প্রমাণ সন্দীপ একাধিক ক্ষেত্রে বিমলার সঙ্গে মিলনের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে নি। যেমন, সন্দীপের ভাষায়, 'আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থরথর করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।' অন্যত্র সন্দীপের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ বিমলার সম্মোহিত রূপ দেখে পরিতৃপ্ত সন্দীপের কথা—

> বিমলার চোখ বুজে এলো।... খানিক পর সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না।... রাজা আমার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম।... যতক্ষণ না আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচিনে, আমি তো আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেল।

বিমলার এ আবেগতাড়িত আত্মপ্রকাশ সন্দীপকে তার প্রেমিকের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে, স্বামী নিখিলেশ এখানে তৃতীয় পুরুষ। বিমলার কথা থেকে মনে হয় সন্দীপের পথচলার প্রধান বাধা নিখিলেশ এমন সন্দেহ তার মনে জেগেছে। বিমলার পরবর্তী আচরণ আরো নাটকীয়, সেখানে সন্দীপই তার প্রভু। সন্দীপের ভাষায়— 'বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তারপরে ফুলে ফুলে কান্না— কান্না— কান্না'। বিমলার এতটা সম্মোহিত অবস্থা কতটা বাস্তবতাসম্মত তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও এমন আবেগবিহ্বলতা, এমন আচ্ছন্নতা, এমন আত্মনিবেদনের তীব্রতা সন্দীপের বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। তার এক ইশারায় মুগ্ধমতি বিমলা যে তখন তার সর্বস্ব সন্দীপকে উজাড় করে দিতে পারত, দেহ তো ছার, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ পরিণতি যে কী তা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না, তাই তিনি সে পথে যান নি। তা সত্ত্বেও সমকালীন সমাজ নামক ভয়ঙ্কর রক্ষণশীল, অন্ধশক্তির কাছ থেকে লেখকের প্রতি আঘাত কম আসে নি। এমন আশঙ্কায়ই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সমাজ ও সাধারণের মুখ চেয়ে বিমলার সতীত্ব রক্ষা করতে হয়েছে।

কিন্তু বিমলার সতীত্ব রক্ষায় প্রতিনায়কে সন্দীপের অবদান অস্বীকার করা চলে না। বিমলার দেহের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বিমলার অভিভূত অবস্থার সুযোগ নিতে তাকে দেখা যায় না। সম্ভবত বিমলাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করার আনন্দেই তৃপ্ত সন্দীপ বিমলাকে হেয় করতে চায় নি। তার ভাষায়— 'সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি।' প্রশ্ন উঠতে পারে সন্দীপের চরিত্রের সঙ্গে এ উদার মহানুভবতা কি মানায়? নাকি এর সবটাই লেখক রবীন্দ্রনাথের দান। এবং সে দান সমাজের রক্তচক্ষুর কারণে, না তাঁর বিশ্বাসের কারণে? এ প্রশ্নও থেকেই যায়।

রবীন্দ্রনাথ যদিও সতীত্ব-পতীত্ব ও সেবাপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীর সনাতন ধারণা থেকে সবুজপত্রপর্বে অনেকটাই সরে এসেছিলেন, তবু তার তলানিটুকু ছিল বলেই বোধহয় নীতিভঙ্গের প্রবলতা তিনি এক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছেন। পুরুষতান্ত্রিক উচ্চমন্যতা যে তাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় নি তার প্রমাণ মেলে পুরুষের চরণাশ্রয়ে নারীজীবনের সার্থকতার প্রকাশ থেকে। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা সতী নারীর ধর্ম— এমন বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হতে পারার কারণে অপরাধবোধে আক্রান্ত বিমলা বুকের মধ্যে নিখিলেশের পা চেপে ধরে ভাবে 'ওই পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ওইখানে আঁকা হয়ে যায় নাকি?' (প্রসঙ্গত ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দামিনী-শচীশের পদ বিষয়ক ঘটনা স্মর্তব্য)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই বিমলা স্বামী নিখিলেশের আশীর্বাদ অর্জন করে তাদের দাম্পত্যসম্পর্কে জোড়াতালির কাজ সম্পন্ন করেছে।

দাম্পত্যসম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ এটুকু আপোসবাদিতার প্রশ্রয় দিয়েছেন; পুরুষের উচ্চাসন, আধিপত্যবাদিতা নারী তথা 'ঘরে বাইরে'র নায়িকাকে মেনে নিতে হয়েছে। আর স্বামীকে 'প্রভু' সম্ভাষণ তো এ পর্বের রবীন্দ্র-উপন্যাসে বহুপ্রচলিত ধারা তথা সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। তবু 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' এমন কি 'গোরা' উপন্যাসের তুলনায় 'ঘরে বাইরে'র নায়িকা বিমলা নারীর বহির্জগৎ চর্চা উপলক্ষে প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতার অন্ধবৃত্ত বেশ কিছুটা অতিক্রম করতে পেরেছে। তবু সেখানে পিছুটান বা সনাতন রীতির খানিকটা অবশেষ থেকে গেছে। সে পিছুটান রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার। সেখান থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বেশ কষ্টকরই ছিল, বিশেষ করে উপন্যাসে এবং তার উপন্যাসের নায়িকাদের পক্ষে। শেষ কথা হচ্ছে, দাম্পত্যসম্বন্ধের প্রেক্ষাপটে সতীত্ব ও নারীত্বের যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতীত্বের আপাত জয় সূচিত হলেও তা একেবারে নিরঙ্কুশ নয়। এখানেও রাবীন্দ্রিক দোলাচলচিত্ততা যথারীতি প্রকাশ পেয়েছে।

তিন

সংক্ষিপ্ত বিচারে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস যতটা বিস্ফোরক চরিত্রের, তৎকালীন সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি বিস্ফোরণধর্মী। এ বিস্ফোরণের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক, সেই সঙ্গে সামাজিক-ধর্মনৈতিক। তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলন, বিলেতি সামগ্রী বর্জন করে দেশী জিনিস ব্যবহার ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নীতিগত দ্বন্দ্ব অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদিতা চিহ্নিত করা হয়েছিল ইংরেজশাসনের সমর্থক চরিত্র হিসাবে।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিষয়ক পূর্ব-ভাবনায় এর মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, 'অচলায়তন' ভাঙার শব্দে রক্ষণশীল সমাজে ক্রুদ্ধ আলোড়নের ঢেউ, 'বলাকা' ও 'সবুজপত্র' পর্বের কবিতায় ও ছোটগল্পে আধুনিক চিন্তার প্রকাশ, সবচেয়ে বড় কথা শাস্ত্রশাসিত বিধিবিধানে নির্যাতিত নারীসমাজের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য অনুগ্র হওয়া সত্ত্বেও সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, আর সে প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আঘাতের ঢেউ তোলে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস সেই অযৌক্তিক আঘাতের শিকার। এর কারণ এমনও হতে পারে যে বিশ শতকের শুরুতে সনাতন ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্রনাথ তাঁর রক্ষণশীলতা, হিন্দুত্ববাদিতার উত্তরীয় খুলে ফেলে এক যুগের মধ্যেই সেখানে সামাজিক প্রগতিচেতনার দক্ষিণা হাওয়া বইয়ে দিলেন। এটা নিঃসন্দেহে সমাজের মনঃপুত হয় নি। বিশেষ করে ভালো লাগে নি, সহ্য হয় নি রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনার বিবর্তন। পুরুষশাসিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে ও পরিবারে এত কালের ভোগ্যবস্তু নারী যদি হাত ফসকে ভিন্ন পথ ধরতে চায়, ভিন্ন সুরে কথা বলে তা রক্ষণশীল সমাজ ও সমাজপতিদের সইবে কেন ?

আসলে প্রতিবাদ যতটা অসহায় নারীর মুখে ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে অধিক মাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কথাশিল্পীদের রচনায়, তাদের সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে। তাই আঘাতের লক্ষ্য ছিলেন সাহিত্যিক ও লেখক-বুদ্ধিজীবীর দল, বিশেষভাবে সমাজ-সচেতন আধুনিক চেতনার লেখকগণ। এমনি সব কারণে সে সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল, সনাতনপন্থীদের ক্রুর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। সম্ভবত সে কারণেই নারীবিষয়ক রচনায় রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক পদক্ষেপে এগুতে হয়েছে।

একই কারণে রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র চিত্রণে মধ্যপর্বেও বিস্ফোরক চেতনার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম, পরিবর্তনটা ধীরগতির, অনেকটা সামাজিক পরিবর্তন ও নৃতাত্ত্বিক-জীবতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মতো। তাছাড়া এমনটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসম্মত। সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ সমাজ বা রাজনীতি ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ-বিপ্লবের বদলে ধীরগতির মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, বিদ্রোহ-বিপ্লবের সহিংসতা ও রক্তরঙ তাঁর সমর্থন-সহানুভূতি পায় নি। জবরদস্তিটা মোটেই তাঁর পছন্দ ছিল না— সেটা রাজনীতিতে, সমাজে বা পরিবারে যেখানেই হোক, নারী বা পুরুষ যে কেউ জবরদস্তির শিকার হোক তা রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন নি।

এ জন্যই রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় সূচিত পরিবর্তন হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে ওঠে নি, নারীচরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা', সেখান থেকে 'ঘরে বাইরে' ('চতুরঙ্গ' ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচ্য), এরপর 'যোগাযোগ' বা 'শেষের কবিতা' তারও পরে 'দুই বোন' এবং অংশত 'চার অধ্যায়'-এর নায়িকা-চরিত্রের বিচার বা সংশ্লিষ্ট নারীভাবনার পরিচয় নিতে গেলে রবীন্দ্রচৈতন্যে নারী-বিষয়ক পরিবর্তনের চরিত্রধারা গ্রামের নিস্তরঙ্গ ছোট নদীর ধীর স্রোতের মতোই মনে হবে। আর সে কারণে বিষয়টি নারীবাদী ভাবুকদের সমালোচনার শিকার হয়েছে। সে ধারা এখনো সচল।

তাই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ইঙ্গিতার্থক নামকরণের তাৎপর্য সত্ত্বেও সতীসাধ্বীর আদর্শ প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূচনা। বিমলা স্বামীগৃহে এসে পতিপরায়ণা বধূর মতোই জীবনযাত্রা শুরু করেছে, এ জন্য তাকে জোর করতে বা উপদেশ দিতে হয় নি। মনে হয়েছে যেন ঐতিহ্য ও পুরনো ট্র্যাডিশনে ভর করে তার যাত্রা শুরু। বিমলার বিশ্বাস ও প্রাত্যহিক আচরণে এমন সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যে পতিভক্তি ও পতির সার্বক্ষণিক সেবাই বিধিসম্মত আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। এতেই গৃহলক্ষ্মীর যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট। এমন অন্ধ সেবা ও পরিচর্যা নিখিলেশের একেবারে পছন্দ হয় নি, তার কাছে রুচিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নি। না হওয়ার কারণ নিখিলেশ আধুনিক চেতনার যুবক, ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারে তার বিশ্বাস যথেষ্ট। সেটা নারীর ক্ষেত্রেও সত্য বলে তার বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জন্যই সতীত্ব ও পত্নীত্বের শাস্ত্রসম্মত গতানুগতিক ধারায় বাধা পড়ে, চেতনাস্রোত বাঁকফেরা ভিন্নদিকে মোড় নেয়। পত্নীর বিধিবিধানসম্মত সেবা, আনুগত্য ও কথিত প্রেম কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যক্তির টানে, কতটা রীতিনীতির বাধ্যবাধকতায়— এ দ্বান্দ্বিক সত্য জানতে চেয়েছে নিখিলেশ। জানতে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই বিপজ্জনক পরীক্ষায় নেমেছে বিমলার স্বামী, আধুনিক জমিদার নিখিলেশ। নিখিলেশ ভাবতে পারে নি পরীক্ষার ফলাফল এমন কূলপ্লাবী হতে পারে, দুকূল ছাপিয়ে সে স্রোত ভাসিয়ে নিতে পারে জীবনের কিছু স্থায়ী উপাদান, বিশ্বাস ও কথিত সতীত্বের রঙচঙা ঘুঁটি। ভাবে নি বিমলার ব্যক্তিত্ব বাকচাতুর্যের হালকা ঝলসানিতে অন্ধ হয়ে যাবে।

তবু সত্য মেনে নেওয়ার মতো মনোবল নিখিলেশ দেখিয়েছে সেটা তার পক্ষে যাক বা না যাক। এখানে নিখিলেশ ও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রধর্মে একে অন্যের প্রতিরূপ। নিখিলেশ সত্য মেনে নিয়েও নিজের পদক্ষেপ ও অবস্থান ঠিক করে নিতে পেরেছে, বিমলাকে অবস্থা গতিকে বলতে পেরেছে, 'তোমাকে ছুটি দিলুম'। বলতে পেরেছে— 'তোমাকে যদি জোর করে বেঁধে রাখি তাহলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?' জবরদস্তি-বিরোধী এ নিখিলেশের মুখে যেন রবীন্দ্রনাথের আত্মচেতনারই উচ্চারণ। এখানেই নিখিলেশের জিত, শাস্ত্রসম্মত অধিকার বাস্তবের আঘাতে ছেড়ে দিতে পারার জিত।

দেশপ্রেমের পটভূমিতে সন্দীপের প্রতি বিমলার প্রেম আদর্শগত প্রেরণার ফলরূপে এসেছিল। সন্দীপের বাকচাতুর্যে অভিভূত বিমলার তীব্র অনুভূতি তার পূর্বলালিত সতীত্বের সংস্কার ভাঙতে সাহায্য করেছিল, বিমলা ধরা দিয়েছিল মূলত সন্দীপের বাগ্মিতার কুহকে। সেখানে হৃদয়ের উপচারও ছিল। সন্দীপের আকাঙ্ক্ষার নিকট পরিপূর্ণ সমর্পণেও সে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সন্দীপের লালসা, লোভ, ঈর্ষা, চতুরতা, কৃত্রিম দেশপ্রেম প্রেমিক সন্দীপকে ছাড়িয়ে গেছে। আর বিমলার প্রেম ব্যক্তিক ও দৈশিক। বিমলা এ দুইকে একাকার করে নিয়েছিল বলেই সন্দীপের স্থূলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে বিমলার প্রেম নিকষিত হেম হয়ে উঠতে পারে নি।

তাই বলে সে প্রেম নিঃশেষও হয়ে যায় নি, যায় নি স্বামীর পা বুকে তুলে নেবার পরও। বরং তার আকর্ষণ বরাবর দ্বৈত টানের শিকার হয়েছে যা তার কথা ও আচরণ থেকে বোঝা যায়। সন্দীপকে যথার্থ মূল্যে বুঝে নেওয়ার পরও তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তার বাগ্মিতার সম্মোহন (বিদায়ের পূর্বমুহূর্তেও) বিমলাকে অভিভূত করেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে তার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটিয়েছে। এ দুর্বলতা তার সতীত্বচেতনাকে পরাভূত করেছে। স্বামীর কাছে পতিভক্তির পরিপূর্ণ অর্ঘ্য সাজিয়ে নিজেকে নিবেদনের পরও ঐ সতীত্ব চেতনার শক্তি পূর্বরূপ ফিরে পায় নি পূর্বোক্ত দ্বৈত চেতনার কারণে।

সন্দীপের প্রতি বিমলার দুর্বলতা তার মনের গভীরে যে ছাপ ফেলেছিল তা ছিল মনের শিলালিপিতে গভীর দাগ কাটার মতো, এর স্থায়িত্ব মুছে যাবার মতো নয়। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমলাকে এবং তার সতীত্ব মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে সন্দীপ চরিত্রে নেতিবাচক অপগুণের সমাবেশ ঘটাতে হয়েছিল লেখককে। তা না হলে বিমলাকে বাঁচানো যেত না। আবার সন্দীপের উদারতাও (যদি সাময়িক বিভ্রমও বলা যায়) তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সতীত্বনাশের হাত থেকে। এ অঘটনের নায়কও লেখক। তা সম্ভবত সমকালীন সমাজের মুখ চেয়ে।

সত্যি বলতে কী, সন্দীপের আকর্ষণ মনে ধরে রেখে সমাজের কষ্টিপাথুরে বিচারে বা শুদ্ধ নৈতিকতার বিচারে বিমলা তো সতীত্বধর্মের দিক থেকে পতিত। কিন্তু নিখিলেশের 'বিমলা'কে এ অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই লেখক তাকে ফিরিয়ে এনেছেন আদর্শবাদী স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে সবার স্থূল বিবেচনায় এবং সমাজের অনুরূপ বিচারে বিমলার সতীত্ব রক্ষা পায়। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাক্রম বিচার করে দেখলে এবং বিমলা চরিত্রের গভীরতম প্রদেশের অনুভূতি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, তাকে সতীত্বহানির (অসতীত্বের) গহ্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, রামায়ণের রাম যেমন অশোক বনের সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা বিমলার প্রেম বস্তুত দুই স্রোতে অবগাহন করে একদিকে তার সতীত্ব হারিয়েছে, অন্যদিকে তা উদ্ধার করেছে। বিমলার আত্মঅন্বেষা এবং আত্মআবিষ্কার তার ঐ দ্বৈতচেতনা অর্জনের সহায়ক গুণ। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা, তাঁর নারীত্ব, সতীত্বচেতনা সংস্কার ও আধুনিকতার দুই বিপরীত বিন্দুই স্পর্শ করেছে। সেখানে অবশেষ জয় সতীত্ববোধের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘যোগাযোগ’
সনাতন দাম্পত্যসম্বন্ধের জালে আটক হরিণী কুমু

নারী ও পুরুষের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির যে স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রেমের প্রকাশ ঘটে ‘দাম্পত্যপ্রেম নামক সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সেক্ষেত্রে সাধনার দ্বারা গড়ে তুলতে হয়।’ রবীন্দ্রনাথ কথাটা বলেছিলেন ভারতীয় তথা হিন্দুবিবাহের দাম্পত্যপ্রেম সম্পর্কে ‘ভারতবর্ষীয় বিবাহ’ প্রবন্ধে (১৯২৫)। কাউন্ট কাইজারলিঙের অনুরোধে লেখা এ প্রবন্ধে এবং কাছাকাছি সময়ে লেখা একাধিক প্রবন্ধে (যেমন— নারী প্রসঙ্গ, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের যৌন ও দাম্পত্যসম্পর্ক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের ব্যক্তিক সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে দাম্পত্যসম্বন্ধের অন্তর্গত প্রেম এবং সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও মতামত প্রকাশ করেছেন। এমন কথাও বলেছেন যে ‘সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের সংস্কার প্রচলিত রয়েছে’। বলেছেন, ‘ভারতীয় বিবাহে স্ত্রীপুরুষের অধিকারের সাম্য নেই’।

এর অর্থ স্ত্রীর পতিপ্রেম, পতিসেবা, পতিভক্তির মতো বিষয় শাস্ত্রীয় বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেমের প্রকাশ ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নয়, ধর্মীয় অনুশাসনের বাধ্যতার জোরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘স্বামী তার (স্ত্রী’র) পক্ষে আইডিয়া... আইডিয়ার কাছে সে ধর্মবলে আত্মসমর্পণ করে।’ বিয়ের এ ব্যবস্থা বলা বাহুল্য ঘরে বাইরে, বিশেষত সমাজে পুরুষের প্রভুত্ব কায়েম করে, এবং স্ত্রীর প্রেমে স্বামীর অধিকার নিশ্চিত করে।

কিন্তু হৃদয় ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময় সমাজের অনুশাসন মেনে চলবে এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? এই হৃদয়ের ওপর শাস্ত্রীয় অনুশাসন চাপানো জবরদস্তির রূপ গ্রহণ করে। সেজন্যই স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে দাম্পত্যপ্রেমের ক্ষেত্রে ‘আইডিয়াল প্রেম তথা যথার্থ মুক্তপ্রেম’-এর প্রকাশ সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। কিন্তু বাস্তবে তেমন অর্জন সহজ নয় বলেই সমস্যা দেখা দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পুরুষ পূর্বোক্ত প্রভুত্বের জোরে নারীকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে, যেমন স্বামীর কর্তৃত্ব স্ত্রীর ওপর। নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য— 'নারীকে সে কাঞ্চনের মতো নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে, ত্যাগ করতেও পারে। ত্যাগ করার দ্বারা সে যে আত্মহত্যা করে তা সে জানেই না।' রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্যসম্পর্ককে প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেও বলতে দ্বিধা করেন নি যে 'নারীকে পুরুষ বিষয়সম্পত্তির মতো ভোগ করেছে।'

সমতার ভিত্তিতে নারীব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় কিছু না বললেও ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন মতামত প্রকাশ করেছেন যে 'যখন গৃহস্থালীর বাইরেও সমাজ-সৃষ্টি কার্যে নারী আপন বিশেষ শক্তির ব্যবহারে বাধা না পাবে তখন মানবসংসারে স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ যোগ হতে পারবে। পুরাকাল হতে আজ পর্যন্ত যে বিবাহপ্রথা চলে আসছে তাতে স্ত্রী-পুরুষের সেই পূর্ণযোগ বাধাগ্রস্ত।... বিবাহ এখন সকল দেশেই নারীকে বন্দি করে রাখবার নিরাপদ পিঞ্জর।' এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের তুলনামূলক মন্তব্য উপভোগ্য— 'ভারতীয় হিন্দুসমাজে এ পিঞ্জর যত কঠিন, যত সংকীর্ণ, যত নিষ্ঠুর, যত পিঞ্জরাধিক পিঞ্জর, সব দেশে ততটা নয়।'

আশ্চর্য যে এ প্রবন্ধ প্রকাশের অনেক আগে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্যপ্রেমের প্রচলিত বাধ্যবাধকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষায় নেমেছিলেন। অর্থাৎ এসব বিষয় নিয়ে তাঁর ভাবনা দীর্ঘদিনের। নিখিলেশ স্ত্রী বিমলাকে ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল সনাতন দাম্পত্যসম্পর্কের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমের বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য। বুঝে নিতে যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম সামাজিক বিধানের টানে, না প্রেমেরই টানে দেখা দেয়। এ পরীক্ষার ফলাফল নিখিলেশের প্রত্যাশা পূরণ করে নি, বরং বিপরীত সত্যই প্রতিপন্ন করেছিল। দাম্পত্যসম্পর্কে প্রেমের সনাতন চরিত্র ঐ পরীক্ষায় টেকে নি।

দুই

'ঘরে বাইরে' রচনার এক যুগ পর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে (১৯২৭) রবীন্দ্রনাথ কি আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে নতুন পরীক্ষা শুরু করেছিলেন? পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মাসখানেক পরই রবীন্দ্রনাথ 'তিন পুরুষ' (পরে নাম পরিবর্তন করে 'যোগাযোগ') উপন্যাস লেখা শুরু করেন। একাধিক প্রবন্ধে আলোচিত দাম্পত্যসম্পর্ক, নর-নারীর প্রেম বিষয়ক সমস্যাদি ঐ সময়ে রচিত উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে প্রভাব ফেলা খুবই স্বাভাবিক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়— 'নতুন উপন্যাস রচনাকালে মনের অবচেতনলোকে এইসব সমস্যাজাত নর-নারীরা আবির্ভূত হয়। যাহা ছিল তত্ত্বমূলক গদ্য প্রবন্ধের বিষয় তাহা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে ও সংলাপে জীবন্ত হইয়া শাশ্বত সমস্যা রূপে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্ক ও দাম্পত্যপ্রেমই যদি পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কাহিনী লেখকের সমকালের হওয়াই তো সঠিক ছিল। তাহলে ঘটনা ও চরিত্রের ওপর সুবিচার করা হতো। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে 'স্বামী-সম্বন্ধের নিত্যতা' নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমনি 'যোগাযোগ'-এ পুরুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতাপই যে নারীর দাম্পত্য-বিষয়ক সংস্কারের সহায়তায় নর-নারীর দাম্পত্যসম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ করে তার বাস্তবরূপ তুলে ধরা ? সেই সঙ্গে দেখানো, নারীর মনোজগতে মাতৃত্বের প্রভাব কত প্রবল যা নারীর ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদাবোধকেও পরাজিত করতে পারে ? মাতৃত্বের পারিবারিক-সামাজিক ও ব্যক্তিক প্রভাবের প্রবলতায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল গভীর। নানা প্রসঙ্গে তা উচ্চারিত।

উদ্দেশ্য যাই হোক একথা সত্য যে 'যোগাযোগ'-এর নায়িকা কুমুদিনীর (কুমুর) দাম্পত্যসম্পর্কের স্বাপ্নিক আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল অসম চেতনার দুই নর-নারীর মধ্যে বিবাহের ফলে, সনাতন দাম্পত্যসম্পর্কের চিরন্তন সত্য সেখানে কোনো কাজে আসে নি, তৈরি করতে পারে নি কুমু-মধুসূদনের মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ-জাত প্রেম। এর কারণ এ দুজনের মধ্যে পারিবারিক শিক্ষা, রুচি, আচার, সংস্কৃতি ও মানসধর্মের ভিন্নতা, মেরু প্রমাণ প্রভেদ। দুই ভিন্ন মূল্যবোধ লালন করে কুমুদিনী ও মধুসূদন দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। শুধু সাত পাকে বাঁধা দাম্পত্যসম্পর্কের ঐতিহ্যবাহী মহিমা কি তাদের মেলাতে পারে বা একসূত্রে গেঁথে দিতে পারে ?

পারে নি। সমাজ নির্ধারিত বিধিবিধান ও মূল্যবোধের প্রভাব কুমু ও মধুকে মেলাতে পারে নি। কুমু অবশ্য মিলনের জন্য প্রস্তুত ছিল, প্রস্তুত ছিল দাম্পত্যসম্পর্কের পবিত্রতা, মর্যাদা ও মহিমা নিয়ে গড়ে তোলা স্বপ্ন নিয়ে। কুমু তার স্পর্শকাতর মন, শিক্ষা ও সুরুচি বহন করেও ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক (বিশেষ করে দাম্পত্যসম্পর্কের বিভিন্ন দিক) ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ছিল ভাবলোকের বাসিন্দা। সতীত্ব ও পত্নীত্ব সংস্কার তার মধ্যে প্রবলভাবেই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল কিছু অন্ধ সংস্কার। যে সংস্কারবশে কুমু তার দাদা বিপ্রদাসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব মনে মনে যেভাবে বরণ করে নিয়েছিল তা কোনোমতেই আধুনিক চেতনার প্রকাশ বলা চলে না।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ, স্বামী ও পবিত্র দাম্পত্যসম্বন্ধ নিয়ে কুমুদিনীর মনে স্বামী, স্ত্রী ও সতীত্বের যে কল্পলোক গড়ে উঠেছিল তা ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ-দর্শনের আদর্শ-নির্ভর। প্রাচীন কাব্যের নায়িকাদের আদলে নিজেকে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল কুমু। বিশেষ করে 'কুমারসম্ভবের শিব-পার্বতীর সম্বন্ধ ছিল বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী বিষয়ে তার আদর্শ।' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, পাঁজিপুঁথির প্রভাব, ঠিকুজিকুষ্ঠি ও শুভলক্ষণের একাধিক বিষয়। তাই মধুসূদন ঘোষালের ভালো-মন্দ গুণ-অপগুণ জানার আগ্রহ তার ছিল না। একই কারণে বয়সের পার্থক্য, সামাজিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক অসমতার মতো একাধিক নেতিবাচক উপাদান উড়িয়ে দিয়ে কুমু তার দাদাকে বলেছে— 'যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে।' মনে হয় এ যেন এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক!

বিপ্রদাস অবাক হয়েছে। কুমুর সনাতন সংস্কারের কথা তার অজানা নয়। তবু চেষ্টা করেছে বোনকে যুক্তিধর্মে নির্ভর করে মন ঠিক করে সিদ্ধান্ত জানাতে। কিন্তু কুমু যুক্তির ধার দিয়েই যায় নি। বিপ্রদাস যতই বলে— 'দুই পক্ষের সততায় বিবাহবন্ধন সত্য।... হাল আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য, তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন', ততই কুমু বলতে থাকে— 'তিনি ভালোই হন, আর মন্দই হন, তিনিই আমার পরম গতি।... অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক... মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' স্বপ্নেও ভাবে নি কুমুদিনী, কী বিপজ্জনক অন্ধকার আবর্তে সে ঝাঁপ দিয়েছে। তাই পরে স্বামী সম্পর্কে কুমুর আবেগতাড়িত উপরের কথাগুলোই যখন মোতির মা'র মুখ দিয়ে তার কাছে ফেরত এসেছে, বাস্তবের আঘাতে রক্তাক্ত কুমু তখন তা মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু প্রাকবিবাহ কুমুর মধ্যে স্বাপ্নিক ভাববাদিতা ও ভক্তিবাদী চেতনাই ছিল প্রবল।

কুমুর এ ভাববাদী-ভক্তিবাদী চেতনা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে তার পরবর্তী জীবনাচরণ ও প্রতিক্রিয়া এবং তার চারিত্র্যধর্মের পরিবর্তন লক্ষ করলে। সেক্ষেত্রে তার চরিত্রগঠন অনুধাবনের জন্য কিছুটা পেছন ফিরে তাকাতে হয়। তাতে বোঝা যাবে যে আপাত দৃষ্টিতে সহজ, সরল, সোজা মনে হলেও কুমু চরিত্রে জটিলতা কম নয়। লেখক সেভাবেই তাকে গড়ে তুলেছেন। কুমু জমিদার পিতার আদুরে মেয়ে। তার চোখের সামনে ঘটেছে পিতার অনাচারে ক্ষুব্ধ মায়ের প্রতিবাদ এবং অবশেষ প্রতিক্রিয়ায় গৃহত্যাগ। পরিণামে উভয়েরই অকালমৃত্যু। এসব ঘটনা কুমুর চরিত্রে প্রভাব ফেলেছে, এবং ঘটনার চাপে বিপর্যস্ত কিশোরীমন ভক্তিবাদিতার দিকে মুখ ফিরিয়েছে কিনা তাও বিবেচনার বিষয়।

পিতৃমাতৃহীন কুমু দাদা বিপ্রদাসের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব এবং বাইরের জগতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার অভাবেই হয়তো বা কুমু স্বভাবে অন্তর্মুখী। কিন্তু তার চরিত্রে অন্তর্নিহিত জেদ ও দৃঢ়তা তার স্বভাবগত নম্রতার জন্য সহজে ধরা পড়ে না। সে জন্যই তাকে ব্যক্তিত্বহীন মনে করা ঠিক নয়। দাদার শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও, দাদার সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা (যেমন সঙ্গীতসাধনা, এসরাজবাদন, দাবা খেলা, ছবি তোলা, বন্দুক ছোঁড়া, সাহিত্যপাঠ, বিশেষ করে প্রাচীন কাব্যসাহিত্য পাঠ ইত্যাদি) সত্ত্বেও ঠাকুর দেবতায় এবং সনাতন রীতিপ্রথায় দাদার অবিশ্বাস তাকে স্পর্শ করে নি। বিপ্রদাস জানে, 'কুমুর চিত্তের অন্ধকার মহলে ওর ওপর দাদার একটুও দখল নেই।' সেখানে কুমু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বিশ্বাস নিয়ে একা এবং নিঃসঙ্গ। ধর্মবিশ্বাস ও দেবভক্তি তার মধ্যে প্রবল। কুমুর চরিত্র তাই শুরু থেকেই দ্বিমাত্রিক ও জটিল।

লেখকের ভাষায়, 'পুরনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।' সনাতন ধর্মের বিধানসম্মত ধারায় দাম্পত্যপ্রেম, সতীত্ব-পত্নীত্ব, পতিভক্তি, গৃহধর্ম এবং সামাজিক বিধি-বিধানের প্রতি কুমুর অগাধ বিশ্বাস, দৈবে তার অবিচল আস্থা। আবার একই সাথে প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের পাঠ এবং সুচারু সংস্কৃতিচর্চার প্রভাবে তার মধ্যে ভাবলোকে বিচরণের স্পৃহা প্রবল। ভক্তিবাদিতা ও ভাববাদিতার সমন্বয়ে গড়া হলেও কুমু চরিত্রে আদর্শবাদিতার প্রভাব যথেষ্ট। কুমুর সব ভাবনাই শুদ্ধ রূপের ভাবনা। এখানেই তার চরিত্রের শক্তি, তার স্বভাবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যা একান্তই কুমুর নিজস্ব।

কুমু সুন্দরী, যেমন রঙে তেমনি দেহের গঠনে। সাধারণ বিচারে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সে তার থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। ঘরের পরিবেশ প্রভাবে পিতৃমাতৃহীন কুমুদিনীর 'সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব'— যে জন্য তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভুল বোঝার অবকাশ খুব স্বাভাবিক। কুমু তাদের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, তবু কাব্যপাঠ ও স্বপ্নচারিতার কারণে কুমু আদর্শ স্বামী হিসাবে স্বপ্নের রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় থাকে। 'পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা।' স্বপ্ন ও বাস্তবের টানাপোড়েন সত্ত্বেও পরিবেশগুণে একাকিত্ব কুমুর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে একদিকে ভক্তিবাদ ও স্বাপ্নিক ভাবালুতা অন্যদিকে আত্মসচেতনতা, আবেগ ও মানস দৃঢ়তা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হলেও এগুলোর সমন্বয়েই কুমু-চরিত্র গড়ে উঠেছে।

এই কুমুর সঙ্গে শ্রেণী চরিত্রধর্মে বৈশ্য (মুৎসুদ্দি) ও বৈষয়িক এবং ধনপতি মধুসূদনের মনের অমিলই প্রধান। তবু কাহিনীর প্রয়োজনে কুমু-মধুসূদনের মধ্যে এক অসম-মিলন (বিয়ে) ঘটানো হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের ভাষায় এ হলো 'যথার্থভাবে অসবর্ণ বিবাহ'। কারণ তাঁর মতে 'এরা দুই জাতের মানুষ, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির স্তরে লালিত।' সে কালের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই জানা যে ঔপনিবেশিক প্রভাবে এদেশে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর কমপ্রেডর চরিত্র জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে বিকশিত হয় নি। তাই অনাচার ও স্থূলতা এদের স্বভাবে বাসা বেঁধে ছিল, স্বদেশীয়ানার ঘটেছিল নির্বাসন। জাতীয় চরিত্রের গুণ এদের মধ্যে ছিল না। স্বভাবতই সামন্ত জমিদারদের সঙ্গে তুলনা করে এ শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অর্থহীন ও বাস্তবতাবর্জিত, যদিও মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ সমাজবিকাশের বিচারে সামন্তবাদের পরবর্তী পর্যায়।

বেনিয়া মধুসূদন ঐ মুৎসুদ্দি শ্রেণীর সুযোগ্য সদস্য। চতুর ব্যবসাবুদ্ধির চরিত্র এদের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের রুচি-আচার ব্যবহার নির্ভর করে বিত্তের পরিমাণের ওপর, আলোকিত চেতনার ওপর নয়। ওদের জীবনধারার প্রভাব ওদের চেতনা, ওদের মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে। মধুসূদনের বিত্ত ও খেতাব শাসকশ্রেণীর দাক্ষিণ্যে, তা সত্ত্বেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকিত চেতনা ও মূল্যবোধের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নি। সনাতন দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় সামান্য হলেও নারী তথা স্ত্রী যে ভোগের সামগ্রী ও পণ্যসামগ্রী এ সম্বন্ধে সে সচেতন। সে জানে, এ পণ্যও সর্বোচ্চ অর্থমূল্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে এবং তা সমাজের আনুকূল্যে।

মধুসূদনদের আমলে উঠতি বেনিয়াদের সঙ্গে ইংরেজ বেনিয়াদের ছিল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সে সুবাদে ওদের চতুর বেনিয়াবুদ্ধি দেশজদেরও অনেকে আত্মস্থ করেছিল; সম্ভবত মধুসূদন তাদের একজন। আর সে জন্যই তার এত দ্রুত আরোহণ। হয়তো তাই তার ব্যক্তিত্ব বিত্ত ও শক্তির অধীন। এমন বাণিজ্যবুদ্ধি নিয়ে সে বিশ্বাস করে সংসারে নারীর বা স্ত্রীর ভূমিকা চার দেয়ালের মধ্যে থেকে সেবাদানের— সে সেবা যেমন ঘরসংসার স্থিতির জন্য তেমনি গৃহস্বামীর মনোরঞ্জন ও দৈহিক তৃপ্তির জন্য। কুমুকে দেখে তার মনে হয়েছে এ সৌন্দর্য, এ দেহ সবই তার বিষয়-সম্পত্তির অন্তর্গত। তার এমন ধারণার অন্য কারণ ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের আভিজাত্য গরিমা তার মতো বিত্তবানের অর্থগরিমার সাহায্যে কিনে নেওয়া সম্ভব, সম্ভব তাদের ঋণগ্রস্ত করা। এটা ছিল বিপ্রদাসের ক্ষেত্রে সত্য। তাই আভিজাত্য থাক না থাক বিত্তই যে আভিজাত্যের অভাব পূরণ করতে সক্ষম সে বিষয়ে মধুসূদনের কোনো সন্দেহ ছিল না। কুমুর সঙ্গে তার ব্যবহারটা ছিল প্রভুত্বের ও শাসনের, প্রেমের নয়, তার ব্যবহারে সে তা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে।

মধুসূদনের চেহারা আকৃতি রবীন্দ্রনাথ খুব একটা সুশ্রীরেখায় এঁকে তোলেন নি। এ নিয়ে অভিযোগ উঠতে পারে কিন্তু সে অভিযোগ কুমুর ছিল না। স্বামীর রূপ বা বয়স নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, ভক্তি নিয়ে দৈব-নির্ধারিত অনিবার্যকে বরণ করে নেবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। প্রস্তুত ছিল স্বপ্নের রাজাকে মনের ঘরে তুলে নিতে। কিন্তু মধুসূদনের একের পর এক আচরণে কুমুর সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাজা এলো, কিন্তু সে 'সত্যকার রাজা' তার মনের রাজা হয়ে উঠল না। তাই কমেডি তথা মিলনের শুরুতে ট্রাজেডির সূচনা।

কুমুর ট্রাজেডি একদিকে তার ব্যক্তিচরিত্র ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণে, অন্যদিকে পবিত্র দাম্পত্যধর্মের আদর্শ বিচারে স্বপ্নভঙ্গের কারণে। এর বাইরের কারণটা আরো জোরাল— বেনিয়া মুৎসুদ্দি চরিত্রের সঙ্গে পরিশীলিত ধ্যানধারণার এবং দুয়ের মূল্যবোধের সংঘাত। উপনিবেশিক শাসনে উঠতি বেনিয়া শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের স্বার্থের সংঘাত এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। কুমু-মধুসূদনের সম্পর্কের সীমাবদ্ধ বৃত্তে সে সংঘাতের শিকার আপাতদৃষ্টিতে বিপ্রদাস হলেও মূল শিকার কুমু— অবশ্য তা প্রধানত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের বৈপরীত্য ভিত্তি করে। সেখানে কুমুর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সে অসহায়। মধুসূদনের বিত্তের জোর তার চিত্তের জোর ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে তার দাম্পত্যসম্পর্কে ছন্দপতন ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধগত এমন এক বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে কুমুর স্বামী-সংসারে প্রবেশ। তাই তার পূর্বধারণা যে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, সঙ্গিনী, সংসারের সব কাজে আনন্দদায়িনী শক্তি স্বামীগৃহে প্রবেশের পর থেকেই আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে পড়তে থাকে। এর সর্বশেষ রূপ পরিস্ফুট হয় রাতে স্বামীর শয়ন ঘরে, শয্যায়। প্রতিরাতে কুমুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামনাতাড়িত মধুসূদন যখন অনুনয় করে বা কড়া ধমকে ডাক দেয়— 'ঘরে এসো, শোবে চল' তখন পূর্বে উদ্ধৃত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ মনে করতে হয়। মধুসূদন বস্ত্রালঙ্কার তো বটেই, দামি হীরের আংটি উপহার দিয়ে স্ত্রীকে রমণে উৎসাহিত করে। জবরদস্তির সে যৌনসম্ভোগ একালের সংজ্ঞায় নারীধর্ষণের নামান্তর। কুমু এ মিলনে তার মনকে প্রস্তুত করার জন্য সময় চেয়েও মধুসূদনের সহযোগিতা পায় না।

কুমুর সতীত্ববোধ যেমন দাম্পত্যঅধিকারের বিবেচনা সত্ত্বেও আহত হয়, তেমনি রক্তাক্ত হয় তার নারীত্ব চেতনা। অশুচিতা বোধ তাকে গ্রাস করে যা তার পূর্বলালিত পত্নীত্ব-স্বামীত্ব বোধের সংস্কারও মুছে দিতে পারে না। আত্মদানের ইচ্ছা জবরদস্তির মুখে নষ্ট হয়ে যায়। কুমু যেখানে স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় মধুসূদন সেখানে উগ্র লালসা তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। সে বেনিয়া, তার হাতে সময় নেই স্ত্রীর সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপচারিতার। সে শুধু বোঝে বেনিয়া আদর্শের বিনিময় পন্থা। বোঝে অর্থের বিনিময়ে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দাবিতে স্ত্রী-সম্ভোগের ন্যায্য অধিকার, যা কুমুর রুচি মেনে নিতে পারে না। সুরুচি-কুরুচির মেলবন্ধন অসম্ভব বলে দাম্পত্য আদর্শ বিষয়ক সনাতন ধর্মের অনুশাসন কুমুকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। প্রতি রাতে রমণের পর কুমুর নিজেকে অশুচি মনে হয়।

অসহায় কুমু তার দেবতাকে ডাকে, কিন্তু দেবতা সাড়া দেয় না। 'যে-ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়' তা কুমুর ভাগ্যে জোটে নি। তবু কুমু 'স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে দান করেছে তার দেবতাকে। দেবতা তার পূজাকে বড় কঠিন করেছেন।' কারণ এ দেবতা মধুসূদনের নয়। তার দেবতা সিদ্ধিদাতা শ্বেতাঙ্গ গণেশ। অর্থের লেনদেনের বাইরে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। তাই স্ত্রীর মূর্ছা দেখে ক্রুদ্ধ মধুসূদন বলে ওঠে, 'আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্টিরিয়াওয়ালী মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

কুমু বুঝে নেয়, এ বাড়িতে সে দাসী, এবং পুরুষস্বামীর দাসী। মধুসূদন যখন বলে, 'এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিষ বলে কিছু নেই' তখন আরো বুঝে নেয়, সে শুধু দাসী নয়, ক্রীতদাসী। নারীত্বের দাবি লুণ্ঠিত। 'গৃহিণী সচিব সখা' ইত্যাদি ললিত বাণী সব মিথ্যা। স্বামীকে গায়ের জোরে অধিকার খাটাতে দেখে তার ব্যক্তিসত্তা 'ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, ধিক্কারে ভরে ওঠে।' অন্যদিকে সনাতনপন্থী বিশ্বাসের মন বলে— 'স্বামীকে মন-প্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ। মেয়েদের একটি মাত্র লক্ষ্য সতী-সাবিত্রী হয়ে ওঠা।' এসব কুমুর পারিবারিক প্রভাব, তার সংস্কারের প্রভাব। এখানে কুমু দুই স্ববিরোধী চেতনার অসহায় শিকার। এই বৈপরীত্য চেতনা ট্রাজেডির জন্ম দেয়।

চার

কুমুর মনে স্বামীকে নিয়ে, দাম্পত্যসম্পর্কের ন্যায়নীতি নিয়ে, পূর্বাপর লালিত সংস্কার নিয়ে তার সুরুচিবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতার সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তা কুমুকে অস্থির করে তুলেছিল। মনের মিলনের ওপর ভর করে দৈহিক মিলনের এবং সর্বস্ব সমর্পণের যে বিশ্বাস তার মধ্যে তৈরি ছিল তার সঙ্গে স্থূলরুচির, বেনিয়াচরিত্রের মধুসূদনের ক্রমাগত সংঘাত কুমুর বিশ্বাসের ভিত ক্রমশ শিথিল করে দিচ্ছিল। তবু বিদ্রোহ তখন তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

এ অবস্থায় অনিচ্ছার মিলন কুমুকে ক্রমাগত আঘাতে জীর্ণ করে তুলেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার। স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে সে এক বিভীষিকার ছবি দেখতে পায়। যেন এক অজানা জন্তু জিভ মেলে গুড়ি মেরে বসে আছে তাকে ধরবে বলে। কিন্তু সতীত্ব-পত্নীত্বের সত্যে বিশ্বাসী কুমু জেনেশুনে এক সময় মধুসূদনের সম্ভোগ তাড়নার কাছে ধরা দেয়। কিন্তু পরদিন তার মনে হয় 'যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন, নাকি যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তার নৈবেদ্য ? আজ কিছুতেই ভক্তি জাগছে না।' এ কুমু অবস্থার অসহায় বন্দি।

আসলে দেহ-মনের বিচ্ছিন্নতার কারণে তার মধ্যে দাম্পত্যপ্রেমের উদ্ভাস ঘটে নি, মিলন স্থূল লালসার বলি হয়েই শেষ হয়েছে। কুমুর মনে হয়েছে তার ঠাকুর অর্থাৎ তার ভবিতব্য তাকে এমন 'দাসীর হাটে বিক্রি করে দিয়েছে যেখানে মাছ-মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়।' এভাবেই কুমু দাম্পত্যপ্রেমের পবিত্রতা থেকে, তার বিশ্বাসের জগৎ থেকে ক্রমশ সরে এসেছে। সে বুঝতে পারছে 'একটা কালো ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো।' তার আত্মনিবেদনের পরিণাম 'একটা কাঁচা ফলকে পাকার সময় না দিয়ে জাঁতায় পিষে' রস বের করার চেষ্টা।

কুমু তার স্বামী মধুসূদনকে মনের দিক থেকে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়েও রসের যোগান দিয়েছে, বলতে হয় দিতে বাধ্য হয়েছে— একদিকে তার ভাববাদী দাম্পত্যচেতনা, অন্যদিকে স্বামীর পুরুষালি কর্তৃত্ব, যে স্থূলশক্তির কাছে দুর্বল নম্র কোমল কুমু হার মেনেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমু তার ব্যক্তিসত্তাকে, নারীত্ববোধকে যে লালসার কবল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছে সেখানে তার জিত। এ হারজিতের দ্বন্দ্বে 'কুমুর নিজের সঙ্গেই নিজের বিরোধ' বড় হয়ে ওঠে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই কুমুকে স্বামীর গৃহত্যাগ করে পুরনো পরিবেশে ফিরতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ফিরে দাদা বিপ্রদাসের বুকে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে কুমুর অপমানিত নারীসত্তা। দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে, মানা না-মানার ন্যায়-অন্যায় নিয়ে বিপ্রদাসের সঙ্গে কুমুর খোলামেলা আলোচনা হয়। আসে মীরাবাই-এর স্বামীত্যাগের প্রসঙ্গ। প্রেমহীন অমিলের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া জীবনের সত্য রূপে উঠে আসে। পুরুষতন্ত্রের হাতে নারী-নির্যাতনের সামাজিক রূপ বিপ্রদাসের উত্তেজিত বক্তব্যে সত্য হয়ে ওঠে, বুঝতে কষ্ট হয় না— 'মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।... সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো উপায় নেই বলেই তাদের উপর মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না।'

'কুমু, ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না'— বিপ্রদাসের এ সিদ্ধান্তে নারীস্বাধিকারের পক্ষে যে ঘোষণা, সেখানে বিদ্রোহের রঙ সবটাই বিপ্রদাসের দান, ওখানে কুমুর প্রত্যক্ষ অবদান না থাকলেও তার পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ কুমুই এর উপলক্ষ। তবে এখানে বিদ্রোহীর ভূমিকা পুরোটাই বিপ্রদাসের যেজন্য বিধবা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে মধুসূদনের অনাচারের কাহিনী শুনে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ বিপ্রদাসের প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। নিজের মায়ের দুর্দশার কথা মনে করে বিপ্রদাসের বক্তব্য— 'আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন (অবশ্য স্বামীর কাছ থেকেই) তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান, কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতেই হার মানবি না।'

এ যেন 'গোরা' উপন্যাসে ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও ললিতার অনমনীয় উচ্চারণ : হার মানব না, কিছুতেই হার মানব না। 'নারী-পুরুষের প্রেম নিয়ে সমাজের অন্যায়, অনাচার; আবার পুরুষের অন্যায়-অনাচারের প্রতি সমাজের সমর্থন এ সবই সামাজিক পাপ।' সমাজকে সে জন্য ক্ষমা করতে পারছে না বিপ্রদাস। তাই বোনকে সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানাতে পারছে নির্দ্বিধায়। লড়াই সেই সমাজের সঙ্গে, যে নারীকে তার মূল্য দিতে পারছে না। কুমুকে আপোস না করে লড়াইয়ে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছে তার দাদা, এ লড়াই গোটা নারী সমাজের মুক্তির জন্য। এ বিপ্রদাস সামন্তবাদী মূল্যবোধের নয়, বরং আধুনিক চেতনার প্রতীক। 'পজিটিভিস্ট' চিন্তার ধারক, নারীস্বাধিকারের প্রবক্তা বিপ্রদাসকে অনাধুনিক মনে করার পেছনে যুক্তি নেই।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কুমুর বন্ধন মুক্তির প্রশ্নে নারীস্বাধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামীর অনুগ্রহের আশ্রয়ে কুমুর অসম্মানজনক ফিরে যাওয়ায় বিপ্রদাসের মত নেই, কারণ স্বামী এখন আর তার অধিকারের আশ্রয় নয়। পুরুষ এভাবেই অসহায় নারীকে আশ্রয়হীন করে থাকে, আর সমাজের কাছ থেকে শক্তির জোরে সমর্থন আদায় করে নেয়। এভাবে পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর চিরাচরিত পরাভব। এ পরাভব মেনে নেওয়া যায় না।

এ পরাভবের কারণ যেমন পুরুষ তেমনি রক্ষণশীলতার অন্ধ সমর্থক মেয়েরাও। বিপ্রদাসের ভাষায় 'মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ'। (তুলনীয় নীলিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, যেখানে বলা হয়েছে 'আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বিবাহ সম্বন্ধ নিয়ে স্ত্রীলোকের দুঃসহ অবমাননার অন্ত নেই।') বিপ্রদাসের আরো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : 'মেয়েরা মনে করছে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ সার্থকতা।' কুমুর সম্পর্কেও তার অভিযোগ : 'তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি।' গোরা, নিখিলেশের মতো বিপ্রদাসও রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ভাবনার (নারীভাবনারও) প্রবক্তা, সেক্ষেত্রে তার কথা রবীন্দ্রনাথেরই কথা।

কুমুর ধ্যানধারণার আলোকে বিয়েটা ছিল কুমুর জন্য এক স্বপ্নজগতের দ্বার উদ্ঘাটন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় সংঘাতের বীজ বহন করে কুমুর স্বামীগৃহে যাত্রা এবং সেখানে যথারীতি মধুসূদনের আচরণে তার স্বপ্নভঙ্গের পালা সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যাশা যেখানে বেশি, আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সেখানে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশিই হয়ে থাকে। আর তা সত্ত্বেও কুমুর চেষ্টা ছিল শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন তথা স্ত্রীধর্ম যথাযথভাবে পালনের। থাকুক সেখানে চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের বৈপরীত্য। *কুমুর এ বিধিবিধানগত বিশ্বাসই ছিল কুমুর বন্ধন; বন্ধন স্বামীর প্রতি, ঘোষাল বাড়ির সংসারের প্রতি। তার পূর্বলালিত সংস্কার, সতীত্ব-পত্নীত্বের ধারণা এবং আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্কের প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল এ বন্ধনের ভিত্তি।* এ বন্ধন কেটে বেরিয়ে আসা তার নিজের বিশ্বাসের কারণেই তার পক্ষে সহজ ছিল না। কুমুর বন্ধনমুক্তি তাই প্রায় অসম্ভবের সাধনাই হয়ে উঠেছিল।

অনেকের ধারণা, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর দাম্পত্যজীবনে উদ্ভূত সঙ্কট, স্বামীর ঘরসংসার ছেড়ে পিতার কাছে এসে থাকার বাধ্যবাধকতা এবং সে সূত্রে সৃষ্ট সমস্যা ও জটিলতা পিতা ও কন্যা উভয়ের জন্যই প্রচণ্ড অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের রক্ষণশীল রীতিনীতির জন্য অবমাননাকর দাম্পত্যসম্পর্কের বন্ধন থেকে কন্যাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা সফল হয় নি। আরো একাধিক উপন্যাসের মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রচলিত দাম্পত্যসম্পর্কের রীতিনীতিগত ভালো-মন্দ, মানবিক-অমানবিক চরিত্র কি নতুন করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর পারিবারিক ট্রাজেডির প্রেক্ষাপটে ? যেজন্য এ সমস্যার প্রতিফলন উপন্যাসে ?

এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ দাম্পত্যসম্পর্কের পবিত্রতা, সেক্ষেত্রে পুরুষ ভূমিকার প্রাধান্য, সমাজে ও নারী-পুরুষের মনে এ সম্পর্কে বিরাজমান অন্ধ সংস্কার, অচল বিশ্বাস এতই ব্যাপক ও গভীর ছিল যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যার যার মতামত ও বিশ্বাস তুলে ধরেছেন, প্রতিক্রিয়াও বাদ পড়ে নি। পুরুষ বা স্বামী অন্যায় করলেও তাকে অমান্য করা চলে না, ত্যাগ করা তো দূরের কথা— কুমুর জা মোতির মা এমন অচলা বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দিকে বিপ্রদাসের যুক্তি ও বক্তব্য স্ত্রীর 'সতীলক্ষ্মী' ধারণার বিপরীতে ব্যক্তি-নারীর মর্যাদা ও মান-অপমানবোধের গুরুত্ব বড় করে তুলে ধরেছে।

কুমুর কথায় অবশ্য সমাজে প্রচলিত ধারণা এবং নারী মানসে নিহিত অন্ধ সংস্কারের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে— 'দাদা, তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে।' এটাই ছিল তখনকার সমাজবাস্তবতা, এমন কি অনেকটা এখনো, এই একুশ শতকেও। সমাজমানসে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল বাস্তবতা লক্ষ করেও অবমাননা ও আঘাতের শিকার কুমু এক ধরনের নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে পিত্রালয়ে দাদার আশ্রয়ে চলে এসেছে। কুমুর গৃহত্যাগ সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যধর্মের অমানবিক চরিত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না হলেও প্রতিবাদ তো বটেই।

কুমুর কালবিচারে প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ মধুসূদন ঘোষালের 'বড় বউ' কুমুদিনীর পক্ষে স্বামীর আচরণের প্রতিবাদে স্বামীর ঘর ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে আসা অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা কুমুর মানসিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। এ ঘটনা ছোট করে দেখা ঠিক নয়। তাই 'যে বিদ্রোহ অর্থবহ সে বিদ্রোহ সামন্ত সমাজের মেয়েতে সম্ভব ছিল না' (সত্যেন্দ্রনাথ রায়)— এমন মন্তব্যের জবাবে বলা চলে যে তার কালের বাস্তবতায় বিদ্রোহ সম্ভব না হলেও কুমুর গৃহত্যাগের প্রতিবাদ সরল নারীর প্রতিবাদ হিসাবে বিবেচ্য। কুমু 'সবলা নয়'— এমন মূল্যায়ন দ্বিতীয় বিবেচনার দাবি রাখে।

পাশাপাশি একথাও সত্য যে কুমুর উল্লিখিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও অর্থাৎ পিতৃগৃহে ফিরে আসার পরও বিপ্রদাসের কথার জবাবে সংস্কার বর্জনের প্রশ্নে কুমু প্রচলিত ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে বলে : 'সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি।... গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভেতরেই। দুঃখ থেকে আমাদের বাঁচাবে কে ? সেই জন্যেই ভাবি দুঃখ যদি আমাদের পেতেই হয় তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।'

কুমুর এ বক্তব্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুনতে পাই। আবার একথাও ঠিক যে কুমুর এ স্বীকারোক্তিতে যেমন তখনকার সামাজিক অবস্থার স্বরূপ ফুটে উঠেছে বিশেষ করে মেয়েদের রক্ষণশীল মানসিকতা প্রসঙ্গে, তা একালেও সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীমানসের ক্ষেত্রে সত্য, বিশেষ করে ধর্মকে আশ্রয় করার প্রসঙ্গে। তাই বলে কি ঐ অন্যায় সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে না ? না দাঁড়ানো তো আপোসবাদিতার লক্ষণ। প্রতিকূল অবস্থা বিনা লড়াইয়ে মেনে নেওয়া তো আত্মসমর্পণের সামিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কবিতার রবীন্দ্রনাথ ও উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এদিক থেকে প্রভেদ যথেষ্ট। কিন্তু কেন ? এ প্রশ্নের জবাব রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু উপন্যাস পাঠকের সান্ত্বনা এইখানে যে সমাজে প্রচলিত সংস্কারবাদের চেহারা তুলে ধরার পরও কিংবা নারীমানসে ধর্মাশ্রয়ী সংস্কারের গভীরতার কথা উল্লেখ করেও কুমু তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয় না। স্বামীগৃহে ফিরে না যাবার সিদ্ধান্তে সে অটল থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত টেকে না। টেকে না কুমুর অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণেই নয়, এ ঘটনা উপলক্ষে দুই পুরুষব্যক্তিত্বের আপোসবাদিতার কারণে। প্রথমত কুমুর দাদা বিপ্রদাস, দ্বিতীয়ত কুমুর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ— এরা দুজনেই প্রায় জোর করে অর্থাৎ কুমুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মধুসূদনের ঘরে যেতে বাধ্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপর্ব অবধি নারীস্বাধিকারের প্রশ্নে দোটানার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো তা সমাজ বাস্তবতার যুক্তিতে, কখনো নারীবিষয়ক তার কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনে (যেমন মাতৃত্বদায়)। নারীর শারীরবৃত্তিক সমস্যা কিংবা তার 'জীবপালিনী' ভূমিকার গুরুত্ব ইত্যাদি তত্ত্বের ছায়ায় তিনি নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন সত্তায় দেখতে চেয়েছেন যেখানে অংশত হলেও নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। সংস্কারের 'তলানিটুকু চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেন নি' রবীন্দ্রনাথ— এ অভিযোগ সত্য। তাই কুমু প্রতিবাদী হয়েছে, বিদ্রোহী হতে পারে নি।

পাঁচ

অবশেষে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, কারণ একই— অন্তঃসত্তা নারীর সন্তানের পিতৃপরিচয় বা লালনপালন ইত্যাদি। কুমুর ক্ষেত্রে মধুসূদন যা চেয়েছিল তাই ঘটেছে। কুমুকে মাতৃত্বে পৌঁছে দিয়ে তার জন্য ঘরের বাঁধন কঠিন করে তোলাই ছিল মধুর অভিপ্রায়, সে জানত সংস্কারে বাঁধা মন কুমু এ বন্ধন কেটে ফেলতে পারবে না। মধুসূদনের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে তাই কুমুদিনীকে স্বামী মধুসূদনের অধিকারের গহ্বরে ফিরে যেতে হলো। মাতৃত্ব উপলক্ষ, আপাত-যুক্তি; সে যুক্তি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মনে বাঁধা ছিল, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কিন্তু যুগলালিত সংস্কারই যে বড়, পুরুষের আধিপত্যবাদী প্রতাপের কাছে অসহায় নারী যে আপোসের পক্ষে, আত্মসমর্পণের পক্ষে যুক্তি তৈরি করে লেখক তার প্রমাণ হিসাবে হাজির করেছেন মোতির মা'কে। মোতির মা তার সংস্কারবাদী বিশ্বাসের জগৎ থেকেই কথা বলেছে, কুমুকে মান-অপমান জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য জোর করেছে। বলেছে 'কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট করে, তারপরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই।'

কুমুর প্রসঙ্গেই নয়, নিজের সমস্যা সম্পর্কেও তার ব্যবস্থাপত্রের তত্ত্ব-দর্শন-চিন্তা ভিন্ন নয়। তার চিন্তায় 'ভাশুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। ভাশুর অন্যায় করতে পারে, কিন্তু তাকে অপমান করা চলে না। কুমুর প্রতি স্বামীর ব্যবহার যেমনই হোক তাই বলে কুমু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, একথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টি ছাড়া।' মান্ধাতা আমলের এ সংস্কার নারীর মধ্যেই প্রবল এবং সেখানেই বিপ্রদাসের আপত্তি। এ কথা তাই সঙ্গত যে নারীর ব্যক্তিসত্তার দুর্দশার জন্য পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মমতা ও অত্যাচার-অনাচার যেমন দায়ী তেমনি দায়ী নারীর দুর্বলতা, তার অন্ধ সংস্কার, সংস্কারের প্রতি আচ্ছন্নতা।

সংস্কারের গভীর ও বিপুল প্রভাব লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে কৃষক নেতা কৈলাশের জবানিতে বলেছেন— 'পোড়া সংস্কারের ছাই গাদাতেও... চারা গজায়, বিশ্বাসের পোড়া ডালে গজায় নতুন পাতা।... কী অভিশাপই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে... যুগযুগান্তর ধরে।' ধর্মীয় বিশ্বাসজাত এ সর্বব্যাপী সামাজিক সংস্কারের কঠিন বন্ধন কুমুদিনীর দ্বিতীয় বন্ধনকে তার জন্য কঠিনতর করে তুলে তাকে মাথা হেঁট করে অনাচারী স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। মাতৃত্ব উপলক্ষ মাত্র, যদিও রবীন্দ্রনাথ তার সংশ্লিষ্ট রচনায় তত্ত্ব হিসাবে মাতৃত্বের ওপর, এর দায়বদ্ধতার ওপর, এর পবিত্র ঐতিহ্যের ওপর অসাধারণ মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে সময় ভুলে গেছেন কন্যা মীরার কথা বা অনুরূপ অন্যদের কথা।

কুমুর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং কুমুর বন্ধন মেনে নেওয়ার পক্ষে নানা ধরনের যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় উপন্যাসের সময়-পর্বের কথা— 'কুমুর সময়ে কুমুর সমাজে ঐ সমস্যার কোনো সমাধান ছিলও না' (সত্যেন্দ্রনাথ রায়)। অর্থাৎ কুমুর নিজ ঘরে ফেরা 'কালের বিবেচনায় অসত্য হতো, অবাস্তব হতো। নায়িকা কুমুর স্বভাবের দিক থেকেও তা সত্য হতো না, প্রথমাবধি লেখক কুমুকে একটা ভিন্ন ভাবলোকের রমণী করে এঁকেছেন— সে সবলা নয়, বিদ্রোহিনী তো নয়ই। যে-বিদ্রোহ এই বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে অর্থবহ সে-বিদ্রোহ সামন্ত-সমাজের মেয়েতে সম্ভব ছিল না' (প্রাগুক্ত)।

সময়পর্বের যুক্তি ও কুমুর মানস গঠনের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, এর দায় পুরোটাই লেখক রবীন্দ্রনাথের। একই সঙ্গের রচনা 'শেষের কবিতা'য় তিনি সমকালের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কুমুদিনী চরিত্র নিয়ে বিশেষ তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সমকাল বর্জন করে অপেক্ষাকৃত অনাধুনিককালের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করা হয়েছে কেন? এর পেছনে কি লেখকের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ উপন্যাসটিকে তিন পুরুষে প্রসারিত করে এপিক রচনার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পরে বিশেষ কারণে যে-ভাবনা বর্জন করতে হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব রবীন্দ্রনাথই দিতে পারতেন।

দ্বিতীয় যুক্তি কুমু অন্তঃসত্তা, সন্তানের স্বার্থেই তাকে ফিরে যেতে হবে স্বামী মধুসূদনের কাছে। তাছাড়া প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় সন্তানের ওপর অধিকার পিতার অর্থাৎ পুরুষের। নারী অর্থাৎ মা সন্তান প্রসব করে তাকে একটা সময় পর্যন্ত লালন-পালনের অধিকারী। কাজেই গর্ভাবস্থায় এবং পরে কিছুটা সময় পর্যন্ত কুমুর পিতৃগৃহে থাকার অধিকার ছিল। সেক্ষেত্রে যে প্রশ্ন সমস্যার জন্ম দেয় তা অর্থনৈতিক। অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমেই কুমুকে স্বামীগৃহে না যাওয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হতো। কুমুর মতো আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নারীর পক্ষে তা অসম্ভব ছিল না। তাছাড়া দাদা বিপ্রদাস তো কুমুকে বলেই দিয়েছিল— 'এ ঘর তোরই ঘর।' এক্ষেত্রে স্বামীগৃহ থেকে দূরে থাকার আরেকটি সমস্যা আইনগত। মধুসূদন নিঃসন্দেহে কুমুকে ফিরিয়ে নিতে আইনের সাহায্য নিত। কুমুর কালে বিবাহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব না হলে কোনো সমস্যাই ছিল না। আসলে সময়টা ছিল কুমুর বিপক্ষে।

এবার কুমুর নিজের ভাবনার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, জা মোতির মা'র সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও কুমু এক কথায় সব যুক্তি নাকচ করে দিয়ে বলেছে, শক্ত করেই বলেছে, 'না যাব না।' অর্থাৎ সে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে না। হতে পারে কথাটা সে জোর দিয়ে বলতে পেরেছে যখন দাদা বিপ্রদাস তাকে বলেছে পিতৃগৃহে কুমুর 'চিরদিন থাকার' কথা। ঠিক এর আগেই মধুসূদন কুমুকে নিতে এলে সংক্ষেপে কুমুর সাফ জবাব— 'আমি যাব না।' পরপর কয়েকবার 'না' শুনে ক্রুদ্ধ মধুসূদন গর্জন করে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাতেও কুমু টলে নি।

মধুসূদন তর্জন গর্জন করে 'দেখে নেব' বলে চলে যাবার পর বিপ্রদাস উদ্ভূত সমস্যা ব্যাখ্যা করে বলেছে— 'সমাজের জোরে আইনের জোরে' মধুসূদন উৎপাত করার চেষ্টা করবে। জানতে চেয়েছে 'কুমু সেসব অগ্রাহ্য করতে পারবে কিনা।' বলেছে 'লোকসমাজের সামনে দাঁড়িয়ে নিন্দের তুফান অগ্রাহ্য করে মাথা তুলে ঠিক থাকতে হবে।' কুমুর নিশ্চিন্ত দৃঢ়তা দেখে বিপ্রদাস বলেছে— 'আমাদের কাল বদল হবে, চালও বদলাবে। থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।' শুনে খুশিতে কুমুর চোখে জল এসেছে।

কিন্তু পরিস্থিতি পালটে যায় কুমুর অন্তঃসত্তা হওয়ার খবরে। কুমুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মধুসূদনের প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণার। স্থির চিন্তার পর প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র। কুমুর বারবার মনে পড়েছে 'মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে কেবল আঘাত করেছে, লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা অশ্লীল।' এখন সে বুঝতে পারছে এ ঘটনায় তার 'মস্ত বড় হার। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হওয়ার বীভৎসতা তাকে বিষম পীড়া দিতে থাকল।' আর সে জন্য হয়তো কুমু এ বন্ধন ছিন্ন করার উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

এ অবস্থায় বিপ্রদাসের পূর্বভূমিকার পরিবর্তন বিস্ময়কর। যে-বিপ্রদাস কুমুর মাতৃত্ব সংবাদ জানার আগে বারবার কুমুকে সব কিছু শুনে অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বামীগৃহে ফিরে যেতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছে, বলেছে— 'কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি। ও বাড়িতে যাওয়া তোর যাওয়া চলবে না।' বলেছে, 'অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবিনে' কিংবা মোতির মা'র উদ্দেশে বলেছে 'অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হতো।... কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর মোতির মা যখন ভেবেছে, 'মেয়েজাতের এত গুমর কেন ? মধুসূদন যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে ?' তখন বুঝতে কষ্ট হয় না সনাতন রক্ষণশীলতার যুগ যুগ সঞ্চিত চাপ নারীত্ব চেতনাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ঐ এক জায়গায় 'পুরুষ নারীর চেয়ে বড়' কথাটা যেন রবীন্দ্রনাথেরই, অন্তত শারীরতাত্ত্বিক বিবেচনায়। যাই হোক মোতির মা'র পক্ষেই তাই বলা সম্ভব, 'একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।' জবাবে বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণ মন্তব্য : 'যেতে হবেই একথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।' এমনকি অবশেষে বিপ্রদাস কুমুর দ্বিধা ও অস্বস্তির কারণ বুঝে নিয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বলেছে, 'আমি কোন প্রাণে তোকে নির্বাসিত করে থাকব ? যদি আমার ছোট ভাই হতিস তাহলে যেমন করে থাকতিস তেমনি করেই চিরদিন থাক না আমার কাছে।' সব শুনে মন ঠিক করে নেয় কুমু।

আর সেই বিপ্রদাসই কিনা কুমুর গর্ভাবস্থার কথা শুনে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলতে পেরেছে কুমুর নয়া বন্ধনের সমস্যার কথা, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, 'সন্তান কোলে নিয়ে ওখানে কুমুর মন ভরে ওঠবে।' এমন কি একথাও বিপ্রদাসেরই : 'তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্ধায় ?' বিপ্রদাসের এমন যুক্তি ধোপে টেকে না। তাছাড়া যে-বিপ্রদাস জমিদার হয়েও সামন্ত মূল্যবোধ দূরে সরিয়ে রেখে নারীস্বাধিকারের পক্ষে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের পক্ষে কথা বলেছে, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি প্রথার অবসান ঘটার সম্ভাবনা মাথায় রেখে যুগ পরিবর্তনের কথা এবং নিজেদের গরিবি হালে চলার কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছে, যে মানুষ দেবতা মানে না, প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরোধী, তাকে আধুনিক চিন্তার মানুষ বলে গণ্য করতে হয়, যুগসন্ধির হয়েও যুগের অগ্রবর্তী সময়ের মানুষ হিসাবে ভাবতে হয়। তার অধিকাংশ কথা— বিশেষত সমাজ, নারীমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য যেখানে সনাতন মূল্যবোধ ও সামন্তবাদী ধ্যানধারণা অতিক্রম করে গেছে— সে সবই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথার প্রতিধ্বনি। সেক্ষেত্রে কুমুকে অসম্মানের বোঝা বহন করে নিছক সন্তানের উপলক্ষে স্বামীগৃহে ফেরার উপদেশ শুধু অবিশ্বাস্যই মনে হয় না, খাপ খায় না তার পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে বা তার আধুনিকবোধের সঙ্গে। স্বভাবত মনে হয় বিপ্রদাসের কথায় রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক মাতৃত্ব ভাবনাই এক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কুমুর অবাঞ্ছিত গর্ভের সন্তানসহ স্বামীগৃহে অবস্থানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। সম্ভাব্য বিকল্প পন্থা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তা কি সমাজের মুখ চেয়ে ?

কিন্তু বিকল্প পন্থা যে ছিল না এমন তো নয়। সে পন্থা কুমুর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার, সন্তান প্রসবের পর আবার পিতৃগৃহে ফিরে নতুন জীবনযাত্রা কি ঐ কালের বিবেচনায় একেবারেই অসম্ভব ছিল ? মধুসূদনের সংসারে দূষিত আবহাওয়ায়, স্বামীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসী হিসাবে বসবাসের চেয়ে শ্রমসাধ্য কষ্টকর জীবনযাপনই তো কুমুর পক্ষে বাঞ্ছিত হওয়ার কথা। তাতেই তার ব্যক্তিসত্তার মুক্তি, মুক্তি অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে। নিঃসন্দেহে এ বন্ধনমুক্তিই কুমু তার অনুভব ও অভিজ্ঞতার শেষপর্বে এসে আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করেছে। তা না হলে তার শেষ আশ্রয় দাদা বিপ্রদাসের মুখে হঠাৎ করেই অভাবিত প্রস্তাব শোনার পর, বিশেষ করে অদূর ভবিষ্যতে দাদার আর্থিক ঋণমুক্তির সম্ভাবনার কথা শোনার পর কুমু বলতে পারত না 'দাদা, সেই দিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' শেষ মুহূর্তে কুমুর এ সংকল্প ও মানসিক দৃঢ়তাও বিস্ময়কর। তেমনি বিস্ময়ের তার ব্যক্তিসত্তার মুক্তি কামনা।

কিন্তু কী সে অমূল্য ধন যা সন্তানের চেয়েও বড় ? নিঃসন্দেহে তা সতীত্ব-পত্নীত্ব বা দাম্পত্যধর্ম নয়, তা নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, নারীর নারীত্ব যা একালে নারীবাদীদের বহুল-আলোচিত বিষয়। কুমু ঐ সত্যের টানেই মধুপ্রাসাদের কুঠুরি থেকে মুক্তি অর্জনের কথা সগর্বে প্রকাশ করেছে, তার 'কুমু' হওয়ার কথা স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করেছে। বিপ্রদাসকে অবাক করে দিয়েছে *এক অচেনা কুমু যে তার পূর্বলালিত সতীত্ব ভাবনা, দাম্পত্যভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই সঙ্গে অস্বীকার করেছে মহামূল্যবান মাতৃত্বকে, যে মাতৃত্ব তার আত্মিক সঙ্কটের কারণ।* এ সঙ্কটের কারণে তার আত্ম অন্বেষা, আত্মআবিষ্কারের চেষ্টা।

মুক্তিকামী কুমু তার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্য প্রকাশ করেছে দাদার কাছে, অঙ্গীকার করেছে মধুসূদনকে মুক্তি দিয়ে নিজের মুক্তি ও অধিকারের স্বাধীনতা অর্জন করার। কিন্তু তার কথায় মুক্তি অর্জনের পরবর্তী জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিকনিশানা নেই, যা আছে তা রোমান্টিক ভাববাদিতা অন্য অর্থে ভক্তিবাদিতা। আর সে ভক্তিবাদিতার প্রকাশ তার আলো-আঁধারের হেঁয়ালি বক্তব্যে : 'সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর।' সব গিয়েও কী বাকি থাকে, ভক্তি ? এবং ভক্তিতে মুক্তি ? যা কুমুর বিবাহপূর্ব জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কারে মিলেমিশে আছে। এর পরের কথাটা আরো দুর্বোধ্য, আরো জটিল এ কারণে যে ঐ ঠাকুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নিয়েই কুমু বলেছে : 'দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে একথা বুঝতে পেরেছি।' তাহলে কি 'তুমি আমার আছ' বিশেষ করে 'আমার' কথাটা বিপ্রদাসকে ঘিরে কুমুর অর্থনৈতিক নির্ভরতার সূচক, না তার ভক্তিবাদের নিশ্চয়তার প্রতীক ? বিপ্রদাসের শিক্ষায়ই তো কিশোরী-যুবতী কুমুর মানসিক বিকাশ দৈবদেবতা ও ভক্তিবাদী বিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু কাহিনীভাষ্যে দেখা যায় বিপ্রদাস ঠাকুরদেবতায় অবিশ্বাসী, প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরোধী যদিও শুদ্ধ ভাববাদিতার একখণ্ড আকাশ তার জীবনে সত্য হয়ে আছে। এ বিপ্রদাস রবীন্দ্রনাথের মানসচরিত্রের প্রতিচ্ছবি, যেমন গোরা, যেমন নিখিলেশ। আর কুমু এ বিপ্রদাসের *যোগ্য* শিষ্যা। তার মধ্যেও দুই ধারার বৈপরীত্য বাস্তব সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জন্যই কি এত আঘাত, এত যন্ত্রণার পরও কুমু নতুন করে একদিকে বিত্ত বৈভবের সঙ্গে যুক্ত অনাচার ও দূষিত জীবনবোধের অবক্ষয়ী (মুৎসুদ্দি জীবনব্যবস্থার স্বাভাবিক চিত্র) গারদ থেকে মুক্তি চেয়েও ভক্তিবাদের ভাববাদী পরিমণ্ডলের প্রত্যাশী ? কুমুর আত্মঅন্বেষা এ দুই বিপরীত ধারার সত্যে স্থিত হতে চেয়েছে, এবং বিপ্রদাসও অনেকাংশে দুই বিপরীত চেতনার বৃত্তে আশ্রিত। তাই দুই বিপরীত পথের যাত্রায় কুমুর বন্দিদশা কাটতে পারে না, স্বামীসম্বন্ধ ও মাতৃত্বের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এসেও পরিপূর্ণ মুক্তির (সামাজিক-অর্থনৈতিক) আস্বাদ গ্রহণ কুমুর পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না।

কুমুর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জীবনভর দুই বিপরীত স্রোতে অবগাহনের আত্মিক সঙ্কটে ভুগেছেন, বাস্তবের সত্য ও জীবনের সত্যকে মেলাতে পারেন নি। জীবনবাস্তবতা ও ভাববাদিতা তথা ভক্তিবাদিতার যৌথ প্রভাব চেতনায় একই সাথে লালন করেছেন। কিছু 'অবসেসন' পূর্বাপর তার জীবনযাত্রায় চেতনার সঙ্গী হয়েছে। তাই বিদ্রোহী মৃণাল মীরাবাই-এর অধ্যাত্মিকতায় মুক্তির সন্ধান পেতে চেয়েছে, অংশত হলেও চেয়েছে কুমু, বিবাহপূর্ব জীবনে দাদার সঙ্গে তার আলোচনায় যা স্পষ্ট, স্পষ্ট মীরার ভজনে আকৃষ্ট কুমুর মানসিকতায়। রবীন্দ্রনাথের একাধিক শিল্পসৃষ্টির বাস্তববাদী জীবনসত্যে শেষমুহূর্তে ভক্তিবাদ বা আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা আধুনিক চেতনার অনুকূল ছিল না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের কালপরিসরে এর কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণ বিচার করে বলতে হয় যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী পরিবেশে লালিত মূল্যবোধ যে উঠতি মুৎসুদ্দি পুঁজির মূল্যবোধের প্রবল প্রতাপের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হবে সে সত্য ঐতিহাসিক। তাই দুর্বল জমিদার বিপ্রদাস ও তার বোন কুমুদিনীর মুৎসুদ্দি ধনের দম্ভ ও আধিপত্যের সামনে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে পারার কথা নয়। তবু জীবনের বাস্তবতাজাত অভিজ্ঞতা এমনই শক্তিমান যে এর পরিচর্যায় কুমু পূর্বলালিত ভাববাদের কল্পলোক থেকে ও স্বাপ্নিক আদর্শের সনাতন ধারণা থেকে মাটিতে নেমে এসে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রভেদ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল।

ঐ বাস্তবতার আঘাতেই কুমুর জীবনে শেষপর্যন্ত সনাতন ঐতিহ্যলালিত সতীত্ববোধ, এমনকি বহুকথিত মাতৃত্বমহিমা মিথ্যা হয়ে গেছে। ঘটনার এমনই শক্তি। কাহিনী শেষে কুমু তাই জোর গলায় বলতে পেরেছে 'আমি মুক্তি নেব।... আমি চলে আসবই। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না।' কিন্তু কুমু ভেবে দেখে নি যে গর্ভস্থ সন্তানকে স্বামীর হাতে দিতে গিয়ে স্বামী সংসর্গে বসবাস তার মধ্যে যে নতুন করে মাতৃত্বের আবির্ভাব ঘটাবে না সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এমন নিশ্চয়তা কোথায় ? সেক্ষেত্রে কুমুর মাতৃত্ব ও বন্ধন চিরদিনের বন্ধন হয়ে উঠতে পারে। তাই কুমুর পক্ষে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া তার মুক্তির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সত্য বিপ্রদাস বা রবীন্দ্রনাথ ভেবে দেখেন নি। পিত্রালয় থেকে কুমুর বিদায় আসলেই ছিল শেষ বিদায়। এটা কুমুর জীবনের ট্রাজেডি। তা সত্ত্বেও মাখন বড়াল লেনের মেজবৌ যে বিদ্রোহী মৃণাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পেরেছিল এবং মধুপরিবারের বড় বৌ কুমুদিনী যে 'কুমু' হবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পেরেছে, ভাববাদিতার মিশ্রণ সত্ত্বেও, এ অর্জনের তাৎপর্য কম নয়।

ছয়

সন্দেহ নেই 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর সমকালীন সমাজ মানসে বিরাজমান বাস্তবতার স্বরূপ বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তা যেমন শাস্ত্রীয় বিধিবিধানসম্মত দাম্পত্যসম্পর্ক, সতীত্ব-পত্নীত্বের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছে তেমনি করেছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : নারীচেতনায় মাতৃত্বের প্রভাব এবং ঐ মাতৃত্বের সঙ্গে স্বামী ও ঘরসংসারের সম্পর্কবিচার। সন্তানের সঙ্গে যোগসূত্র শুধু মায়েরই নয়, তার যোগ রয়েছে পিতা, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে। এ জটিলতার মুখে সন্তানের মা কি তার ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বা আত্মঅবমাননার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য ঐ জটিল যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারে ? কিংবা সূত্র ছিন্ন করাটা পরিবার ও সমাজের জন্য কতটা স্বাস্থ্যকর ? রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে এমন কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলেন বলে মনে হয়। হয়তো উপন্যাসের একাধিক খণ্ডে বা 'তিনপুরুষ'-এর বিস্তারে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তা হয় নি।

বর্তমান পরিসরে যা পাওয়া গেছে তাতে কুমুর বন্ধনমুক্তির বাস্তবতা কিছুটা অস্পষ্টই থেকে গেছে। দুই সংস্কৃতি ও দুই বিপরীত মূল্যবোধের সংঘাতের পরিণামে অন্তঃসত্তা কুমুর স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা এবং সেখানে ফিরে না যাবার দৃঢ় ইচ্ছায় যে মুক্তির বাসনা প্রতিফলিত সে মুক্তির স্বরূপ ও পরিণতি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। বিপ্রদাসের ইচ্ছা ও পারিবারিক সমস্যার প্রতি সম্মান জানিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে নারী জোর গলায় বলতে পারে— 'মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না।... আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন।' এ ঘোষণায় কুমুর মুক্তি অর্জনের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা এবং সেই সঙ্গে সবলা নারীর দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু কুমু যে-মুক্তি চেয়েছে তার স্বরূপ কী, তার সমাপন কীভাবে সম্ভব ? সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দেন নি। যেটুকু বোঝা যায় তাতে বিপ্রদাসের কাছে ফিরে আসার চিন্তাই কুমুর ছিল বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে এমন প্রশ্ন ওঠেছে যে মুৎসুদ্দি সমাজ ব্যবস্থা থেকে সামন্তবাদী পরিবেশে আশ্রয় নেওয়া কি মুক্তির নিশ্চিন্ত ঠাঁই হতে পারে ? এ প্রশ্ন অর্থহীন এ কারণে যে কুমু এ পরিবারেরই মেয়ে— এখানকার পরিবেশ সামন্তবাদী অনাচারে চিহ্নিত নয়। প্রশ্নটা বরং অন্য মাত্রার।

সেক্ষেত্রে বিপ্রদাসের আশ্রয়ে ফেরাই শুধু নয়, কুমুর মুক্তির একমাত্র শর্ত তার অর্থনৈতিক মুক্তি অর্থাৎ মধুসূদনের ঘর থেকে এসে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতি বিচারে কুমুর পক্ষে তা কতটা সম্ভব ? বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে দাদা বিপ্রদাসের সমর্থন ও সহযোগিতা অপরিহার্য। কুমুর স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় মধুসূদনের কাছে ঋণগ্রস্ত বিপ্রদাসের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঋণমুক্তির পর তা সম্ভব বলেই বিপ্রদাস 'স্বাধীন হওয়ার' কথা কুমুকে বলেছিল। সে কথা শুনে কুমুও বলেছিল তাকে 'স্বাধীন করে নেওয়ার' কথা। কাজেই কুমুর মুক্তির পথ নিশ্চিত হয়েই থাকল— কুমু তার বন্ধন কেটে ফিরে আসতে পারবে কিনা, পরাক্রমশালী স্বামীর গণ্ডি থেকে সেটাই বড় কথা। ফিরে আসতে পারলে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন কুমুর পক্ষে একেবারে অসাধ্য হতো না। তাই কুমুর বন্ধনমুক্তির প্রশ্নে সামন্তবাদ মুৎসুদ্দি ধনবাদের তুলনামূলক বিচার যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না; অন্তত কুমুর এ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে মনে হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘শেষের কবিতা’
রোমান্টিক প্রেমের দ্বৈতরূপ

‘যোগাযোগ’-এর সমকালে লেখা কাব্যধর্মী উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’, অথচ এ দুইয়ে কী তফাত! দুটো উপন্যাসই রবীন্দ্রনাথের ‘সাতষট্টি বছর বয়সে লেখা’। কিন্তু দুটোতে কাহিনীর সময়-পরিসর ভিন্ন, এছাড়াও দুয়ের মধ্যে কাহিনীচরিত্রে অনেকটা পার্থক্য। প্রভাতকুমারের ভাষায় ‘যোগাযোগের পটভূমি আধুনিক নহে।’ কিন্তু ‘শেষের কবিতা’র পটভূমি অত্যন্ত আধুনিক। তাই বিষয়বস্তু, নরনারীর চরিত্ররূপ, এমনকি রচনাশৈলীও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই সময়ে দুটো বিপরীতধর্মী উপন্যাস লেখার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে যোগসূত্র যে একেবারে নেই তা নয়, দুটোতেই রবীন্দ্রনাথ তার নারীভাবনার দুই ভিন্নতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। একটিতে নর-নারীর সনাতন দাম্পত্যসম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট বিষয় কাহিনীর উপজীব্য হয়ে উঠেছে, অন্যটিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় দুই নারীতত্ত্বের বিশেষ একটি দিক আর আধুনিক প্রেমের এক পরীক্ষামূলক চরিত্র।

AMARBOI.COM

‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে উঠতি মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বিত্তবান প্রতিনিধি মধুসূদন চেয়েছে বিত্তের জোরে স্ত্রী কুমুদিনীকে তার অন্দরমহলে বেঁধে রাখতে। যতটা না গৃহলক্ষ্মী রূপে তার চেয়েও অনেক বেশি যৌনকামনার সঙ্গী ও ভোগ্যসামগ্রী রূপে। কুমু সে বন্ধন মেনে নিতে চায় নি। এ ক্ষেত্রে মধুসূদনের বিত্তের জোর ছিল ঠিকই কিন্তু চিত্তের জোর তথা হৃদয়ের জোর, যাকে বলা যায় প্রেম, তা ছিল না। তাই বেঁধে রাখার কাজটা মধুসূদনের জন্য সহজ ছিল না। তাদের জীবন যাত্রার পদে পদে দেখা দিয়েছে সংঘাত, অবশেষে সঙ্কট এবং বিচ্ছিন্নতা, যদিও তা সাময়িক।

শেষপর্যন্ত ঐ বিত্তের প্রতাপেই স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে মধুসূদন যদিও উপলক্ষ ছিল কুমুর মাতৃত্ব। এ কারণে কুমুর অভিভাবক তার দাদা বিপ্রদাস হার মেনেছে। মুৎসুদ্দি মূল্যবোধের প্রকাশ নারীর ব্যক্তিসত্তাকে, তার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাকে দলিত ও পীড়িতই করে নি, তাকে শোষণ করেছে দেহের ও মনের দিক থেকে। অসহায় কুমু আধিপত্যের এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসেও নিষ্কৃতি পায় নি (যদিও রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার নায়িকা বালবিধবা মঞ্জুলিকা ঠিকই মুক্তি আদায় করে নিয়েছিল রক্ষণশীল পিতার কৃত্রিম বন্ধন থেকে। প্রেমিক পুলিনকে বিয়ে করে সে পিতৃগৃহ ছেড়েছিল)। কুমু যে মুক্তি পায় নি তার কারণ তার দাদা বিপ্রদাসের দিক থেকে শেষ মুহূর্তের আপোসবাদিতা, মধুসূদনের বিত্তের জোর সেখানে কাজ করেছে, এবং সেই সাথে সমাজের নীতিগত ও আইনগত বাধাও বিবেচ্য বিষয় ছিল।

কিন্তু লাবণ্য আধুনিক যুগের নায়িকা; শিক্ষিত, রুচি ও বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ব্যক্তিত্বময়ী। তুলনায় কুমুর ব্যক্তিত্ব ততটা জোরালো ছিল না। তার চেয়ে বড় কথা লাবণ্য আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর যা কুমু ছিল না। অবশ্য পূর্বোক্ত নায়িকা কুমুর কাল থেকে ইতোমধ্যে সময়ের ব্যবধানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সমাজে, ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। নারীসমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ইতোমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে বুদ্ধি ও মেধাদীপ্ত এলিট উপ-শ্রেণীর (তা যত ছোটই হোক) বিকাশ সেখানে উচ্চশিক্ষার যেমন উপস্থিতি তেমনি এসেছে পাশ্চাত্য আধুনিকতার স্পর্শ। মননশীলতার বিকাশ তরুণ-তরুণীদের মনোজগতে, ভাবনার জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছে। কুমু ও লাবণ্যের মধ্যে তফাতটা এই পরিবর্তনের ভিত্তিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বিশেষ সময়পর্বে উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পে যেসব নায়িকার আবির্ভাব তারা কাহিনীপটের ভিন্নতায় ভিন্ন হলেও, তাদের সামাজিক বা ব্যক্তিদ্বন্দ্বের স্বরূপ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে সময় বিচারে, কাহিনী বিচারে ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ করার মতো, অন্তশ্চেতনার দিকটাও তেমনি। কুমুর কথাই ধরা যাক। আধুনিক কালের চেতনা নিয়ে পূর্ববর্তী সময়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হলেও চরিত্রচিত্রণে বিশেষ করে নায়িকাচরিত্র সৃষ্টিতে ঐ আধুনিকতার ছাপ ঠিকই পড়েছে। কুমুদিনী তাই তার কালের নারী ও নায়িকা হয়েও নারীত্বের দাবি নিয়ে অগ্রবর্তী কালের প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক 'কুমু' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে, যদিও তার শেষরক্ষা হয় নি। হবার কথাও নয়।

এ পর্বের উপন্যাস বা নাটকে নর-নারীর দ্বন্দ্ব এক রকম নয় বলে তাদের চরিত্রধর্মের প্রকাশও ভিন্ন। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুবাদে। বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রকৃতির এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার নর-নারী ও তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পরিচিত হতে পারার কারণে অভিজ্ঞতার চরিত্র ভিন্ন, মননধর্মিতার দিক থেকেও তার প্রকৃতি ভিন্ন। সবচেয়ে বড় কথা ঐসব অভিজ্ঞতায় আধুনিক চেতনার উপস্থিতি। বিদেশী আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনার সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেতনার প্রকাশ যা পূর্বধারার থেকে আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই কুমু যেমন লাবণ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের, তেমনি প্রায় সমকালের হয়েও অন্যান্য নায়িকারা একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী তাই আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েও ঘটনা বৈচিত্র্যে যেমন 'শেষের কবিতা' বা 'বাঁশরী' থেকে আলাদা তেমনি স্বাভাবিক নিয়মেই চরিত্রধর্মেও লাবণ্য বা বাঁশরীর সঙ্গে এক পর্যায়ের নয়। এদের অন্তর্দ্বন্দ্বও ভিন্ন প্রকৃতির। তবে এদের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র একটাই যে এরা সবাই নিজ নিজ প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগচেতনার প্রতিভূ। নারীস্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে এদের কণ্ঠস্বর সাধারণভাবে এক হলেও সমস্যা বিচারে এদের ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া পরস্পর থেকে আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় নর-নারীর প্রেম যে জন্য রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রিক নারীভাবনা ঐসব রচনায় বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্ত্বেও 'যোগাযোগ' ও কুমু আপন বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত রচনা ও নায়িকাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

উল্লিখিত কারণে, সন্দেহ নেই, এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা মূলত তরুণ-তরুণীর প্রেম ধারণার বিষয়ে। সেখানে নারীর অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব (যা কুমুর বন্দিদশার অন্যতম কারণ) সমস্যা তৈরি করতে এগিয়ে আসে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মিসেস স্যাংগারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৯২৫) যদিও নারীস্বাধিকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং নিঃসন্দেহে এ ভাবনার প্রভাব 'যোগাযোগ'-এ পড়ার কথা, তবু এর তাৎপর্য সমকালে সৃষ্ট নারীচরিত্রের মনোজাগতিক দিকে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে নি বলেই কি কুমুর অসহায়ত্ব তার স্রষ্টার মনোযোগ যথেষ্ট মাত্রায় টানতে পারে নি? কিন্তু নন্দিনী, লাবণ্য বা বাঁশরীদের সমস্যা ভিন্ন। তদুপরি তারা চিন্তায় ও কাজে সপ্রতিভ, আধুনিক। প্রেমের বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আধুনিক সময়ের সামাজিক ধারণার সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে লিপ্ত। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আপাতবিচারে আধুনিকতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় নি ঠিকই। তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব-'অবসেসন' নিয়েই এসব ক্ষেত্রে প্রায়শ তাঁর দুই নারীতত্ত্বের ধারণা আরোপ করেছেন পরীক্ষামূলকভাবে। তাতে কাহিনী কখনো সার্থকতায় পৌঁছেছে, কখনো তা বায়বীয় ভাবালুতায় নিঃশেষ হয়েছে। অন্যত্র এ সম্পর্কে তার ভিন্ন তত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে।

দুই

'শেষের কবিতা' প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে নবাগত আধুনিক চেতনার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক প্রতিক্রিয়াজাত আধুনিকতার উন্মোচন বলেই এ উপন্যাসের শাব্দিক দীপ্তি আকর্ষণীয়, চরিত্রগুলোতে আধুনিককালের নানামাত্রিক প্রকাশ হালকা চালে ধরা পড়েছে। নায়ক-নায়িকার সংলাপে ঝরনার মতো দ্রুতগতি, স্বচ্ছন্দ গতি; সেখানে মাঝেমধ্যে মননশীলতার রোদের ছটা পাঠকমনে মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। এক সময়কার মুগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ পাঠক 'শেষের কবিতা'র কাব্যিক মাধুর্যের সঙ্গে মিলানো 'মিতা', 'বন্যা', 'অনন্যা' এবং অনুরূপ রোমান্টিক কথার জাদুতে প্রেমের পাঠ নিতে চেষ্টা করেছে। এসব কারণে 'শেষের কবিতা'র ভাবালুতা ও কাব্যময় উচ্ছ্বাসকে উপন্যাস-চরিত্রের গভীরতায় গ্রহণ করতে দ্বিধা, সংশয় প্রকাশ করেছেন একাধিক সুধী সমালোচক।

তা সত্ত্বেও দেখা যায় 'শেষের কবিতা'র ঝকঝকে হালকা চালের আপাত-চপলতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ভাষ্য রচনা উপলক্ষে তার দুই নারীতত্ত্বের ভিন্ন এক উদ্ভাস তুলে ধরেছেন যা ঐ কাহিনী ও চরিত্রগুলোর সঙ্গে অস্বাভাবিক মনে হয় না। বাস্তবজগতে এর ব্যবহারিক রূপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র আকাশী ভাববিলাসিতায়, এর রোমান্টিক রূপমাত্রায় এর অবাস্তবতা শৈল্পিক মাধুর্যে ঢাকা পড়ে যায়। মনে হয় না রূপকথার নায়ক-নায়িকাদের কাব্যচর্চার ভাবরূপ এঁকে তোলাই এ কাব্য-উপন্যাসের লক্ষ্য। বরং গৌণ হলেও নায়ক-নায়িকাদের কথায়, কাজে ও জীবনাচরণে সমকালীন আধুনিকতার কিছু না কিছু সামাজিক প্রতিফলন রয়েছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও অনুরূপ নায়িকাদের চরিত্র বিচারে সহজেই বোঝা যায় এরা কুমু বা বিনোদিনী নয়, এরা কালের উপযোগী আধুনিক চেতনার অধিকারী, এদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে মনে রাখা দরকার যে এরা সবাই কমবেশি সমাজের এলিট শ্রেণীভুক্ত না হলেও অন্ততপক্ষে পরিশীলিত মননশীল মধ্যশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রেম নিয়ে মননশীল বিলাসিতা এদের পক্ষেই মানানসই। তবে একথাও সত্য যে সমাজের এ শ্রেণীতে নারী সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রী নয় এবং সতীত্বচেতনা এদের মাথাব্যথার কোনো কারণ হয়ে ওঠে না। বরং এদের চোখে সতীত্বের সংজ্ঞা গেছে বদলে। স্বভাবতই প্রেমের অর্থ এবং তাৎপর্যও সেই সঙ্গে পালটে গেছে। প্রেম বিয়ের পূর্বশর্ত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে প্রেমের অর্থ সবসময় বৈবাহিক মিলনের বন্ধন নয়।

তাই প্রাকবিবাহ প্রেমের মতোই বিবাহোত্তর প্রেম যেমন অবাস্তব নয় তেমনি তা নারীর সতীত্ব নষ্ট করে না। অন্যদিকে প্রেম বিয়েতে পরিণতি পেলে ভালো, না পেলেও ক্ষতি নেই। দেহের শুচিতা নিয়ে ধরাবাঁধা রক্ষণশীলতার প্রকাশ এদের কাম্য নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে চান নি। সেজন্য 'শেষের কবিতা'র নায়ক-নায়িকারা দেহের বহিরঙ্গের আবেগঘন সান্নিধ্যে বা মিলনেই সন্তুষ্ট থেকেছে, এমনকি অমিতের মতো উগ্র-আধুনিকও। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা হলেও রক্ষণশীল; ঐ যে আগেই বলা হয়েছে একাধিক নায়িকার চরিত্র বিচারে দেখা যায় রক্ষণশীলতার তলানিটুকু রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেন নি, এমনকি বহু-কথিত আধুনিক পর্বে পৌঁছেও। এসব দিক থেকে একটা সীমারেখা রবীন্দ্রনাথ বরাবর টেনে রেখেছেন। মনে হয় বলতে চেয়েছেন ব্যস, এ পর্যন্তই, আর নয়; অতি-অগ্রসরতা অতি আধুনিকতার নামান্তর যা সমাজবাস্তবতার সঙ্গে মেলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষের কবিতা'য় উপরে উল্লিখিত প্রেমধারণা ও বিবাহধারণার প্রকাশ ঘটেছে নর-নারীর চরিত্রপরিণতির বিচারে। এখানে নর-নারীর ব্যক্তিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব সর্বত্র আদর্শভিত্তিক নয়, নিছক প্রেমের অধিকারভিত্তিক। সামাজিক বিধিবিধান বা সনাতন দাম্পত্য আদর্শের প্রভাব এখানে নেই বললেই চলে। সম্ভাব্য ব্যক্তিসংঘাতই চরিত্র ও ঘটনার পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘটনার ট্রাজিক পরিণতি এড়াতে দুই নারীতত্ত্বের সান্ত্বনা প্রলেপও ব্যবহার করা হয়েছে, যেজন্য অমিত বলতে পেরেছে প্রেম-নির্ভর বিয়ের অভিনব ব্যাখ্যা পরিবেশন করে যে 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল— প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

এমন বিবাহোত্তর প্রেমের ধারণা যত আধুনিক এলিট শ্রেণীতেই হোক, জীবনবাস্তবতার বিচারে সমস্যার জন্ম দেয়। অমিত যতই বলুক 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল'— বাস্তব জীবনে এমন দ্বিচারিতার স্থান নেই। সমাজের বাধা নয়, ব্যক্তির বাধাই সেখানে হতে পারে বড় কথা। এমন বিবাহোত্তর প্রেমের দ্বিমুখী যাত্রা আসলেই অবাস্তব। রোমান্স যদিও অমিত জোরগলায় বলতে চেয়েছে 'আমার রোমান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্তেও ঘটাব রোমান্স।'

রোমান্সের অবাস্তব ভাবকল্পনায়ই দুই নারীতত্ত্বের স্বাপ্নিক ব্যবহার সম্ভব। অমিতের সঙ্গে যখন লাবণ্যের প্রেম বিয়েতে সার্থক হয়ে উঠল না; পূর্বপ্রেমিকা কেতকীকেই বিয়ে করল অমিত, আর লাবণ্য যখন ফিরে গেল পূর্বপ্রেমিক শোভনলালের কাছে— তখন শোভনলাল কি চাইবে নতুন করে অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের প্রণয়-সম্পর্ক ? আর লাবণ্য তো প্রথমে অমিতের দেওয়া আংটি ফেরত দিয়ে বলেছে, 'কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন।' অন্যদিকে 'শ্রীমতী কেতকী'কে অমিত যতই 'বুঝিয়ে বলুক যে তাঁকে কোথাও ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে না' বরং তাদের 'এ মিলনের জন্য কেতকী লাবণ্যের কাছে ঋণী'— তখন কেতকীর পক্ষে এসব ভাববিলাস মেনে নেওয়া অসম্ভবই হওয়ার কথা। দুই নারীতে একসঙ্গে প্রণয় তার সহ্য হওয়ার কথা নয়। পুরুষের পক্ষে প্রেম নিয়ে দ্বিচারণা যত সহজ নারীর পক্ষে ততটা নয়, একালের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবও তা বলবে।

কারণ প্রাক-বিবাহ প্রেমে রোমান্টিকতার ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। কিন্তু বিবাহোত্তর গার্হস্থ্য প্রেম কঠিন বাস্তবের ঠাঁই, সেখানে রোমান্সের অবকাশ নেই, বিলাসী আকাশচারিতারও সুযোগ নেই। 'স্বপনচারিণী'দের চরিত্র স্বাপ্নিক আকাশে বুঝতে পারা যায় না ঠিকই, কিন্তু ঘরে ঠাঁই নিলে তাদের ঠিকই বুঝতে পারা যায় বা বুঝে নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বুঝে নেওয়া জীবন-বাস্তবতার দাবিতে, সেখানে রোমান্সের বস্তাপচা বুলি ঠাঁই পায় না। জোর করে পেতে চাইলে জতুগৃহে লাগে আগুন অথবা অনিবার্য বিচ্ছেদ।

এ সত্য আকাশচারী অমিতের জানা না থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব চেতনার মানুষ শোভনলাল যেমন তা জানে, তেমনি জানা আছে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে হেঁটে অভ্যস্ত পোড়খাওয়া 'গভর্নেস' লাবণ্যর। স্বপ্ন ও বাস্তবের তফাতটা তার ভালোভাবে জানা বলেই হৃদয়ের দাবি মানতে মানতেও বাস্তবতার দাবিই তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। অমিতকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে গভীর বাস্তবচেতনার পরিচয় রেখেছে। যোগমায়ার ক্ষোভ, বিরক্তি অতিক্রম করে সে অনায়াসে বলতে পেরেছে যে অমিতের সঙ্গে তার বিয়ে সুখের হবে না। কারণ অমিত স্বপ্নবিলাসী। তার থেকে ভিন্ন জগতের মানুষ; অমিত তার স্বপ্ন দিয়ে, কথা দিয়ে, মনের মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করেছে তার মনোমত লাবণ্যকে। সেই 'কথা' যখন প্রতিদিনের ঘরকন্নার চাপে ফুরিয়ে যাবে তখন অমিতের মনে হবে এ তো 'নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওর নিজের সৃষ্টি নয়।' তখনই তো সর্বনাশের সূচনা। বিচ্ছেদ তখন অনিবার্য।

বাস্তব চেতনার মেয়ে, ব্যক্তিত্বময়ী নারী লাবণ্য ঠিকই বুঝেছিল, ঠিকই চিনতে পেরেছিল ভাববিলাসী, কবিতাপ্রেমিক অমিতকে। কিন্তু দেরিতে। ততদিনে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ। আর মন দেওয়ার পরিণাম যে 'অনেক মরণে মরা' তা বুঝে নিয়েই সিদ্ধান্ত পালটেছে লাবণ্য। বুঝেছে, অমিতের চোখে বর্তমানের অসাধারণ মেয়ে বিবাহোত্তর জীবনে সাধারণ হয়ে উঠবে। তখন তাকে মেনে নেওয়া অমিতের পক্ষে সহজ হবে না। আর আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ জলে ভাসিয়ে দিয়ে লাবণ্যের পক্ষে সম্ভব হবে না অমিতের সঙ্গে ঘর-সংসার করা।

লাবণ্য তাই যোগমায়াকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছে, 'বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।' লাবণ্য আরো বুঝতে পেরেছিল অমিতের রোমান্টিক, ভাববিলাসী স্বভাববৈশিষ্ট্য। তাই বলেছে, অমিত তার স্বভাব বদলাতে না পারলে লাবণ্যের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্ক টিকবে না। আর স্বভাব পাল্টাতে চাইলে ব্যক্তিও পাল্টায়। তার চেয়ে ভালো প্রেমের স্মৃতি নিয়ে 'স্বপ্ন হয়ে থাকা'। অমিত কেতকীরা যে একই স্বভাবধর্মের মানুষ— অর্থাৎ একই শ্রেণীচরিত্রের, এ সত্যও বুঝতে লাবণ্যর অসুবিধা হয় নি। তাই লাবণ্য বুঝে শুনে সরে এসেছে অমিতের কাছ থেকে। জেনেশুনে বিষপান সবার ধাতে সয় না, সবাই চায়ও না।

তাই বিচ্ছিন্নতার কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অমিতের উদ্দেশে লেখা দীর্ঘ কবিতায় লাবণ্য স্পষ্ট ভাষাতেই বিদায় জানিয়েছে, বিদায় নিয়েছে। বলেছে, 'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।' আরো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে—

'উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্টতই শোভনলালের প্রতি লাবণ্যের পক্ষপাত। অমিতের প্রেম যত তীব্র হোক, তা বড় বেশি রোমান্টিক। তার মনের আকাশে প্রেমের রঙ বদলাতে সময় নেবে না। তুলনায় শোভনলাল বাস্তব জগতের মানুষ; ধীর, স্থির, বিবেচক, সহিষ্ণু মানুষ; শ্রম-নির্ভর কর্মিষ্ঠ মানুষ যে জীবনের ভালোমন্দ বোঝে, মেঘরৌদ্র চেনে, সে লাবণ্যের মতোই ভিন্ন দিক থেকে হলেও পোড়খাওয়া মানুষ। এমন মানুষই জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়ার উপযুক্ত। এমন চিন্তা থেকে লাবণ্য বেসুরো শোনাবে জেনেও অমিতকে লিখেছে—

'যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।'

এখানে এসে অবশ্য পাঠককে মুহূর্তের জন্য থমকে যেতে হয়। স্তব্ধ হয়ে একটু ভেবে নিতে হয়। শোভনকে বেছে নেওয়া কি আত্মবলির তুল্য ? শোভনলালের কাছে 'আপনাকে বলি দিতে' তো লাবণ্যকে কেউ বাধ্য করে নি। শোভনলাল তো নয়ই। সে শুধু শিলং-এ আসা সুবাদে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করে অতীতের কিছু সত্য জানতে চেয়েছে মাত্র। আর তাতেই লাবণ্যের হৃদয়ে ঢেউ উঠেছে, অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে। 'জীবনের এক সময়কার অতিথিকে আজ দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে যেমন বাধা পড়ছে, তেমনি তাকে ত্যাগ করতে বুক ফেটে যাচ্ছে'। লাবণ্য এ আত্মদ্বন্দ্ব, নিজেকে চেনার দায় মেটাতে গিয়ে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তক্ষুণি শোভনলালকে চিঠির জবাবে লিখেছে, 'তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাইনে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহঙ্কারও নেই।' এ চিঠিতে শোভনকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণের কথাই পরিস্ফুট।

কাজেই শোভনলালকে গ্রহণ করা যদি আত্মবলিদান হয়েও থাকে, তবে সে আত্মদান তো স্বেচ্ছায়। সে দায় লাবণ্যর। শোভনলালের কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়। আর নতি স্বীকারের মতো ব্যক্তি লাবণ্য নয়। তার ব্যক্তিত্ব প্রবল। তার গভীর আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা করার জন্যই লাবণ্যর এই বিচক্ষণ পদক্ষেপ, অর্থাৎ শোভনলালকে গ্রহণ, অমিতকে প্রত্যাখ্যান। শোভনলালকে 'তিলে তিলে দান' অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের দান হিসাবনিকাশ করে হলেও তা হৃদয়ের দাবি থেকে উদ্ভূত। তাই অমিতকে সে যা দিয়ে এসেছে ('মৃত্যুঞ্জয় প্রেম') এর বেশি এখন আর লাবণ্যর দেয় নেই। এখন তার বাকি সবকিছু শোভনলালের জন্য।

তবু প্রশ্ন থাকে, শোভনলালের সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্তের পরও যদি লাবণ্য অমিতকে বিদায় ভাষণের চিঠিতে লেখে যে সে 'তার সবচেয়ে সত্য মৃত্যুঞ্জয় প্রেম অপরিবর্তন অর্ঘ্য রূপে অমিতকে দিয়ে এসেছে' তাহলে তো অমিতের এমন দাবির সত্যতাই প্রমাণিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে লাবণ্যর প্রেম দিঘি বা আকাশ হয়ে অমিতের জন্য অক্ষুণ্ন রইল। বিবাহে প্রতিশ্রুত নারীর অন্যপুরুষের জন্য রক্ষিত প্রেম নীতিনৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও দাম্পত্যসম্পর্কে চিড় ধরাবে কিনা এ বাস্তবতা বিচারের বিষয়। তাই এ প্রেম সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাক, সেখানে ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া ঘটাই স্বাভাবিক। লাবণ্যের এ আচরণ দ্বিচারিতা হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার কথা। এ আচরণ প্রচলিত সতীত্ববোধের ওপর নিশ্চিত আঘাত। সেই সঙ্গে নারীর স্বাধীন আচরণের পক্ষে সাহসী অগ্রসর পদক্ষেপ। অর্থাৎ নারী তার প্রেম যেভাবে খুশি বিলিবন্টন করতে পারে, সেখানে সে স্বাধীন।

আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, যে-রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে বা অন্য সময়ে লেখা একাধিক উপন্যাসে পবিত্র দাম্পত্যসম্পর্ক ও সনাতন সতীত্ববোধ রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট নারীচরিত্রকে উজান স্রোতে টেনে নিয়ে গেছেন জীবনবাস্তবতা উপেক্ষা করে— প্রবন্ধে দৃঢ়কণ্ঠে নারীর গৃহলক্ষ্মী ও সেবাপরায়ণা রূপের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, পবিত্র দাম্পত্যসম্পর্কের বিধিবিধান পালনের পক্ষে কথা বলেছেন, নারীর সতীত্বরক্ষার প্রয়োজন গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই কিনা 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে বিবাহিত নারীর প্রেম এবং দাম্পত্যসম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটালেন! অবশ্য এর পেছনে ছিল উল্লিখিত এলিট শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সৃচিত সাহিত্যে আধুনিকতার দাবি, যা রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের জন্য এ কাজ যে মোটেই সহজ ছিল না 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু চরিত্রের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি তার প্রমাণ। কিন্তু একই সঙ্গে 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধেরও প্রকাশ ঘটালেন যা তার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোতে সামান্যই দেখা গেছে। লাবণ্য তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ন রাখার ভাবনায় অনায়াসে তার গভীর প্রেমিক অমিতের সঙ্গে বিয়ের তথা ঘরবাঁধার স্বপ্ন বাতিল করে দিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে অমিতের মন ভাঙবে জেনেও। গ্রহণ করেছে পূর্বপ্রেমিক শোভনলালকে যাকে একদা আপন ঔদ্ধত্যে দূর করে দিয়েছিল। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ লাবণ্য ও অমিতের মধ্যে শ্রেণীসংস্কৃতিগত পার্থক্য (শ্রেণীদ্বন্দ্ব) এবং অমিতের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লাবণ্যের ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির প্রভেদ (ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব)। অর্থনৈতিক বৈপরীত্যের প্রশ্ন বিবেচনায় না আনলেও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল লাবণ্য। তা না হলে অসাধারণ অমিতের পাশে নিজেকে 'নিতান্ত সাধারণ মেয়ে' হিসাবে চিহ্নিত করবে কেন সে? তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে এ অসম সম্পর্ক ভবিষ্যতে সুখের হবে না। সেদিক থেকে শোভনলাল তার সমস্তরের, সমপর্যায়ের, সমশ্রেণীর।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে গিয়ে লাবণ্যকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যা একদিক থেকে দুঃখের, অন্যদিক থেকে স্বস্তির। পুরুষের দিক থেকে আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের মাধুরী মিশিয়ে নারীপ্রেমের পূজামূর্তি গড়া হলে সেখানে যে সত্যের বাস্তবতা উপস্থিত থাকে না, সে প্রেম স্থায়ী হওয়ার কথা নয় একথা লাবণ্যের পক্ষে বুঝে নেওয়া কঠিন হয় নি। লাবণ্য বুঝতে পেরেছিল যে 'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালানো' বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। বরং 'জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যই'— এটাই বাস্তব সত্য।

এসব বিবেচনায় স্বপ্নবিলাসী অমিত নয়, বাস্তববাদী শোভনলালই নির্বাচনযোগ্য পুরুষ। ভুলে হোক, আবেগে হোক এক সময়কার গভীর প্রেমিককে তো আর ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। ব্যক্তিজীবনের আঙিনায় না এনেও তার স্বপ্নাশ্রিত প্রেমের দাবি কিছুটা মেটানো চলে। তাই লাবণ্য অমিতের জন্য কখনো দিঘির জল, কখনো আকাশ হয়ে থাকার প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দিতে পারে নি। এটাও ছিল অমিতের ভাববিলাসী বায়বীয় চিন্তার আরেকটি নমুনা। এভাবে 'শেষের কবিতা'য় নর-নারীর প্রেম রোমান্টিকতার আকাশে বিচরণ করেও বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছে। আবার স্বীকার্য যে লাবণ্যের দিক থেকে এটা স্ববিরোধিতারও সামিল।

সন্দেহ নেই প্রেম মানব মনের এক জটিল অভিব্যক্তি, সে কখন কোন পথে চলবে তার হদিস অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকারও জানা থাকে না। বিচিত্র তার প্রকৃতি, জটিল তার চরিত্র। তার জোয়ার-ভাটার টানে অনেক সময় যুক্তির হিসাব, নৈতিকতার বোধ ভেসে যায়। সে জন্যই প্রেম প্রায়শ সরলরেখা ধরে না চলে ত্রিভুজে নিজেকে মেলে ধরে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাসে ত্রিকোণ প্রেমের রূপ লক্ষ করা যায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রেমের যে ত্রিভুজ বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপকে ঘিরে রচিত সেখানে দাম্পত্যপ্রেমের শুদ্ধতা কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য নিখিলেশের হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল লেখক রবীন্দ্রনাথের।

'শেষের কবিতা'য় প্রেমের সে ত্রিভুজ একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। প্রেম এক্ষেত্রে যথারীতি ব্যক্তিদ্বন্দ্বের আঁধার হয়েও স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বৈতরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। নারীর প্রেম দুই নায়ককে আশ্রয় করে দুই ভিন্ন চরিত্র নিয়ে প্রতিফলিত। বস্তুত লাবণ্যকে বিবাহিতা নারী হিসাবেই ধরা যায়, কারণ সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্বপ্রেমিক শোভনলালকে বিবাহের এবং তা অন্য প্রেমিক অমিতকে জানিয়ে দিয়েছে। তার দ্বৈত প্রেম দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে স্থিত।

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রেমের এ দ্বিপাক্ষিক রূপ, এর দ্বিচারণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কম নয়। কারণ এ দ্বিপাক্ষিক প্রেমের অস্তিত্ব লাবণ্যের সতীত্ববোধ বিতর্কিত করে তুলেছে। কিন্তু এ সামাজিক সমস্যা লাবণ্য বা রবীন্দ্রনাথ কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। 'শেষের কবিতা'য় প্রেমের ত্রিভুজ রচনা করে, বিশেষত নায়িকা লাবণ্য-চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কার্যত দাম্পত্যপ্রেমের উপস্থিতিতেই বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি দাম্পত্যধর্ম বিষয়ক সামাজিক নীতি-নৈতিকতা অতিক্রম করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছেন। এখানে তাঁর আধুনিক চেতনার জয়। এর আগে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে সাহসী হন নি। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্পর্কে নয়া সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা অবিশ্বাস্যই ঠেকে। 'যোগাযোগ'-এ নারীর স্বাধিকারবোধ ব্যক্তিচেতনা যেখানে দলিত, পিষ্ট— একই সময়ে লেখা 'শেষের কবিতা'য় তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক আধুনিক চেতনার জয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'
দুই নারীতত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ কতটা ?

রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় তত্ত্বের প্রভাব যে বিস্তর সে কথা আগেও বলা হয়েছে। কবির লেখা উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিচারে, ঘটনার বৈশিষ্ট্য বিচারে ঐ তত্ত্বের প্রয়োগ এত স্পষ্ট যে তা দেখিয়ে দিতে হয় না। সে প্রয়োগ কখনো পরোক্ষ প্রতিভাসে, কখনো প্রত্যক্ষ আরোপে। 'গোরা'য় যা আলো-আঁধারির অস্পষ্টতায় ধরা পড়ে, 'দুইবোন' বা 'মালঞ্চ' এবং অংশত 'বাঁশরী'তে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। আবার তার এই নারীতত্ত্বই ভিন্নরূপ পায় যখন রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভালোবাসার চারিত্র ভিন্নতা সম্পর্কে ভাবেন, কথা বলেন, এমন কি উপন্যাসের চরিত্রের মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করেন। যেমন 'শেষের কবিতা'র অমিত। সে প্রেম ও ভালোবাসার জাত বিচারের তর্ক তোলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রেম-ভালোবাসার পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রভাতকুমারের ভাষায় "দুইবোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী— এই তিনখানি বইতে কবি 'প্রেম' ও ভালোবাসার মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভাবে নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে। সে প্রেম দেহ-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ, সাধারণ যৌনলক্ষণের ঊর্ধ্বে; মনস্বিতা ও হৃদয়াবেগ (intellectuality ও emotion) এমন একটা সুন্দর সমন্বয়ের স্তরে কল্পিত হয়— যেখানে দেহের ক্ষুধা লুপ্ত" ইত্যাদি। কিন্তু এমন ধারণা তত্ত্বেই মানায়, বাস্তবে নয়। দেহসম্পর্কহীন, কামগন্ধহীন প্রেমের দেখা বাস্তব সংসারে কমই মেলে। এর সবটাই ভাবকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁর নারীভাবনায় তত্ত্বের পর তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার কারণ বোঝা শক্ত। দুই নারীতত্ত্ব ঘুরেফিরে নানাভাবে তার কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। সেই যে 'চিত্রা' কাব্যের যুগ থেকে দুই নারী তত্ত্বের সূচনা, 'বলাকা' পর্বের 'দুই নারী'তে তা আরো স্পষ্ট। আবার কখনো তা প্রকাশ পেয়েছে প্রেয়সী শ্রেয়সীরূপে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা 'নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারই প্রতীক।... যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য সেই জন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলী যাকে ইন্‌টেলকচুয়াল বিউটি বলেছেন' তাই।

তেমনি 'কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে' দেখা না পাওয়া গেলেও তা রয়েছে 'ভাবে' কল্যাণী তথা গৃহলক্ষ্মী রূপে। 'রাতে যে প্রেয়সীর রূপ ধরে আসে, প্রাতে তথা দিনে সেই দেবীর বেশে আসে। বলাকার 'দুই নারী'তেও একথাটা আরো স্পষ্ট।' কবির ভাষায় :

... সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী...
একজন উর্বশী, সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী...
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী।
বিশ্বের জননী...।

'নারী' কবিতায়ও নারী একদিকে 'সুন্দরী' অন্যদিকে 'কল্যাণী' এবং আরো নানা রূপে মূর্ত। এ জাতীয় তত্ত্ব আলোছায়ার নানারঙে একাধিক গল্প-উপন্যাসের চরিত্রে ধরা পড়েছে। তবে তা সব চেয়ে পরিস্ফুট 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে।

দুই

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে একই পুরুষের প্রতি পরিস্ফুট হয়েছে দুই নারীর প্রেম। 'শেষের কবিতা'য়ও অমিতের প্রতি ছিল কেতকী ও লাবণ্যের প্রেম যা শেষপর্যন্ত পরিণতি পেয়েছে একদিকের দাম্পত্য মিলনে অন্যদিকে বিদেহী প্রেমের সম্পর্কে। কিন্তু 'দুইবোন' বা 'মালঞ্চে' এ তত্ত্বের প্রয়োগ যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করেছে, 'শেষের কবিতা'র মতো সহজ সমাধানে শেষ হয় নি। 'শেষের কবিতা'য় সমন্বয়ের চেষ্টায় সমাধান ঘটিয়ে ট্রাজেডি'র পরিণতি থেকে রক্ষা মিলেছে, কিন্তু মেলে নি পূর্বোক্ত দুই উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ কি এক্ষেত্রে দাম্পত্যসম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমের বিরোধী? কিন্তু সবারই জানা, প্রেম কখনো কোনো নিয়ম বা শাসন মেনে চলে না।

'দুই বোন' উপন্যাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ যথারীতি তার বহু-কথিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করে বলে দিয়েছেন 'মেয়েরা দুইজাতের, ... একজাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।'। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন 'মা হলেন বর্ষা ঋতু' যে-ঋতু শস্য ফল জল ইত্যাদি নিয়ে সেবার মাধুর্যে ভরে দেয় অভাব, দেহের ও প্রাণের। 'আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু' যে রহস্যময় মায়াবী মাধুর্যে চিত্ত ভরে দেয়। নারীর এ দুই প্রকৃতি পরস্পর থেকে একেবারে ভিন্ন। অথচ দুইয়ের পেছনে মূল বিষয় প্রেম— মাতৃরূপ প্রেম, প্রেয়সী-প্রেম। নারীর মধ্যে যেমন স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে এ দুইয়ের প্রকাশ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতে, কখনো একই নারীর মধ্যে দুইয়ের মিশ্ররূপ দেখা যায়। সম্ভবত সেখানে সমস্যার সমাধান। কিন্তু বড় দুর্লভ নারীর এ মিশ্র চরিত্রের রূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুই বোন' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে, গ্রন্থাকারে মার্চ, ১৯৩৩ সালে, অন্যদিকে পূর্বোক্ত কাহিনীর প্রায় প্রতিরূপ 'মালঞ্চ' প্রকাশ পায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে, গ্রন্থাকারে মার্চ, ১৯৩৪ সালে। ঠিক এক বছরের ব্যবধানে উপন্যাস দুটোর প্রকাশ। প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে এক চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে 'এমন নারীও আছে যারা পতিগুরুর সেবা ও পদধূলির কাঙালিনী নয়, বরং তারা প্রকৃত পুরুষকেই চায় যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্মি সেই জাতের' মেয়ে। 'আপন জীবনের সমভূমিতে' ঐ নারী বিচরণ করতে চায় আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে।

সেজন্যেই মাতৃস্বভাবের স্ত্রী, সেবাপরায়ণা স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ তথা স্বামীকে তৃপ্তি দিতে পারে না। মানবজীবনে অস্তিত্ব রক্ষার স্পৃহা যেমন সত্য তেমনি সত্য যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ ও পরিতৃপ্তি যেখানে প্রেম নামক ভাব মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাই প্রেমের অনিবার্য পরিণতি নর-নারীর যৌনমিলনে। রবীন্দ্রভাষ্যে দেখা যায়, দিদি শর্মিলার সংসারে এসে ঊর্মি ভগ্নিপতি শশাংকের মধ্যে সেই পুরুষকে দেখতে পেয়েছিল যাকে দিয়ে তার নারীত্ব পূর্ণতা পেতে পারে। কিন্তু তাতে যে অঘটনের সম্ভাবনা নিহিত থাকে সেটাই হয়ে উঠেছিল সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথ নারীর দুই রূপের কল্পনা করেছিলেন সম্ভবত একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে। তাই কোনো কোনো নারীর মধ্যে দুইরূপের সমন্বয় ('মিশোল')-এর কথাও বলেছেন। কিন্তু কার জন্য ? পুরুষের জীবন-মন ভরে তোলার জন্য ? পুরুষের কি সেক্ষেত্রে কিছু দেবার নেই নারীকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ? আসলে এটা রবীন্দ্রনাথের একরকম পক্ষপাতিত্ব পুরুষকুলের প্রতি!

সে ন্যায্য প্রশ্ন উহ্য রেখে পরিপূরণের প্রশ্ন তোলা হলে জবাবে বলতে হয় এক অঙ্গনে দুই নারীর উপস্থিতি কি আদৌ সম্ভব— যেমন এক কম্বলের ওপর দুই পীরের অবস্থান ? এতে সংঘাত ও সর্বনাশ দুটোরই আশু সম্ভাবনা থেকে যায়।

এ সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না বা ভাবেন নি এমনটা হতে পারে না। তাহলে বলতে হয় তিনি জেনে-শুনে ভেবে-চিন্তেই তাঁর তত্ত্বের পরীক্ষায় হাত দেন, এক ছাদের নিচে দুই বোনের ঠাঁই নিশ্চিত করেন, বলতে হয় শুকনো পরিবেশে বারুদ জমা করেন। এমনভাবেই করেন যাতে দাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে। সেখানে আবেগের স্ফুলিঙ্গপাত ঘটার ঠিক পূর্বমুহূর্তে জিনিসটা সরিয়ে নিলেন। তাই বিস্ফোরণ ঘটে নি। তবে পরিবেশ বারুদের গন্ধে এমনই ভারি হয়ে ওঠে যে সে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা মোটেই সহজ ছিল না।

শশাংকের প্রতি ঊর্মির অসচেতন আকর্ষণ যখন সচেতন বিন্দুতে পৌঁছে যায় অর্থাৎ দুজনের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে তখনই ব্যাধির প্রতিকার প্রয়োজন হলো। কেন হলো তা বুঝতে পারা যায় ঊর্মিমালার দেহে-মনে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ওঠার পর। হোলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষে সারাদিন শশাংকের সঙ্গে মাতামাতির পর রাত নেমেছে। এ সময় ঊর্মির নিঃসঙ্গতার ছবিটা করুণ, ট্রাজেডির ইঙ্গিতবহ :

> দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণ-চাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝরঝর শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা।... জানালার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে।

দেহ মনের উদ্বেল অবস্থা সামলে নিতে সেই গভীর রাতে ঊর্মিকে মাথা ধুয়ে নিতে হলো, গা মুছতে হলো ভিজে তোয়ালে দিয়ে। শশাংককে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা ঊর্মির অবচেতনে প্রবল হয়ে ওঠার কারণেই বোধ হয় :

> রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙ্গেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারি গাছের বীথিকা। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এলো, কিছুতেই থামতে চায় না। প্রাণের এই কান্না— প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদবেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখ নিদ্রা ?

ঊর্মির পরিণত মন এর জবাব জানে না এমন নয়, অন্তত অবচেতনের ইঙ্গিত অনুভবে ফুটে ওঠে না এমন হতে পারে না। এ বেদনা তো অসম্ভবের খেলায় মেতে ওঠার জন্য এবং না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণে। নিজেকে কিছুটা হলেও চিনতে পারছে বলে সেদিনই সে নিজ বাড়িতে চলে যায়। আর এর মধ্যেই জেনে যায় তার বাকদত্ত নীরদের সঙ্গে বিয়ের স্থির কথা বিলেত-প্রবাসী নীরদ ভেঙে দিয়েছে তার কর্মক্ষেত্রে এক শ্বেতাঙ্গিনীর আগমনে। হাঁপ ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঊর্মি। কিন্তু এ স্বস্তি মুক্তির হলেও প্রাপ্তির নিশ্চিত পথ দেখাতে পারে নি ঊর্মিকে। নিজের মনকে যখন সে বুঝতে শুরু করেছে তখনই এক ঘোর লাগা আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কাও মনে ভার তৈরি করতে শুরু করেছে। 'মনের ভিতরটা মাতাল হয়ে উঠেছিল। শশাংককে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে ঊর্মি কেবল ভেতরে ভেতরে ছটফট করত।' বিষয়টা যখন স্পষ্ট ধরা পড়ল দিদির কাছে, তখন ঊর্মির প্রগাঢ় লজ্জার পালা। সত্য বড় কঠিন ও নির্মম। তাই পালাতে হলো বিদেশে। ঊর্মিকে তার বাসনার রঙিন কুঁড়িগুলো নিজ হাতেই ছিঁড়ে ফেলে দিতে হলো।

কাজের ফাঁকে এর মধ্যে একদিন বাগানে শশাংক ঊর্মিকে বলেছে, অর্থাৎ সেও নিজের মনের ঠিকানা জানতে পেরে আত্মপ্রকাশ করেছে— 'তুমি নিশ্চয়ই জান তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভালোবাসি। আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। আমি তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।' ঊর্মি একথা মানে, নিজের মন দিয়েই জানে। দিদির কথা থেকে বুঝছে এ সংসারেই তার ঠাঁই হতে পারে। কিন্তু ওর মন মানে না, হাজার হোক শর্মিলা তারই দিদি। কী লজ্জা! এক অদ্ভুত দোটানা ঊর্মিকে প্রবল আঘাতে বিপর্যস্ত করে, নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে থই পায় না সে। সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন, খুব কঠিন। শেষ মুহূর্তে মুশকিল আসানের মতো মুক্তির পথ বাতলে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঊর্মি পালিয়ে বাঁচল লোকলজ্জা, লোকনিন্দার হাত থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিকে নিয়ে দুই নারীতত্ত্বের যে পরীক্ষা শুরু করেন 'দুই বোন' উপন্যাসিকায়, সেখানে ঊর্মির পরিণতির পূর্বহিসাব তাঁর কাছে ধরা ছিল। তাই পরীক্ষা ছিল ফলমিলানো অঙ্কের মতো। এবং সে এক ছকবাঁধা হিসাব। কিন্তু ঊর্মি যদি শশাংকর স্ত্রী শর্মিলার আপন বোন না হয়ে বাইরের কেউ হতো (যেমন মালঞ্চে) তাহলে পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট তীব্র ও জটিল হতে পারত, তাতে পাঠক মনে সাড়া জাগত অনেক বেশি। কিন্তু এখানে ছকবাঁধা পথ ধরে এগুতে হয়েছে লেখককে।

অন্যদিকে নির্ধারিত ছক ভাঙতে না পারা বা না-ভাঙার কারণে উপন্যাসটি ভিন্ন মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। কিন্তু কেন এ পিছুটান ? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে এর কারণ তুলে ধরা হয়েছে। তার ভাষায় 'আদিত্য ও শশাংক কি করিয়া কল্পনা করিয়াছিল যে লক্ষ্মী ও উর্বশী একই গৃহমধ্যে বাস করিতে পারে! রবীন্দ্রনাথ এই অশিষ্ট কল্পনার পরিণাম দেখাইয়াছেন এই দুই গল্পে'। কিন্তু প্রভাতকুমারের এ ব্যাখ্যা সমাজ-শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে যা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন যে তিনি সাহিত্যে লোকশিক্ষার দায়িত্ব নেন নি।

তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনেকখানি গ্রহণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে 'শশাংক ও শর্মিলার ভেতরে ভেতরে জোড় মেলে নি।' অর্থাৎ দু'জন দুই প্রকৃতির নারী-পুরুষ। তাই 'তাদের মধ্যে প্রকৃতির মিল ঘটে নি। অথচ ভেতরের ফাটলটা উপর থেকে চোখে পড়ে নি।' সে জন্য নতুন ঢেউয়ের কল্যাণে যখন অঘটন ঘটেছে, তার পরে শর্মিলা চেয়েছে ভাগ্য সংশোধন করে নতুন পরিবেশে অর্থনৈতিক সর্বনাশ সামাল দিতে তখন বুদ্ধিমতী ঊর্মি বুঝে নিয়েছে জোড়াতালি দেওয়া 'কাঁচা মালমসলায় তৈরি নড়বড়ে বাসার' আশ্রয়ে নিরাপত্তার নিতান্ত অভাব। তাই দেশান্তরে যাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। হৃদয়ের উত্তাপ একদিন যথানিয়মে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। তবু শশাংকের জন্য ঊর্মির মনে যেটুকু ভাবনা থেকে যাচ্ছে সে ভাবনাও একসময় দূরত্ব ও কর্মের টানে নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শশাংক-ঊর্মির ভালোবাসার পেছনে কারণ হিসাবে আরো দেখেছেন স্বামীর প্রতি শর্মিলার অতিনজরদারি, অতিখবরদারি যা একজন কর্মী মানুষের ধৈর্যের বাধ ভেঙে দিতে পারে। আর সে সময়ই কিনা প্রজাপতির চঞ্চল পাখনায় রামধনু রঙ ফুটিয়ে ঊর্মির আবির্ভাব। প্রকৃতিগত মিলে মনের মিল ঘটতে সময় লাগে নি। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছকে বাঁধা পরিণামেই গতি হলো উর্মিমালার। ছকভাঙার কাজটা আর সম্ভব হলো না। হলো না দুই বোনের নিকট সম্পর্কের কারণে, এমনটাই ধরে নেওয়া ভালো।

আসলে 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসিকায় রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্যসম্পর্ক এবং নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ক প্রেমের ত্রিভুজই এঁকেছেন নর-নারীর ব্যক্তিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দাম্পত্য-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্ফুট করে তুলতে। 'মালঞ্চ' এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও লেখক আদিত্য-নীরজা-সরলার ত্রিকোণ প্রেমের নির্মম দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। দুই নারীতত্ত্বের সূত্রটি সেখানে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতায় ফুটে ওঠে নি। নীরজার মধ্যে শর্মিলার প্রতিরূপ অনেকাংশে থাকলেও এবং স্বামী আদিত্যকে সে স্নেহে মমতায় ঘিরে রাখলেও তুলনায় সরলার আকর্ষক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়, অন্তত উর্মিমালার মতো তো নয়ই— কেমন যেন নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ এক নারীচরিত্র, বলা চলে বড়জোর কথামালার নারী। তার মধ্যে প্রেমের আবেগ উচ্ছ্বাসও বিরল প্রকৃতির।

মানুষ আর যাই করুক নিজের কাছ থেকে পালাতে পারে না। সে-পালানো স্বকৃত ভুল বা প্রেমের ত্রিকোণ জটিলতা যেখান থেকেই হোক। সে জট, সে জটিলতা আরো বড় হয়ে উঠেছে যখন অনেকটা শশাংকর মতোই আদিত্য সরলার হাত চেপে ধরে বলেছে; 'উদ্ধারের পথ নেই, সেপথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে একথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।' এসবই নীরজার মৃত্যুশয্যায়।

এর পরেও আদিত্য সরলাকে বলেছে, 'জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা'। কিন্তু সরলার আচরণে, কাজে আকর্ষণীয় নারীর বিদ্যুতবিভা কোথাও ফুটে উঠে নি। উর্মিমালা অবস্থাদৃষ্টে নিজের কাছ থেকে এবং শশাংক ও তার প্রেমের জাল ছিন্ন করে পালাতে পারে নি বলে জাহাজে উঠেছিল বিলেত যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়ে। কিন্তু সরলা কোথায় পালাবে ? তার অর্থনৈতিক শক্তি খুবই কম। তাই সেক্ষেত্রে নীরজাকে পালাতে হলো মৃত্যুর সাথে ষড়যন্ত্র করে খুব অস্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়ে। তাতে কি প্রেমের ত্রিভুজ বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল আদিত্য-সরলা ? তেমন ইঙ্গিত উপন্যাসে অন্তত মেলে না।

স্বীকার করতে হয় যে, 'দুই বোন'-এর শিরোনামে এবং কাহিনীর সূচনা বক্তব্যে দুই নারীরূপের যে সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন তার যথাযথ প্রকাশ ঘটে নি দুই কাহিনীর কোনোটাতেই। বরং তুলনায় 'শেষের কবিতা'য় আভাসে ইঙ্গিতে যা পরিস্ফুট তার আবছা-আলো অধিকতর আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে প্রেমের ত্রিকোণ জটিলতায়ও ঘটনা ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব শৈল্পিক মাত্রায় উত্তীর্ণ নয়, অনেকাংশে সরলরেখার একটানা গতানুগতিক রূপ, যা দুই নারীরূপের দ্বন্দ্ব সার্থকতায় তুলে ধরতে পারে নি। তুলনায় পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোতে রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা— তা পিছু টানের হোক বা অগ্রযাত্রার হোক— যথেষ্ট শৈল্পিক কুশলতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁশরী' (১৯৩৪)-তেও 'শেষের কবিতা'র ধারায় দুই নারীকে নিয়ে প্রেমের ত্রিভুজ, এবং অনেকটা অমিতের দুই নারীসম্বন্ধ এখানে পরিবেশিত। নাটক আমাদের আলোচ্য বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নারীতত্ত্বের প্রকাশ এখানে কতটা রয়েছে সে পরিচয় অতিশয় সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা বিষয়ক এক প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন দেহ ও আত্মার অস্তিত্বনির্ভর বিশ্বাস, এক তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক প্রেম এবং দাম্পত্যসম্পর্কের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রধারণার প্রকাশ এখানে ঘটেছে। তাছাড়া 'বাঁশরী' উপন্যাসধর্মী নাটক— তীব্র বিদ্বেষ, ঘাতপ্রতিঘাতের ধারায় উচ্চ আদর্শবাদে সমাপ্ত যদিও নর-নারী প্রেম এক মুখ্য বিষয় (প্রভাতকুমার)।

সোমশংকর ও বাঁশরী পরস্পরের প্রেমে নিবেদিত, কিন্তু দেশোদ্ধার ভিত্তিক রাজনৈতিক কারণে গুরুর আদেশে সোমশংকর বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে সুষমাকে যার সঙ্গে তার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই, সুষমার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। গুরুর নির্দেশে সে সবকিছুই করতে পারে, সে জন্যই সোমশংকরের সঙ্গে বিয়েতে সে আপত্তি করে নি। এখানে তার কাজ প্রাত্যহিক দাম্পত্যজীবনের ভূমিকা নিখুঁতভাবে পালন করা (অনেকটা অমিতের ঘড়ার জল ব্যবহারের মতো)। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাঁশরীর পরিণতি একটু ভিন্ন হলেও রবীন্দ্রতত্ত্বের দিক থেকে তা খুব একটি ভিন্ন নয়। প্রাথমিক ভুল বোঝাবুঝির পর্ব শেষ হলে পর বাঁশরীও দেশব্রতের মহৎ কাজে নিজেকে তার ভালোবাসার দায়ে উৎসর্গ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্যগ্রন্থগুলোতে তাঁর নারীভাবনার প্রথাসিদ্ধ রূপ যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি দাম্পত্যসম্পর্কের প্রচলিত ধারণার বাইরে স্বাধীন নারীচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন 'বাঁশরী' নাটকে)। অন্যদিকে দাম্পত্যসম্পর্ক ও সতীত্বধারণার ধরাবাঁধা সংস্কার অতিক্রম করে নারী এ পর্যায়ে বিবাহিত পুরুষের প্রেমে আকৃষ্ট হতে দ্বিধা করছে না, সমাজের রক্তচক্ষু এরা উপেক্ষা করতে পারছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্বের নায়িকাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সময় তাদের এতটুকু ছাড় দিয়েছে সমাজের প্রবল অনুশাসনের বিরুদ্ধে। এমনকি দিয়েছে অবিবাহিতা তরুণীকে বিবাহিত পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হতে। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয় সম্পর্কও বিবেচনায় আসে নি।

এ পর্বের নায়িকাদের কেউ কেউ শুধু প্রেমেই তাড়িত নয় (যেমন 'শেষের কবিতা'র নায়িকারা) বরং দেশহিতব্রতেও এদের অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। পূর্বনায়িকাদের মধ্যে উল্লেখ্য 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলা। বিমলার বিচরণের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু আলোচ্য পর্বের নায়িকাদের কর্মক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে ঘরের বাইরে। লক্ষ করার বিষয় যে দেশহিতে, সমাজহিতে এদের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এরা সবাই উচ্চশ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত নারী— মোটামুটি বিচারে অধিকাংশই সমাজের এলিট শ্রেণীভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ সময়ের দাবি মেনে নিয়ে তাঁর এ পর্বের নায়িকাদের মুক্তি দিয়েছেন স্বাধীন দেশহিত ব্রতে; দিয়েছেন প্রেমে, কর্মে, শিক্ষায়। এরা নির্দ্বিধায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে চলে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনাতন সংস্কার তাদের বেঁধে রাখতে পারে না। 'শেষের কবিতা' থেকে 'দুইবোন' কিংবা 'মালঞ্চ' ইত্যাদি উপন্যাসে নারীর স্বাধীন জীবনাচরণের প্রকাশ ঘটেছে একাধিক নায়িকার চরিত্রে।

রবীন্দ্রনাথ এসব ক্ষেত্রে তার নায়িকাদের প্রেমের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যতিক্রমী উদাহরণ বাদে তাদের অসম-সম্পর্কের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেন নি। এতটুকু সংস্কার তখনো রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের মধ্যে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উপস্থিত। মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক পরিবর্তনের যে ধারা বা মূল্যবোধের যে পরিবর্তন রবীন্দ্রনায়িকাদের নয়া জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করেছে তার প্রকাশ ছিল মূলত এলিট শ্রেণীতে, সাধারণ জনস্তরে সেই প্রকাশ ছিল বিরল ঘটনা।

ঠাকুরপরিবারের অপেক্ষাকৃত নয়া প্রজন্মের সদস্যদের, যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী কিংবা সরলা দেবী প্রমুখ নারীর পাশাপাশি অনুরূপ পরিবারের নারীদের (যেমন চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী) বাইরের জগতে স্বাধীন বিচরণ কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই যেমন তার নারীভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন তেমনি তার নায়িকাদের অনুরূপ হিতবাদী কর্মে অংশগ্রহণ করতে দিয়েছেন, প্রেমের স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে সংস্কার তাকে বাধা দিয়েছে। এ অবাক ঘটনা তার নায়িকাদের মধ্যে যেন এক স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। দেহের শুচিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংস্কার তার নায়িকাদের কারো কারো শৈল্পিক সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকান নি রবীন্দ্রনাথ। তবে সামাজিক সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা থেকে দূরে সরে গেছেন, পরিবর্তে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে জন্ম নিয়েছে নতুন থেকে নতুনতর মূল্যবোধ। নারীর ব্যক্তিচেতনা ক্রমশ অধিক সমর্থন পেয়েছে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের। তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী ভিন্ন চারিত্রে দেখা দিতে শুরু করেছে। তবে এর সূচনা কয়েক বছর আগে থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চার অধ্যায়'
প্রতিকূল পরিবেশে প্রেমের জঙ্গমতার প্রকাশ

তিরিশের দশকের রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই যেন ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথ। যেমন কবিতাসহ নানা ধারার শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমনি নারী-বিষয়ক ভাবনায় এবং তাঁর রচনায় নারীর চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্বের ক্ষেত্রে। এর কারণ তৎকালীন টগবগে দেশীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিন্ন দৃশ্যপট। স্বদেশ-বিদেশ তখন সমানভাবে তাঁকে স্পর্শ করছে। স্বদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক উত্তাপের ব্যাপকতা। বিপ্লববাদ তখন তরুণদের আকৃষ্ট করছে ব্যাপকভাবে। তরুণীরাও পিছিয়ে থাকছে না। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় নিয়ে দেখছেন সবকিছু। তাঁর সমকালীন বাস্তবতা তাকে বরাবর স্পর্শ করেছে, তা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি, বা করেন নি।

সেজন্যেই ১৯৩০ সাল দেশ-বিদেশ মিলিয়ে এদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় বিন্দু। এ বছরেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, উগ্র উপনিবেশবাদী চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টায় বোমা নিক্ষেপ, ঢাকায় ইংরেজ পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ, 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এ প্রশাসনের সঙ্গে বিনয়-বাদল-দীনেশের যুদ্ধ এবং অনুরূপ একাধিক ঘটনা দেশের তরুণ-স্নায়ুতে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে শুরু করেছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক শাসনে নারী-পুরুষ ও শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্রিটেন থেকে আমেরিকা মহাদেশ পর্যন্ত।

পরের বছরটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী ভগৎ সিংহের ফাঁসি, হিজলি জেলে রাজবন্দিদের ওপর গুলি চালনা এবং এর প্রতিবাদে মনুমেন্টের নিচে বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, বক্সা দুর্গে রাজবন্দিদের রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন এবং শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ঘরে বাইরে শাসক মহলে তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশিয়ার প্রশংসা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চোখে আপত্তিকর বিবেচিত হয়, সে ধারা অবশ্য এখনো চলছে।

এরপরও দেখা যায় বাঙালি মেয়েরা অধিক সংখ্যায় বিপ্লববাদে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। এদেশী তরুণদের চোখে সাহসী বিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত ডি ভ্যালেরা আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী (১৯৩২) হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে উপনিবেশ দেশগুলোতে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। বিপ্লববাদ তখন ঘরে ঘরে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের 'ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণ করে এবং গ্রেফতার এড়াতে বীর তরুণী 'প্রীতির আত্মহত্যা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলর (বঙ্গদেশের গভর্নর) স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বীণা দাসের গুলিচালনা। মেয়েদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার ঘটনাবলি বিস্ময় তৈরি করে না।

রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমে বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিপ্লববাদী সহিংসতা। হিংসা-প্রতিহিংসা সমান হারে উত্তেজনা ছড়িয়ে চলেছে। মেদিনীপুরে একের পর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা— পেডি, ডগলাস, বার্ড প্রমুখ। অন্যদিকে মাস্টারদা সূর্যসেনসহ ইতোমধ্যে বহুসংখ্যক বিপ্লবী গ্রেফতার। বে-আইনি ঘোষিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেলী সেনগুপ্তা আর কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান হন নারী স্বাধিকারের প্রবক্তা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দুঃসংবাদ নাৎসী হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৪ সাল ছিল আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর এবং তা নানা দিক বিচারে। ইউরোপের রাজনীতিতে তখন সর্বনাশের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে হিটলারের একাধিপত্যে— যুগপৎ চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বগ্রহণের পর 'ফুয়েরার' উপাধি গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে চীনে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক লংমার্চ। স্বদেশে একের পর এক বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন, দীনেশ মজুমদার প্রমুখের ফাঁসি। দার্জিলিং রেসকোর্সে কুখ্যাত অ্যান্ডারসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, চৌরিচৌরায় সহিংস ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক ধরপাকড়, অন্যদিকে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত এবং কমিউনিস্ট পার্টি সরকার কর্তৃক বে-আইনি ঘোষিত। এমনি এক তীব্র ঝাঁঝালো রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের বিতর্কিত উপন্যাস 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত; অবশ্য এর ঠিক আগেই 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাসিকা এবং 'বাঁশরী', 'তাসের দেশ' নাটক-এর প্রকাশ। স্মর্তব্য যে ইউরোপে তখন 'নব্যধারায় লেখা'র আন্দোলন চলছে— কিন্তু ভারতীয় উপনিবেশে চলছে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন— অহিংস ও সহিংস; এবং সহিংসতারই তখন জয়জয়কার, সেদিকেই তরুণ-তরুণীদের প্রবল আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ এ দুই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেখেন রাজনৈতিক উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চার অধ্যায়'-এর যে বিপ্লববাদিতা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা তা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, এখানে দেখার বিষয় নারীচরিত্র সৃষ্টিতে ও সেইসব চরিত্রের জীবনাচরণে আধুনিকতা-অনাধুনিকতা এবং সংস্কার ও প্রগতির প্রতিফলন কতখানি। সেই সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত রাজনৈতিক পরিবেশে তরুণীদের আত্মত্যাগ ও পরিবর্তিত সামাজিক-জৈবনিক মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সমান্তরাল যাত্রাও বিচার্য বিষয়, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ গোটা বিষয়টাকে কীভাবে দেখেছেন এবং সৃষ্টিকর্মে কীভাবে তা প্রকাশ করেছেন এর তাৎপর্যও কম নয়।

'চার অধ্যায়'-এর মূল বিষয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এলা-অতীনের তীব্র-গভীর প্রেম ও তার বিয়োগান্ত পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে তরুণীদের আধুনিকতা ও বিপ্লববাদে দীক্ষার বিষয়টি যেমন যথোচিত গুরুত্বে প্রকাশ করেছেন তেমনি অনুভব করেছেন যুগ পরিবর্তনের অভিঘাতে নারীদের জীবনাচরণে পরিবর্তন, তাদের 'গৃহলক্ষ্মী-কল্যাণী'রূপ যে আধুনিক সমাজে অন্তর্হিত তা বুঝতে কষ্ট হয় নি তাঁর। এ পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ একদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্যদিকে এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দিকটাতেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বিশেষ করে জীবনের সামাজিক-পারিবারিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে।

তাই বিপ্লবী নেতা ইন্দ্রনাথ যখন এলার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'আমি লোক চিনি, তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূত, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।' তখন ইন্দ্রনাথের মুখের কথা বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই কথা বলে মনে হয়, নতুন যুগের তরুণীদের সম্পর্কে তাঁর বিচারভাবনা থেকে। ইন্দ্রনাথ এলাকে আরো বলেছিলেন 'সংসারের বন্ধনে কোনোদিন আবদ্ধ হবে না,... তুমি সমাজের নও, দেশের।' এলার মানস-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে এ দিকটা মেলে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস শুরুই করেছেন এ তথ্য প্রকাশ করে যে 'এলার জীবনের সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে।' সে বিদ্রোহের চরিত্র পারিবারিক হলেও তাতে আদর্শবাদিতার প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট।

এলার বাবার প্রতি তার মায়ের অন্যায় আচরণ, মায়ের শুচিবাই ও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অমানবিক আচরণ, সর্বোপরি মায়ের মধ্যে আধুনিক মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্প বয়সেই তাকে দাম্পত্যধর্ম ও সংসারধর্মের প্রতি বীতরাগী করে তোলে। স্বভাবতই বিয়েতে অনিচ্ছা তার স্বভাবধর্মের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। তাই ইন্দ্রনাথের কথার সুরে সুর মিলিয়ে এলা বলতে পেরেছিল 'এই প্রতিজ্ঞাই আমার' অর্থাৎ বিয়ে করবে না এমন সিদ্ধান্তই সে নিয়ে রেখেছে। এই এলাকে রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা বলা না গেলেও এলা যে তাঁর স্নেহের পাত্রী (চরিত্র) উপন্যাসের ভূমিকায় এবং পরে অন্যত্র তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এলা-ইন্দ্রনাথের সংলাপে এমন অনেক কথা বা মতামত বেরিয়ে এসেছে যা আদতে রবীন্দ্রনাথেরই মতামত। সেক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে নর-নারী সম্পর্ক অর্থাৎ ভালোবাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কিত বিষয়ও বাদ পড়ে নি। তবে এ কাহিনীতে এলা-অতীনের ভালোবাসার তীব্রতা এমনভাবে দেখানো হয়েছে যা আপাতদৃষ্টে অবিশ্বাস্য— যে-এলা একদা বিয়ে করবে না সংকল্প করেছিল পরে ইন্দ্রনাথের কাছে একই অভিমত ব্যক্ত করেছিল, এমনকি অতীনের সঙ্গেও যার ছিল বিবাহ-নিরপেক্ষ ভালোবাসা সেই এলাই ভালোবাসার প্রবল আবেগে ভেসে যায়। সে যেমন মেয়ে হয়েও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অতীনের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করেছিল তেমনি সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেই প্রস্তাব করে : 'আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু।... গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।' অতীন রাজি হতে পারে নি, সংগঠন তার কাছে তখন বড়।

আর এ উপলক্ষেই ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে, আসে প্রথমে এলাকে ঘিরে। কিন্তু সেসব অন্য প্রসঙ্গ, বিশেষ করে বিপ্লববাদের ভুলভ্রান্তি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। যে-রবীন্দ্রনাথ তার নায়িকাদের দিয়ে নায়কের পদ চুম্বন করাতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনিই পরে বিশেষত তিরিশের দশকে পৌঁছে প্রেমিক-প্রেমিকার স্বাভাবিক চুম্বনের রীতিতে ফিরে গেছেন। অতীন-এলার ভালোবাসায় সেই প্রকাশ ঘটে আবেগের গভীরতায়। এসব ক্ষেত্রে প্রায়শ রীতিভাঙা রীতিতে পারদর্শী এলাই এগিয়ে আসে অতীনকে 'জন্মদিনের চুম্বন উপহার' দিতে, আর অতীন শেষ বিচ্ছেদলগ্নে দাবি করে 'শেষ চুম্বনের'। এসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই ঘটে।

আর সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে এলা শেষ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় "মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বলল, 'মারো, এইবার মারো'। ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা। অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন"...। এ অন্তিমলগ্নে ভালোবাসার শেষ আকাঙ্খা পূরণ করতে চেয়ে এলা বলে উঠে, 'নাও আমাকে।... এ দেহ তোমার।... আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্তে তুমিই নাও।... শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল।' দেহের শুচিতা সম্পর্কে নারী যে এখন মোহমুক্ত সে সত্য রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন 'চার অধ্যায়ে', বিশেষ করে এর শেষ অধ্যায়ে নারী-পুরুষের প্রণয়তীব্রতার প্রকাশে এবং দৈহিক মিলনের অনুষঙ্গে। এখানে নারী বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এক দুর্লভ ঘটনা।

'শেষের কবিতা'র নায়ক-নায়িকাদের অতিআধুনিক আচরণ এবং প্রেমের তেমনি 'অনাবৃত' উদ্ভাস দেখে পাঠকমাত্রেরই মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসার রূপচিত্রণে সত্যিকারের আধুনিক। কিন্তু সেখানে অমিতের মতো জাত-আধুনিকও লাবণ্যের হাত টেনে নিয়েছে নিজের হাতে, বড়জোর তার মাথা বুকে টেনে নিয়েছে গভীর আবেগের মুগ্ধ মুহূর্তে। এর বেশি এগুতে পারে নি। কবিতাই হয়ে উঠেছে তাদের ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম, লাবণ্যর দিক থেকেও একই রকম আচরণ দেখা গেছে, তীক্ষ্ণ তির্যক মননশীল সংলাপে অন্তরের উষ্ণতা বা আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, দৈহিক মিলনের ইচ্ছা তারা কখনো প্রকাশ করে নি, এমনকি গভীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও নয়। রবীন্দ্রনাথ সংলাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবী জাদুতে পাঠককে এতটাই অভিভূত করে রাখেন যে কথাটা তাদেরও মনে আসে না। মনে হয় এটাই আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ।

কিন্তু 'চার অধ্যায়'-এ পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন প্রেমের মর্মস্পর্শী চিত্র রচনায়। এবং এতটাই গেলেন যে বুঝে নিতে হয় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক থেকে আধুনিকতর হতে পারেন। ফজলি আমের সময় ফুরোলে 'ফজলিতর আম' আনার কথা একমাত্র তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব এবং বলা সাজে। তা না হলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শিহরণ জাগানো পরিবেশে অমন গভীর রোমান্টিক প্রকৃতির আবেগঘন প্রেমের দৃশ্যচিত্র এঁকে তুলতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ— যেখানে জঙ্গমতাই প্রেমকে করে তুলেছে অভিনবই নয়, অবিশ্বাস্য!

স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ে প্রেম এবং প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণ সম্পর্কে, তাদের দেহ মিলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে, সর্বোপরি শুচিতা-অশুচিতা বোধ সম্পর্কে পূর্ব সংস্কার বর্জন করেছেন। হয়তো তা সম্ভব হয়েছে পরিবেশ-বাস্তবতা মেনে নিতে পারার কারণে। রবীন্দ্রনাথের পর্বান্তর যাত্রা এভাবে নিজেকে নতুন থেকে নতুনতর বোধে আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছে। পূর্ববিশ্বাস বা সংস্কার পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। তবে সে যাত্রার পদক্ষেপ বরাবরই হিসাবি, সতর্ক, ভেবে-চিন্তে চলার।

প্রেম ও নর-নারীসম্পর্ক বিষয়ে এমনিভাবে পথ চলেছেন, আপন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যেখানে চেয়েছেন সেখানে পরিবর্তন বাস্তবিকই হয়ে উঠেছে দৃষ্টিগোচর, স্পর্শগোচর। তাই এমন মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই যে "জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথ এলা-অন্তুর ভালোবাসা আশ্রয় করিয়া আবিষ্কার করিলেন 'ভালোবাসা বর্বর'— এই বর্বর ভালোবাসার উন্মুক্ত অকুণ্ঠিত পরিচয়ই 'চার অধ্যায়ের' আকর্ষণ।" (নীহাররঞ্জন রায়)।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এলা-অন্তুর ভালোবাসাকে 'বর্বর ভালোবাসা'র স্বীকৃতি দিয়েছেন ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে রবীন্দ্রনাথ যুগসচেতন, কালসচেতন লেখক। তিনি অনেক সময় প্রচলিত সমাজবাস্তবতা অতিক্রম করতে দ্বিধাবোধ করেছেন, কিন্তু যেখানে তাঁর মনে হয়েছে পরিবর্তনটা সময়ের দাবি, তা যত অপছন্দেরই হোক না কেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এখানেই তার আধুনিক মনের পরিচয়। তা না হলে 'চোখের বালি'-'নৌকাডুবি' উপন্যাসের লেখক 'চতুরঙ্গ' বা 'শেষের কবিতা'য় পৌঁছাতে পারতেন না। পারতেন না 'চার অধ্যায়ে' এলা-অতীনের প্রেমের জঙ্গমতা প্রকাশ করতে।

তাঁর কালচেতনা ও সময়ের দাবির কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার তাঁর মন্তব্যে, চিঠিপত্রে বা প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এ যুগচেতনার টানে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এলার মতো সাহসী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্পষ্টবাদী ও আধুনিক চেতনার নায়িকাচরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি করা। কিন্তু তাতে রোমান্টিকতার রঙ চড়ানোর কাজটাও 'জন্মরোমান্টিক' রবীন্দ্রনাথেরই, তা না হলে চরিত্রটা রাবীন্দ্রিক হতো না। এটা উভয়ের জন্যই অর্থাৎ এলা-অতীন দুজনার জন্যই ছিল সত্য। তাই 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ' দুপক্ষের জন্যই সত্য হয়ে অবিশ্বাস্য এক ট্রাজেডির জন্ম দিয়েছে।

এলা শুরু থেকেই বাস্তববাদী, আবার প্রেমের প্রজাপতিরঙ মেখে রোমান্টিক হলেও ওর চরিত্রে ছিল সত্যকে স্বীকারের প্রবণতা— তাই নারী হয়েও, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও নারীবাদের অতিরঞ্জন এলার ভালো লাগে নি। তাই অতীনের কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছে 'আধুনিককালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে।... আমার এতে লজ্জা হয়।'

এই হলো এলা। তবে ঐ কথাগুলো যে এলারই নয়, রবীন্দ্রনাথের সেকথা বুঝতে কারো কষ্ট হবার নয়। কিন্তু ওতে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। এলার মতো নারীবাদীই আসলে নারী-স্বাধিকার অর্জনের কাজ ভালোভাবে করতে পারে এমন বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের যুগের জন্যই নয়, একালের জন্যও সত্য। আমাদের সমাজবাস্তবতা তাই বলে। একদেশদর্শিতা কোনো পক্ষেই মঙ্গল আনে না— একথা সবার ক্ষেত্রে সত্য। রবীন্দ্রনাথ বহুকথিত এই সত্য কথাটা এলার মুখ দিয়েই নয়, বহুক্ষেত্রে সরাসরি নিজেও বলেছেন।

কিন্তু এলা-অতীনের সংলাপেও, কেন জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরনো তত্ত্ব টেনে এনেছেন নারী-পুরুষের শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবধর্মের পার্থক্যের কথা তুলে। এটাও ছিল রবীন্দ্রনাথের একাধিক 'অবসেসর্মের' একটি। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোই এলা বলেছে তার মতো করে যে 'প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এনেছি জগতে। সঙ্গে এনেছি জীব প্রকৃতির নিজের যোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা।... পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।'

রবীন্দ্রনাথ এ কথাগুলোই বহুবার বহুক্ষেত্রে বহু উপলক্ষে বলেছেন। এ জন্যেই এলাকে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যারূপী নায়িকা। তার মুখ দিয়ে অনেক বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেসব ধারণা বা তত্ত্বকথা তার বিশ্বাসের জগতের অন্তর্গত সত্য হয়ে রয়েছে। কিন্তু এসব কথার উচ্চারণ প্রয়োজন ছিল না এখানে।

আশ্চর্য, আধুনিকতার বস্তুসত্য অন্তরে বহন করে তিরিশের দশকে পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের জৈব-বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সম্পর্কে তার 'অবসেসন' দূর করতে পারেন নি। এ প্রভেদচেতনা যে নারীর ব্যক্তিমূল্যের মানদণ্ডের ওপর, তার ব্যক্তিসত্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর আঘাত স্বরূপ, এবং এ ধরনের 'মিথ' অবলম্বন করেই যে প্রাচীন যুগ থেকে সমাজে নারী নির্যাতন ও নারী শোষণের পালা শুরু, সনাতন সভ্যতার-সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে চান নি। এ ধরনের বৈষম্যমূলক ধারণা যে বস্তুত নারীব্যক্তিত্বের অবমাননা, কিছুকিছু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতার শিকার রবীন্দ্রনাথ এ সত্য বুঝতে চেষ্টা করেন নি। করেন নি বলেই একাধিক রচনায় একই কথা বলার পরও এলার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতার প্রয়োজনে।

অবশ্য এর বিরুদ্ধে যথারীতি অতীনও শাশুড়ির বধূনির্যাতন ও অন্যায় আধিপত্যের কথা বলেছে, যে-আধিপত্যের ও অন্যায় অত্যাচারের পেছনে রয়েছে 'মায়ের খোকারা'। তার ভাষায় 'যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে' একথাটাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যুক্তিতর্কে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মানস-কন্যারই জয় হয়েছে। এলার মতে, 'সৃষ্টিকর্তা লড়াই করার শক্তি দেন নি মেয়েদের'। তাহলে এর অর্থ মেয়েদের অধস্তন অবস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, পুরুষের সেবা করেই নারীজীবনে সার্থকতা খুঁজতে হবে। এলার ভাষায় 'তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা, আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।' এই ভক্তিবাদই রবীন্দ্রচৈতন্যের বাস্তব পথে যাত্রার পথে প্রকৃত বাধা। রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিদ্রোহী নায়িকা এ ভক্তিবাদের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে।

এলা-অতীন সংলাপে এলার শেষ কথা— 'আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা।' রবীন্দ্রনাথ এলাকে বিদ্রোহী হিসাবে চিত্রিত করে তার মুখ দিয়েই নারীকে সেবিকা রূপে, পুরুষের তুলনায় হীন হিসাবে চিত্রিত করে কখন যে তাঁর প্রাচীন অবস্থানে ফিরে গেছেন তা হয়তো কথাশিল্পীর মনেই ছিল না। তাই ঐ দীর্ঘ সংলাপে রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের তত্ত্বকথা উঠে এসেছে। বলা হয়েছে 'নারীর মহিমা, নারীর ঐশ্বর্য, নারীকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত মাধুর্যলোকের' কথা যা পুরুষের জন্য হয়ে ওঠে কর্মের ও শক্তির উৎস' ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'চারঅধ্যায়ে' ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিবেশিত হয়েছে 'সেই পুরনো দ্রাক্ষাসার'।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী নারী এলা, বাস্তববুদ্ধির এলা নারী-পুরুষের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র করে নিয়ে তাদের সামাজিক পারিবারিক অবস্থানও আলাদা করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কলমে গড়া এলা তার নারীত্বকে তাৎক্ষণিক হলেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বচেতনার পথে পরিচালিত করেছে, যেখানে নারীসত্তার জন্য সঠিক স্থান নির্ধারিত হয় নি। এলার এই নারীপ্রকৃতি চিত্রণ তার স্বভাবধর্মের সঙ্গে মেলে না, যে স্বভাবপ্রকৃতি নিয়ে কাহিনীতে তার আবির্ভাব।

তুলনায় অতীন স্বভাবসুলভ রোমান্টিকতা নিয়ে তার তার্কিক বক্তব্যে অনেকখানি যুক্তিনির্ভর, বাস্তববাদী। এলার প্রেমই যে তার জীবনযৌবনের মুখ্য বিচার্য বিষয় সে সত্য সে এলাকে ভুলতে দিতে চায় নি বলেই এলার ঐসব তাত্ত্বিক বকুনির মুখে সুস্থ যুবকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো গভীর মননশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে তার প্রেমের প্রকৃতি সম্পর্কে উচ্চারণ করেছে 'অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম'— তা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে 'নিষ্ঠুরের মতো ভালোবাসার পাত্রীকে নিয়ে যেতে পারে নি আপন কক্ষপথে।' এলার সাজিয়ে তোলা কথামালার জবাবে তার ভালোবাসার শক্তি চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছে 'ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে।' এমন কূলছাপানো ভালোবাসাও সার্থক হতে পারে নি কাহিনীর কল্যাণে— যেখানে ট্রাজেডি বড় হয়ে রইল, সে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

এরপরও এলার মুখে সনাতন নারীতত্ত্বে নারীর ভূমিকা, তার সংসারদায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার কিছু সূত্র উচ্চারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, এই শেষ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তার নারীভাবনার পূর্ব অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছেন, মূলত আধুনিক চেতনায় আপন বিশ্বাসের পথ তৈরি করে। তাঁর গড়া নায়িকা এলা রোমান্টিক হয়েও আধুনিক, রোমান্টিকতার ক্ষণিক প্রক্ষেপ বিবেচনার বাইরে রাখলে সার্বিক বিচারে নায়িকা এলা প্রেমে ও জীবনতৃষ্ণায় আধুনিক চেতনার পরিচয় রেখেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটগল্পের বিচিত্র নায়িকারা

সমাজ ও পরিবারে নারীর আদর্শ অবস্থান, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন, নিজ দেহের ওপর নারীর নিজস্ব অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন কেন্দ্র করে রবীন্দ্রমানসে দ্বিচারিতা, দোলাচলচিত্ততা ছিল দীর্ঘসময়ের। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের জন্য ছিল দুই ধারার দ্বন্দ্ব, অনেকটা দুই স্রোতে অবগাহনের মতো সমস্যা। একদিকে প্রাচীন সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতির আদর্শ যেখানে ছিল সতীত্ব-পত্নীত্ব-মাতৃত্বের সঙ্গে গৃহধর্ম ও একনিষ্ঠ দাম্পত্যসম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-পারিবারিক বিষয়, অন্যদিকে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আলোয় দীপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞাননির্ভর আধুনিকতা— এ দুইয়ে মিলে রবীন্দ্রমানসে অনিবার্য দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমকালীন সামাজিক প্রভাব— কখনো রক্ষণশীলতার, কখনো পাশ্চাত্যপ্রভাবিত স্থানিক আধুনিকতার যা রবীন্দ্রচৈতন্যে নারীভাবনায় জটিলতার কারণ।

দুই বিশ্বাসের বা দুই ধারার এ দ্বন্দ্ব যেমন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে তেমনি জন্ম দিতে পারে কিছু সীমাবদ্ধতার। সেক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্মে স্বাভাবিক পরিণতি প্রায়ই কঠিন হয়ে আসে, প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতার বিষয়টি। অবশ্য সময়ের প্রভাবে, আপন অভিজ্ঞতার টানে ঐ দ্বন্দ্বের আবর্ত ক্রমশ স্থির হয়ে, স্বচ্ছ হয়ে আসে। তবু স্বচ্ছজলের নিচে সংস্কারের কিছু তলানি যে থেকে যায় তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাসের কিছু চরিত্রচিত্রণে।

কিন্তু অবাক হতে হয় দেখে যে সূচনালগ্ন থেকেই ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে অনেকাংশে মুক্ত, তুলনামূলক বিচারে তার বিচরণ অনেকখানি স্বচ্ছন্দ। একই বিষয় লক্ষ করা যায় 'সবুজপত্র' যুগ থেকে কবিতার ক্ষেত্রেও! কিন্তু কেন ? কেন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ থেকে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন— এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া কঠিন। সমাজে-পরিবারে উপন্যাসের প্রভাব অধিকতর মনে করে কি রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোতে ছোটগল্পে সৃষ্ট বা কবিতায় পরিস্ফুট গুণগ্রাম প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন নি ? এমন সহজ সমাধান সঠিক মনে হয় না। বরং কারণ হিসাবে তার দোলাচলচিত্ততাই প্রধান কারণ মনে করা সঙ্গত। দুই প্রভাবের প্রকাশই সম্ভবত মূল কারণ— যখন চেতনায় যে-স্রোত প্রবল হয়েছে সেদিকেই ভেসে গেছেন লেখক।

সম্ভবত শেষোক্ত ব্যাখ্যাই অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। কারণ ছোটগল্পের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার জীবনে এসে জীবনবাস্তবতার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসরে তা শুধু তাকে গল্প লেখাতেই উদ্বুদ্ধ করে না, ঐ বাস্তবতার প্রভাবও পড়ে তখনকার গল্পে যে জন্য ঐগুলোতে পিছুটানের সুযোগ ছিল না, সামান্যই ছিল ভাববাদিতা প্রকাশের অবকাশ। এর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেই মিলবে, ছিন্নপত্রাবলী বা অন্যান্য চিঠিপত্রে বা সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রভাষ্যের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেছেন 'গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা।'

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন— 'জমিদারী দেখা উপলক্ষে নানারকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়, এবং এই থেকেই আমার গল্প লেখারও শুরু।' ছিন্নপত্রাবলীতে একই উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন (২৭ জুন, ১৮৯৪) 'যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি'। আবার সাজাদপুর থেকে লেখা চিঠিতে (৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) তাঁর গল্পলেখা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে, এমন কোথাও না।... আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্টমাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম।'

সম্ভবত এমনসব বাস্তব অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্বের তথা পদ্মাপর্বের গল্পগুলোকে রক্তমাংসের ও বাস্তবতার সংযোজনে সজীব করে তুলেছে, সেখানে রক্ষণশীলতার পিছুটানের সুযোগ বড় একটা ছিল না। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের গল্প অর্থাৎ মূলত পরবর্তী সময়ের গল্পে বাস্তবতার প্রতিফলন যতটা এসেছে তা প্রধানত সমকালীন সমাজে উপস্থিত আধুনিকতার টানে, সেগুলো প্রধানত মধ্যবিত্ত বা এলিট শ্রেণীর সদস্যদের নিয়ে লেখা গল্প। কবিতায়ও একই কারণে 'সবুজপত্র' যুগের আধুনিকতার প্রভাব এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ তিরিশের দশকের আধুনিক চেতনার প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছিল বিশেষ কিছু সংখ্যক কবিতায়। 'বলাকা-পলাতকা' পর্ব থেকে 'মহুয়া' পর্বে এসে কবিতায় সবলা নারীর আবির্ভাব। এর কারণ কি ১৯৩০ সালে সমাজতন্ত্রী রাশিয়া ভ্রমণ এবং সেখানে নারীসমাজের স্বাধীন জীবনযাত্রা এবং তাদের স্বাধীন নারীসত্তার প্রকাশ লক্ষ করে অভিভূত হওয়া ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

কারণ যাই হোক, এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখা শুরুই করেন সমাজে পণপ্রথার মতো এক কদর্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। 'দেনাপাওনা' তাই এক তরুণী বধূর শোকাবহ পরিণতির আলেখ্য হয়ে আছে (১২৯৮)। রক্ষণশীলতার প্রভাবে সমাজে কতটা যে ঘুণ ধরেছিল তার প্রমাণ এ গল্প। রায়বাহাদুরের একমাত্র চাকুরে পুত্রকে সুপাত্র হিসাবে বাছাই করতে হলো 'দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দান-সামগ্রীর' বিনিময়ে।

কিন্তু পণের টাকা সম্পূর্ণ যোগাড় না হওয়ায় সুপাত্র কেনার পরও শেষ রক্ষা হয় নি। শাশুড়ির অত্যাচারে বিনা চিকিৎসায় শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার মৃত্যু যে ট্রাজেডির সৃষ্টি করে তার ওপর রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে যে-কশাঘাত করেছেন তা সামাজিক রক্ষণশীলতার ওপর প্রবল আঘাত এবং তা নারী নির্যাতন, বধূনির্যাতনের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গভীর সমাজ চেতনার প্রমাণ দেয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুধু রায়বাহাদুর শ্রেণীর পরিবারের ওপরই নয়, এর আঘাত পড়েছে সমাজের ওপরও। যেমন—

'বাড়ির বড়বউ মরিয়াছে, খুব ধুমধাম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।... এমন চন্দন-কাঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব।... রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কীরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।' এর পর গল্পের শেষ বাক্যটি শুধু গল্পের 'ক্লাইমেক্সই' নয়, তা প্রথাশাসিত সমাজ এবং রক্ষণশীল পরিবারের ওপরও প্রচণ্ড কশাঘাত। বউকে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেবার জন্য পুত্রের চিঠির জবাবে 'রায়বাহাদুরের মহিষী লিখেছেন— 'বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি।... এবারে বিশহাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'

খবর শুনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটপুত্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল জানা নেই, তবে মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের কাল অতিক্রম করে আসার পরও একালের আধুনিক সমাজে পণপ্রথা তথা যৌতুকের অভিশাপ এতই মর্মান্তিক এবং বধূহত্যার প্রকৃতি এতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে প্রশ্ন উঠতে পারে— এ সমাজ কি একশ' বছরেও এদিক থেকে এক পা এগোয় নি? 'দেনাপাওনা' ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গল্প। এর পরেও একাধিক গল্পে সমাজে প্রচলিত রক্ষণশীল একাধিক প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল লক্ষ করার মতো। আর বধূ-নির্যাতন প্রসঙ্গ শুধু গল্প বা উপন্যাসেই আসে নি, এসেছে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যেও, "দেখেছি পুত্রবধূর 'পরে মা'র সুতীব্র বিদ্বেষ।" 'চার অধ্যায়'-এ অতীন-এলার সংলাপেও এ সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য লক্ষ করার মতো।

পণ তথা যৌতুক প্রথার বীভৎস প্রতিক্রিয়া যে বধূরূপী তরুণীর জীবনধারা পালটে দিতে পারে, নষ্ট করতে পারে ভবিষ্যৎ জীবন, তার শৈল্পিক সমাপন দেখতে পাওয়া যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তীকালে লেখা (১৩২১) 'অপরিচিতা' গল্পে। এখানে দেনাপাওনা নিয়ে বরপক্ষের (এ ক্ষেত্রে মামার) অশোভন আচরণের প্রতিক্রিয়ায় কন্যার পিতা তীব্র প্রতিবাদে বরযাত্রীদের আহারপর্ব শেষ করিয়ে বরকে বিদায় করে দেন বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে। প্রথম গল্পের নিম্নবিত্ত, ব্যক্তিত্বহীন কন্যার পিতার মতো এ গল্পের নায়িকা কল্যাণীর পিতা ডাক্তার শম্ভুনাথ সেন অন্যায়ের কাছে হাতজোড় করার মতো মানুষ নন, অবশ্য 'দেনাপাওনা' থেকে 'অপরিচিতা'— এর মধ্যে একযুগ সময় শেষ হয়েছে। প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। ইতোমধ্যে নারী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের আভাস পরিস্ফুট, আবির্ভাব ঘটেছে সমাজে শিক্ষিত নারীর। নিরুপমার মতো বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করার মতো মেয়ে এরা নয়। এদের সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়।

তাই ভাঙা বিয়ের আসর এবং বিয়ের ট্রাজিক পরিণতি যত কষ্টের হোক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ে কল্যাণী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আর বিয়েই করবে না। বিয়ে ভাঙার পর সে 'মেয়েদের শিক্ষার ব্রত' গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত কল্যাণীর সমকালে সম্ভব বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে পণপ্রথার বলি কল্যাণীকে প্রতিবাদী রূপে হাজির করেছেন। করতে পেরেছেন মেয়ে যথেষ্ট শিক্ষিত বলে, যা একযুগ আগে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয় নি। এ গল্পের মাধুর্য ও শৈল্পিক সার্থকতা অবশ্য অন্যত্র, কিন্তু গল্পের ঐ পরিণতিতে পৌঁছানোর প্রেক্ষাপট বরপক্ষের সংকীর্ণ যৌতুক-মানসিকতা যা অভিশাপের মতো সমাজের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের কালে, এবং এখনো আছে। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ পুরুষশাসিত সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার ওপর আঘাত হেনেছেন। সে আঘাত পুরুষ শ্রেণীকে আহত করেছে যখন দেখা যায় বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় একদা-বর তার মামা ও মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কল্যাণী ও তার বাবার কাছে মাথা হেঁট করে হাতজোড় করেছে। তা সত্ত্বেও কল্যাণীর ইস্পাতকঠিন সিদ্ধান্ত— 'আমি বিবাহ করিব না।' ট্রাজিক পরিণাম সত্ত্বেও এ গল্পে জয় নায়িকা কল্যাণীর, পরাজয় শুধু প্রতিপক্ষেরই নয়, তা বিশেষভাবে রক্ষণশীল সমাজের।

'অপরিচিতা' গল্পে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে পণপ্রথার অমানবিক পরিণাম, অন্যদিকে চমৎকারভাবে ফুঠে উঠেছে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বৈশিষ্ট্য। সময়টা 'সবুজপত্র' পর্বের, কবিতায় 'বলাকা' পর্বের। কবিতায়-গল্পে ব্যক্তিত্বের ঝকমকে প্রকাশ, অন্যদিকে যৌবনের গতিধর্মের জয়গান। উপন্যাসে এ পর্বে ও কিছুটা পরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'র কাল। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে (বিশেষ করে 'ঘরে বাইরে'র নায়িকা চরিত্রে) যে অর্জন সম্ভব হয় নি গল্পে তা প্রতিবাদী রূপ নিয়ে পরিস্ফুট। 'অপরিচিতা'র কল্যাণী তাই সমাজ ও পুরুষতন্ত্রের ছুড়ে দেওয়া অন্যায়, অসম্মান মেনে নেয় নি, মেনে নেন নি কনের পিতা। পিতা পালটা আঘাত ছুড়ে দিয়ে এ বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন আর মেয়ে গোটা পুরুষজাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছুড়ে দিয়েছে বিয়ে না করার এবং নারীশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অপরিচিতা'য় নায়িকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিবাদী রূপ নিয়ে পরিস্ফুট, কিন্তু 'হৈমন্তী' গল্পে সে প্রকাশ পরোক্ষ। এখানেও দেনাপাওনার পরোক্ষ হিসাব গল্পের পরিণতিতে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু পারিবারিক রক্ষণশীলতার টানে, লোভ ও আধিপত্যের টানে নারীনির্যাতন তথা বধূনির্যাতনের সামাজিক ঐতিহ্য যথেষ্ট তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হৈমন্তীর নীরব প্রতিবাদের রূপ অগ্রাহ্য করার মতো নয় বলেই এর পক্ষে তীক্ষ্ণ তির্যক ও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে নায়কের স্বগতোক্তিতে।

হৈমন্তীর ব্যক্তিত্বহীন স্বামী হৈমন্তীকে উদ্ধার করতে গিয়ে পিতার তর্জনগর্জনের মুখে পিছিয়ে এসেও আত্মগ্লানির হাত থেকে রক্ষা পায় নি, যদিও সে প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক। তার স্বগতোক্তির ভাষ্য চমৎকার : 'স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাজে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে! যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী পরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত।'

উপসংহারে নায়কের স্বীকৃতিতে সনাতন ধর্মে নারীনির্যাতনের ইতিহাসই শুধু ফুটে উঠে নি, সে ঐতিহ্য প্রভাব যে আধুনিক যুগেও সচল নায়কের বিদ্রূপে তা প্রকট। প্রকট সমাজের, পরিবারের বধূনির্যাতনের ঐতিহ্য যা আধুনিক মানব চৈতন্যে রক্তঝরানোর কথা। রক্ত নায়কের মনেও ঝরিয়েছে, কিন্তু তা তাৎক্ষণিক। সামাজিক অনাচার পারিবারিক সংস্কৃতিতে এতই প্রকট, এতটা গভীরমূলীয় যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস কম পুরুষ বা স্বামীরই থাকে। তাই 'হৈমন্তী' গল্পের নায়ক আত্মগ্লানির প্রকাশ ঘটিয়েও বলতে পেরেছে 'শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এখানে তির্যক বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন যথাযথভাবেই।

মায়ের পাত্রী খোঁজার কারণ একাধিক। এক, পুত্রবধূর পিতাকে আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দোহন করতে পারেন নি। দুই, হৈমন্তী যথেষ্টমাত্রায় বিনয়ী নয়, সে সত্যকে মিথ্যার রূপ দিতে শেখে নি। শেখানো মিথ্যা সে বলতে পারে না। তার এ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অসহনীয় বলে নানা যুক্তিহীন কারণে শাশুড়ি-বধূর নীরব সংঘাত, হৈমন্তীর প্রতিবাদও নির্বাক। এমনি একাধিক প্রতিবাদী আচরণে হৈমন্তীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমারের বক্তব্য মনে রাখার মতো— 'নারীর যে একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে সে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশে কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। সংসারের মান রক্ষার জন্য, সমাজের নাম রক্ষার জন্য, সকল প্রকার অসত্যের সহিত আপস-রফা করিয়া থাকাই যে নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহারই প্রথম নির্বাক প্রতিবাদ হইয়াছে হৈমন্তীর জীবনে।' এ মন্তব্য সর্বাংশে সত্য।

হৈমন্তীর প্রতিবাদ নীরব হলেও তাতে শব্দহীন পাথুরে কঠিনতা আছে, তা কল্যাণীর (অপরিচিতা) প্রতিবাদের চেয়ে খুব একটা দুর্বল নয় যেজন্য ক্রুদ্ধ শাশুড়ি তাকে জব্দ করতে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অতীন-কথিত 'মায়ের খোকা' হৈমন্তীর স্বামী তার স্ত্রীর 'সত্যে আঘাত দেবে না, কারণ সে তার সত্যের বাঁধনে বাঁধা' ইত্যাদি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ সত্ত্বেও পিতা-মাতার অন্যায় সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হয়েই রয়েছে। এ গল্পের পরিণতির সঙ্গে 'দেনাপাওনা'র পরিণতির সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

তিন

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুরূপ প্রকাশ ফুটে উঠেছে 'বোষ্টমী' গল্পেও। শাদামাটা এ গল্পের বাস্তব ভিত্তি রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন (শিলাইদহের 'সর্বক্ষেপী' বৈষ্ণবী)। রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদের আগাছা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর গল্পে-উপন্যাসে বিষয়টি ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে। ধর্মের নামে অনাচার সমাজে, পরিবারে কত ব্যাপক সে কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাই গুরুবাদী অনাচারের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন 'বোষ্টমী' গল্পে, অন্যদিকে নায়িকার প্রথম পর্বের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রায় প্রখর ব্যক্তিত্বের আভাসও ফুটিয়ে তুলেছেন তার কথায় ও আচরণে।

তাই যেদিন স্নানশেষে ভিজাকাপড়ে ঘরে ফেরার পথে আনন্দীকে দেখে গুরুজি বলে উঠলেন 'তোমার দেহখানি সুন্দর' সেদিন সে মুহূর্তেই আনন্দী সর্বনাশের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায়। স্বামীকে ভালোবাসা সত্ত্বেও গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা আর তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাই আনন্দী বলতে পেরেছে— 'আর আমি সংসার করব না।' স্বামীর অজানা ছিল না আনন্দীর মানসিক দৃঢ়তার কথা, তার সিদ্ধান্তের রদবদল হবে না সেটাও তার জানা ছিল বলেই স্ত্রীর সংসার ত্যাগে শেষপর্যন্ত বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি স্বামী। এরপর আনন্দীর সংসার ত্যাগ এবং সত্যকে খুঁজে ফেরাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

আনন্দীর দৃঢ় কণ্ঠে গুরুবিষয়ক আচরণে ও বক্তব্যে দামিনীর দেখা মেলে, তার কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। ধর্মাচরণে ক্লেদ জীবনের ভিত নড়বড়ে করে দেয়, জীবনের প্রতি ভালোবাসার শিকড়ে টান পড়ে। আনন্দী গুরুর ঐ দেহপ্রশস্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল, বুঝতে কষ্ট হয় নি যে তার ভালোবাসার ধন স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে একদিন 'সুন্দর দেহখানি' গুরুকেই নিবেদন করতে হবে। বিস্ফোরণের আগেই তাই তার প্রস্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাতকুমার ঠিকই বলেছেন— "ধর্মের আভরণ, ধর্মের আচরণ মানুষকে ধর্মাত্মা করিতে পারে নাই। 'বোষ্টমী' গল্পে সেই নিদারুণ ট্রাজেডির আভাসমাত্র দিয়া কবি নীরব হইয়াছেন।"

ট্রাজেডি তো বটেই, তা না হলে স্বামীর আদেশে গুরু সেবা করতে গিয়ে গৃহসেবা তথা সংসার-শিকড়ে টান পড়বে কেন ? রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় গুরুবাদী রসলীলার প্রকাশ ঘটেছে, এ সবই তার ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। পরমের রূপে সত্যকে খোঁজার এক আশ্চর্য প্রবণতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। গ্রামবাংলায় সহজিয়া ভক্তিবাদের যে অসাম্প্রদায়িক মানবিক রূপের দেখা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, তা নানাভাবে তাঁর গল্পে উপন্যাসে প্রায়ই অতি সাধারণ পরিবেশনে অসাধারণত্ব অর্জন করেছে।

'বোষ্টমী' প্রতিবাদী গল্প। এ গল্পে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে, যে স্বাতন্ত্র্যের টানে আনন্দীকে তার সুখের আশ্রয় সংসার ছাড়তে হয়েছে, অন্যদিকে তারই প্রতিক্রিয়ায় পরিস্ফুট হয়েছে গুরুবাদের ক্লেদ ও কালিমা যা তখনকার গার্হস্থ্য জীবনে ঐতিহ্যের ধারায় উপস্থিত ছিল। ছিল ব্যাপক ভাবেই যে জন্য রবীন্দ্ররচনায় এ ছবির বিস্তর দেখা মেলে। 'বোষ্টমী' গল্পে আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটলেও কাহিনীর সারাৎসার ধর্মীয় অনাচারের সামাজিক প্রতিফলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূর্ত করে তুলেছে। বলা বাহুল্য এ অনাচারের অসহায় শিকার নারী। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ নারীর করুণ ট্রাজেডির পক্ষেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু একই সময়ের যে-গল্প *নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার* পতাকা উড়ানোর দায়ে তুমুল সোরগোল তুলেছিল তা 'স্ত্রীর পত্র'। রক্ষণশীল শিক্ষিত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে এ গল্প রচনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে অশোভন ধিক্কার জানানো হয়, প্রতিক্রিয়াশীল গল্প লেখা হয় তা অবিশ্বাস্য। গল্প হিসাবে স্ত্রীরপত্রের শৈল্পিক সার্থকতা যথেষ্ট না হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি। বাস্তবিক এ গল্পের প্রকাশ ছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় "স্ত্রীরপত্রের বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ হয় নাই। প্রমাণ, 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী।"

'স্ত্রীরপত্র'-এ শুধু যে খাঁচায় বন্দি পাখির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে বা নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োজন ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে তাই নয়, চিঠির আকারে লেখা একমুখী চরিত্রের এ গল্পে বিয়ে করতে যাওয়া বর ও বরযাত্রীদের পুরুষতান্ত্রিক দাপট এবং কন্যাপক্ষের করুণ অসহায়তার সমাজবাস্তবতাও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যেমন 'বাবার বুক দুরদুর করতে লাগল, মা-দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা,... যে ব্যক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না। সমস্ত বাড়ির সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসল।'

বুঝতে কষ্ট হয় না, দাম্পত্যসম্পর্কের জোড় মেলাতে গিয়ে পুরুষতন্ত্রের কী দাপটই না সমাজ তৈরি করেছে পুরুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে। এ যেন এক অসম সম্পর্কের মিলন— অসমতার ভার শাস্ত্র ও সমাজের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণে এটুকু প্রকাশ করেই থামেন নি। বিন্দু নামের কিশোরীর জীবনের বিনিময়ে দাম্পত্যসম্পর্ক ও পরিবারতন্ত্রের অন্ধকারে লুকানো সব ক্লেদ টেনে বের করে এনেছেন। সেখানে অনাচারই সব নয়, অমানবিকতার চরম প্রকাশ সুস্থ জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করেছে। বিন্দুর ভার থেকে মুক্ত হতে চেয়ে তাকে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সতীত্বমহিমার স্তবগান করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।'

বিন্দুর দুর্দশা দেখে দেখেই মেজবৌ মৃণালের পক্ষে সম্ভব হয়েছে পারিবারিক গুহার অবস্থা উপলব্ধি করা। তাই সে বলতে পেরেছে 'কুষ্ঠরোগীকে তার স্ত্রী কোলে করে বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত... জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি।' শেষপর্যন্ত বিন্দুকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে পাগল স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে। বিয়ের পণ দিতে না পারার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্নেহলতা নাম্নী নারীর আত্মহত্যার মতো সমকালীন ঘটনাই সম্ভবত বিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— তাই স্নেহলতার মৃত্যুর ঘটনা সমাজপতিদের যেমন ক্রুদ্ধ করেছিল তেমনি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের সত্যভাষণে। রক্ষণশীল সমাজ ও পরিবারের অসুস্থ চেহারাটা তুলে ধরে ছিল মৃণাল, আবরণ উন্মোচন করে। সেটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না রক্ষণশীল শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিকদের।

রক্ষণশীল সমাজের বিধিবদ্ধ অচলায়তন ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ মৃণালকে সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের অন্ধকার ঘর থেকে বের করে নিয়ে এলেন। মৃণাল ঘরের বন্ধন সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বলতে পেরেছে যে সে আর ঐ কানাগলিতে ফিরবে না, কারণ 'বিন্দুকে সে দেখেছে, সংসারে মেয়েমানুষের পরিচয়টা সে বুঝতে পেরেছে।' তাই সমাজের ও পরিবারের অভ্যাসে ঢেকে রাখা মেজবৌ আর ঘরে ফিরতে চায় নি, বিন্দুর মৃত্যু তাকে জীবনের স্বরূপ দেখে নিতে সাহায্য করেছে। মেজবৌ-এর জীর্ণ খোলস ছিঁড়ে ফেলে মৃণাল নারীজীবনের স্বাতন্ত্র্য মহিমা ঘোষণা করেছে।

সে যে কেবল মাখন বড়াল লেনের মেজ বউই না, নারীও বটে, সে কথাটাই ঐ চিঠির, ঐ গল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য। তাই সে বলতে পেরেছে, 'আমার মধ্যে যা কিছু মেজ বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি।' অর্থাৎ ব্যক্তি মৃণাল, নারী মৃণালকে তার দাম্পত্যজীবন ও পরিবার স্বীকৃতি দেয় নি। দেয় নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই মৃণালের ঘর ছেড়ে আসা। 'সবুজপত্র' ও 'বলাকা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ এ গল্প লিখে দুঃসাহসের পরিচয় রেখেছিলেন, নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু গল্পটার এখানেই শেষ হওয়া দরকার ছিল। কারণ এ পর্যন্ত মৃণালের বক্তব্য ও ভূমিকা সনাতনী সংস্কারে আচ্ছন্ন সচরাচর দৃষ্ট পরিবারের রক্ষণশীলতার ও স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। মৃণাল বিদ্রোহী, মৃণাল সাহসী। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের ভাষায় 'মৃণাল বিদ্রোহী, মৃণাল বিপ্লবী নয়।' কিন্তু শেষপর্যন্ত মৃণালকে ভক্তিবাদের চোরাবালিতে ঠেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃণালের বিদ্রোহকে জলো করে দিয়েছেন। রোমান্টিক কুয়াশার আবরণ ও ভক্তিবাদের পলি মৃণালের প্রতিবাদী অবস্থানের ভিত দুর্বল করে দিয়েছে।

স্ত্রীর পত্রের গোটা বক্তব্যে যে বিদ্রোহের সুর তার সঙ্গে 'আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ' ইত্যাদি বক্তব্যকে ঘিরে রোমান্টিকতার যে কুয়াশা তা একেবারে সঙ্গতিহীন, সামঞ্জস্যহীন। এখানে হঠাৎ করেই রোমান্টিক কবির আবির্ভাব মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিদ্রোহী মৃণাল শ্রীক্ষেত্রে এসে মীরাবাঈ-এর ভক্তিবাদী পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। 'প্রভুর পাদপদ্মে লেগে থাকা' মীরার পথই শেষপর্যন্ত বিদ্রোহী মৃণালের পথ হয়ে উঠেছে বলে মৃণালের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে— 'এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা'। ভক্তিবাদী মীরা বাঈ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা অজানা নয়, কিন্তু তাই বলে তা গল্পে কেন ?

মেজবউ-এর খোলস ছিঁড়ে বিদ্রোহী যে-মৃণাল স্বাধীন নারীর ব্যক্তিক-সামাজিক সত্তা অর্জন করতে চেয়েছিল তা ভক্তিবাদের পাঁকে আবদ্ধ হয়ে রইল, মৃণালের আর স্বাধীন মৃণাল হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে ভক্তিবাদের প্লাবন ঘনিয়ে আসা। এতে রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত দোলাচলচিত্ততারই প্রকাশ ঘটেছে। সে জন্যই প্রশ্ন ওঠে : 'স্ত্রীর পত্রের বিদ্রোহী মৃণাল কতটা বিদ্রোহী!' তা সত্ত্বেও প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় *স্ত্রীর পত্রের* মূল্য অস্বীকার করা চলে না। চলে না উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই।

সন্দেহ নেই ইবসেনের নোরা ঘর ছেড়েছিল আপন ব্যক্তিত্বের প্রতি কর্তব্যবোধের তাগিদে। সে পুতুল হয়ে পুতুলের সংসারে থাকতে চায় নি। আর রবীন্দ্রনাথের মৃণাল বা কুমু ? এরাও নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা রক্ষার তাগিদে ঘর ছেড়েছে। মেজ বৌ মৃণাল বেরিয়েছে জীবনের সত্যরূপ অন্বেষায়। কিন্তু ভক্তিবাদিতায় কতটা সম্ভব হতে পারে বাস্তব জীবনের সত্য সন্ধান ? অন্যদিকে কুমু চেয়েছে দাম্পত্যসম্পর্কের ক্লেদাক্ত, বিকৃত পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে। তাই এক ঘর ছেড়ে আরেক ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সে ঘর তাকে আশ্রয় দেয় নি, বরং ফেরত পাঠিয়েছে পূর্বোক্ত ক্লেদাক্ত পরিবেশে— নিছক মাতৃত্বের উপলক্ষে। অর্থাৎ পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সবারই জানা মাতৃত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের জন্য ছিল এক পবিত্র বিষয় এবং তার নারী-বিষয়ক বিশ্বাস ও তত্ত্বের অন্তর্গত। হয়তো এজন্যই বেচারি কুমুকে ফিরে যেতে হয়েছে অনিচ্ছা নিয়ে। এখানে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণই ছিল যদিও সে কথা বলা হয় নি। বলা হয় নি মৃণালের ক্ষেত্রেও। বলা হয় নি মৃণাল কী করবে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন কীভাবে মিটাবে, কী হবে তার কর্মের ধারা— এসবের কোনো ইঙ্গিত নেই গল্পে। এ জন্যই এ গল্পের বাস্তব ভিত দুর্বল। অন্যদিকে মীরার ভজন গায়িকা ভক্তিবাদী কুমুর সমস্যা ছিল ভিন্ন। সে চেয়েছিল ঘর, ঘরে সুস্থ-পবিত্র দাম্পত্য পরিবেশ। বেনিয়া মধুসূদনের ঘরে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

নারীর ব্যক্তিসত্তার মুক্তি নিশ্চিত করতে 'সবুজপত্র'-পর্ব (১৯১৪) থেকে রবীন্দ্রগল্পের নায়িকারা প্রথম দিকে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্নভাবে, তবে সে প্রতিবাদ ঘরের চৌহদ্দি থেকে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সবার সমান নয়, প্রতিবাদের ধারাও সবার সমান নয়। যেখানে পরিবেশের চাপ ভিন্ন, ঘটনার প্রকৃতি ভিন্ন এবং নায়িকার ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য ভিন্ন সেখানে প্রতিবাদের ভাষা কিংবা পদ্ধতি এক হবার কথা নয়। তাই আনন্দী ও মৃণাল সামাজিক অনাচার ও দাম্পত্যজীবনে ব্যক্তিক ও পারিবারিক চাপের (যা প্রধানত সামাজিক ও মানসিক সংস্কার থেকে উঠে আসে) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মুক্তি অর্জন করতে ঘর ছেড়েছে। দু'জনের সমস্যা ছিল ভিন্ন; কিন্তু মূল কারণ এক।

ঘর ছাড়ার পর বহুআলোচিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণালের সামনে নতুন জীবনধারার কোনো দিকনির্দেশ ছিল না, তাই মীরার ভক্তিবাদের পথই তার পথ হয়ে ওঠে, এবং সে পথে নারীর ব্যক্তিসত্তার মুক্তি অর্জন কতটা সম্ভব তেমন প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসে। তিন বছর পর লেখা 'পয়লা নম্বর' গল্পের (চলতি ভাষায় লেখা প্রথম গল্প) নায়িকা অনিলাও একইভাবে নারীসত্তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর ছেড়েছে এবং তা প্রেমিককে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ এখানেও নেই।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের একটি সুপরিচিত 'থিম' সমস্যা সৃষ্টির কারণ হিসাবে এসেছে। এ কারণ সামাজিক নয় ব্যক্তিক যদিও পরবর্তী ঘটনাদির সামাজিক অভিক্ষেপ এখানে রয়েছে। উল্লিখিত কারণ স্বামীর উদাসীনতা যা দেখা যায় 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুর ক্ষেত্রে, সেখানে স্বামীর মাধ্যমে ত্রিভুজের তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব। একই ধরনের ত্রিভুজ রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় দেখা যায় যেখানে স্বামী নিজেই আগুন ঘরে তুলে এনেছে।

অনিলার স্বামীও তার উচ্চ চিন্তা নিয়ে সাহিত্য জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থেকেছে, স্ত্রী অনিলার হৃদয়াকাঙ্ক্ষার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর বোধ করে নি— এর মধ্যে দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে একটি নিশ্চল শ্যাওলা-পড়া সনাতন বিশ্বাসের অস্তিত্ব রয়েছে যে, যাকে মন্ত্র পড়ে শাস্ত্রসম্মত-পদ্ধতিতে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনা হয়েছে তার পক্ষে ঘর ছেড়ে উড়ে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অবকাশ নেই। সনাতন বিধির আধুনিক প্রয়োগে ভুলটা এখানে যে নারী যেমন কোনো জড়বস্তু নয়, তেমনি যন্ত্রও নয়, তার প্রাণ-হৃদয়-মন সবই আছে এবং চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ও আছে ঠিক পুরুষের মতোই। সেদিকে চোখ বন্ধ করে রাখার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই।

অদ্বৈত-অনিলার সমস্যা এখানে। কিন্তু সিতাংশমৌলির আন্তরিক প্রেম একই কাগজের টুকরায় প্রত্যাখ্যান করে অনিলার নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠে নি। দাম্পত্যসম্পর্কের মালিন্য, অবহেলা যেখানে নেই সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগও বড় একটা নেই। কাজেই সে প্রেম অস্বীকার করার অর্থ একটাই।

দাম্পত্যসম্পর্কের বাইরে প্রেম সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়, মনের আবেগে, পরিবেশের তাড়নায় প্রেম করা চলে, কিন্তু ঘরছেড়ে ঘর বাঁধা চলে না। সমাজকে এতটা অস্বীকার রবীন্দ্রনাথ হয়তো করতে চান নি। তাই নায়িকা কল্যাণীকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নারীশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করতে হয়, মৃণালকে ভক্তিবাদের আঙ্গিনায় পৌঁছতে হয়, আর অনিলাকে হারিয়ে যেতে হয়।

ঘরছাড়ার প্রশ্নে একটি বিষয় মনে রাখতে হয়, একই সময়ের কবিতায় কেউ ঘরে অবরুদ্ধ থেকে নীরব প্রতিবাদে হৈমন্তীর মতোই জীবনকে অবহেলায় শেষ করে দেয় (মুক্তি), আবার কেউ ঘর ছেড়ে গিয়ে প্রেমিককে নিয়ে ঘর বাঁধে (নিষ্কৃতি), বাল্য বিধবার সংস্কারে তখন আঘাত পড়ে না, কিন্তু গল্পে স্ত্রী মৃণাল কী অনিলা সেপথে পা বাড়ায় না। মৃণালের দিক থেকে নতুন কাউকে নিয়ে ঘর না-বাঁধার পেছনে যুক্তি রয়েছে, যে-মধুর তিক্ত স্বাদ একবার ভালোভাবেই মিলেছে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় না যাওয়াই নিরাপদ, নতুন কাউকে নির্বাচন করতে না যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অনিলার বেলায় এ যুক্তি পুরোপুরি খাটে না এ কারণে যে সিতাংশু যথার্থ প্রেমিক, সেখানে অদ্বৈতের মতো অবহেলার প্রশ্ন নেই— তাছাড়া ঐ দুই পুরুষের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সেক্ষেত্রে ঘর যদি ছাড়তেই হয় তাহলে সিতাংশুর সঙ্গে মিলনটাই ছিল স্বাভাবিক। উৎকণ্ঠ কেউ যদি গভীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকে তাহলে অনিলাকে ধন্য করার দাবি সে পুরুষেরই। অনিলার পর দেড় দশক সময় পার হয়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে এ সত্যটা লাবণ্য ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আরো পরে বুঝতে পেরেছিল এলা, কিন্তু ঘটনাজালে আবদ্ধ অতীন তা বুঝলেও তার কিছু করার ছিল না। সে তখন ঘটনার জালে অসহায় বন্দি। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আসলে প্রেমের ক্ষেত্রেও সামাজিক, অসামাজিক সমস্যার দ্বন্দ্ব অনিলার মনেও সম্ভবত ছিল, তাই অবশেষ সিদ্ধান্তে ঘর ছাড়া তার পক্ষে সহজ হয়েছিল স্বামীর চরম অবহেলা ও তার ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকারের মতো নির্বুদ্ধিতায়, কিন্তু ঘর বাঁধা নিয়ে টানাপোড়েনের দ্বিধা থেকে, অনিশ্চয়তা থেকে, নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে সে মুক্তি পায় নি বলেই নিরুদ্দেশ যাত্রাই তার জন্য সত্য হয়ে উঠেছে। বিকল্প পথের ওপর সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভর করতে পারে নি। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা তৈরি করেও সমাধান দেন নি সে অভিযোগ প্রভাতকুমারেরও, তবে তা যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তির নয়।

সুকুমার সেন অবশ্য এ উপলক্ষে দাম্পত্যপ্রেম ও দাম্পত্যসম্বন্ধ-বহির্ভূত প্রেমের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মনে রেখে 'বৈষ্ণব রসতত্ত্বের স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের' কথা উপস্থাপন করেছেন। এবং বলেছেন যে দাম্পত্যপ্রেমের প্রাত্যহিকতায় 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা হইবেই' এবং এ কথা অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই প্রেমের 'নূতন ও আধুনিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের শেষের গল্প-উপন্যাসগুলির অধিকাংশের মূল কথা।' নমুনা হিসাবে *চতুরঙ্গ, পয়লা নম্বর* ও *শেষের কবিতার* উল্লেখ করেছেন তিনি।

চার

এরপর দীর্ঘসময়ের ব্যবধান— জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গল্পে নতুনের ডাক শুনে চিরনতুনকেই যেন আহ্বান জানালেন কবি, দাম্পত্যসম্পর্ক ও প্রেমের বাস্তবতা সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া করে নিতে। পৃথিবী ভ্রমণ শেষে পাশ্চাত্য সমাজে নর-নারী সম্পর্ক এবং প্রেম ও দাম্পত্য প্রেমের সমস্যাদি নিয়ে নতুন ধারণার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের অজানা থাকার কথা নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে "যুগের দাবি সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। সে সচেতনতারই ফসল তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ 'তিন সঙ্গী' (আহমেদ হুমায়ুন)।"

নারীর পক্ষ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন না দিয়েও প্রেম এবং দেহশুচিতার প্রশ্নে যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'তিন সঙ্গীর' গল্পগুলো লেখেন, কিন্তু *ল্যাবরেটরি* বাদে বাকি দুটো গল্পে যুগের দাবি পুরোপুরি মিটেছে না মধ্যপর্বের রবীন্দ্রভাবনা এসে জায়গা করে নিয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়, সে বিষয় পরে বিবেচ্য। কিন্তু 'তখনকার যুগের মেয়েদের নিয়ে' লেখা গল্পে (প্রতিমা দেবী) তথা বিস্ফোরক গল্পে নর-নারীর নির্মোহ প্রেম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেহশুচিতার বৃথা ভাবনা-বিসর্জন দিয়ে বাস্তবিক এক সর্বাধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটালেন, এতে পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত নর-নারীর প্রেম ও দেহসম্পর্কের প্রভাব কতটা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

সোহিনী চরিত্র এ গল্পের মধ্যমণি, বলতে গেলে গল্পের সবটাই তার আকর্ষণে সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সোহিনী 'একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।' সন্দেহ নেই 'সোহিনী শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসে নি, তবু এনজিনীয়ার নন্দকিশোরের সঙ্গে সে ফাঁকির খেলা খেলে নি। সোহিনীর অতীত স্বচ্ছ নয় জেনেও নন্দকিশোর তাকে বিশ্বাস করেছে। সোহিনী বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে, নন্দকিশোরের কাম্য জিনিস জান দিয়ে রক্ষার ব্রত নিয়েছে, সে ব্রত কখনো ভাঙে নি সে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দকিশোর ঠিকই দেখতে পেয়েছিল সোহিনীর মধ্যে 'ক্যারেকটারের তেজ ঝকঝক করছে।' এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সে প্রশ্ন পরের। কিন্তু এখানে তিনি আর সব রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন সেটাই বড় কথা। তাঁর মনে কী এমন ইচ্ছা ছিল যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আধুনিকদের অতিক্রম করবেন এ গল্প লিখে, সেই সঙ্গে নিজেকেও অতিক্রম করবেন ? কারণ এ গল্পের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অন্য কোনো গল্প মেলে না, কোনোটি এর ধারে কাছে আসতে পারে না, তা যত বিদ্রোহী চরিত্রেরই হোক। কারণ এ গল্পের কাহিনী বিন্যাসে ও সোহিনী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি তার সব পূর্ববিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন। কেন ? সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ গল্পের আধুনিক চরিত্র তৈরিই ছিল তার লক্ষ্য।

তাই যে দাম্পত্যসম্বন্ধের শুচিতা রক্ষায় রবীন্দ্রনাথের প্রবল নিষ্ঠা, স্ত্রীর গৃহলক্ষী সেবাপরায়ণা কল্যাণী রূপ তাঁর এত পছন্দের (না হলে সমাজ-সংসারে স্থিতি নষ্ট হয়), নারী শুধু স্বামীর উচ্চ সাধনার পক্ষে যত্নবান শক্তি হিসাবে পেছনে থাকবে, প্রেমিকা শুধু প্রেমিকের ব্রত ভাঙার ফুলকি আগুন, এমন বিশ্বাসে যিনি পূর্বাপর স্থির, নারীর বিবাহোত্তর বিয়েতে যার মন সহজে সায় দেয় না সেই রবীন্দ্রনাথ কী না সবগুলো শর্তই ভেঙেছেন সোহিনী-নন্দকিশোর উপাখ্যান রচনার ক্ষেত্রে। গোটা গল্পটিতে এমন উদাহরণ বিস্তর।

যেমন সোহিনীকে সাতহাজার টাকার ঋণশোধের বিনিময়ে গ্রহণ করার পর নন্দকিশোর অতি সহজে বলেছেন 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনাকুটনি, এটা মানব ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জগতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।' নন্দকিশোর তাই সোহিনীকে রোমান্টিক কাব্যের ধারায় নয়, নিজের কর্মের ধারায় মনের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন যাতে তার অবর্তমানে স্ত্রী সোহিনী তার কর্মের হাল সঠিকভাবে ধরতে পারে। ভুল করে নি নন্দকিশোর, সোহিনী ঠিকই স্বামীর অবর্তমানে তার সব কিছুই ঠিকঠাকমতো পরিচালনা করেছে।

তেমনি নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর তার বিষয়-আশয় ধরে রাখতে তাকে 'নারীর মোহজালও বিস্তার করতে হয়,... সেটাতে তার নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না।' এই ছিল সোহিনী। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মেয়ের জন্য বিজ্ঞানী ছেলে খোঁজা প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরীকে সোহিনী নিঃসঙ্কোচে জমা টাকার ব্যবহার সম্পর্কে বলেছে— 'আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়,... আমি ওসব কিছুই বিশ্বাস করি নে।... মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই।... এই আমার ধর্মকর্ম।'

নারীর মাতৃত্বরূপের মুগ্ধ সমর্থক রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বহীন বিজ্ঞানী-ছাত্র রেবতী বিষয়ক আলোচনায় অধ্যাপক চৌধুরীর মুখ দিয়ে ঠিক বিপরীত কথা বলিয়েছেন। যা এ গল্পের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ বাক্যের বিস্ফোরক ব্যঙ্গোক্তির মতো প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপকের ভাষায় 'বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষ মহলে শুনেছ কি ?... মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা।' অযৌক্তিক মাতৃত্বচর্চার আবেগ সম্পর্কে এমন ব্যঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কলমে কমই বেরিয়েছে।

সে সতী-সাধ্বীদের মহিমা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রের অধিকাংশই স্তবমুখর (বিশেষ করে উপন্যাসে) সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ মানসকন্যা সোহিনীর মন্তব্য চমকে দেবার মতন— 'সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী-কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী।' এ বিস্ফোরক মন্তব্যের পর সোহিনী বলেছে, 'মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে, গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি।... আমি সমাজের আইন-কানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে কিন্তু প্রাণ গেলেও বেঈমানি করতে পারব না।' এমন কঠিন কথা সহজভাবে ক'জন বলতে পারে ? দামিনী কিছুটা বলতে পেরেছিল, আর পুরোপুরি বলেছে সোহিনী। সতীত্ববোধ উড়িয়ে দিলেও দাম্পত্যজীবনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তার চোখে বেঈমানি, সে অঙ্গীকার দৈহিক নয়, বৈষয়িক।

সবশেষে অধ্যাপক চৌধুরীর চিন্তাসূত্রেই গল্পের উপসংহার টানা হয়েছে। বাংলাদেশের পুরুষদের অধিকাংশই মাতৃতন্ত্রতত্ত্বের পুজোয় আত্মভোলার মতো নিজের অবস্থানকে যথাযথ কর্তব্যের অবস্থানে ধরে রাখতে পারে না, মাতৃপূজার টানে অনেক সময় তা ভেসে যায় তার প্রমাণ গল্পের চমকজাগানো ক্লাইমেক্সে যখন রেবতী সমস্যা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে তখন মঞ্চে রেবতীর পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেবি চলে আয়।' মাত্র তিনটে শব্দের জাদু। 'সুড়সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।'

এ সেই চৌধুরী-কথিত মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবল প্রভাব, কিন্তু বলা বাহুল্য সুস্থ প্রভাব নয়, এরাই অতীনের ভাষায় 'মায়ের খোকারা', যাকে বলে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। এদের কারণেই ঘরের বউ উনানে পড়ে, দড়িতে ঝোলে, শাড়িতে কেরোসিন ঢালে। এতে করে নারীব্যক্তিত্বের প্রকাশ পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে চলতে পারে না, অথচ সেই চলাটাই জীবনের, দাম্পত্যজীবনের সর্বোত্তম সত্য।

সোহিনী চরিত্রের সর্বোত্তম ইতিবাচক দিক জীবনের যে-কোনো মহৎ লক্ষ্যে একনিষ্ঠ সাধনা, যেখানে আত্মীয়-পর কেউ লক্ষ্যের বাইরে বিবেচ্য ব্যক্তি নয়। তাছাড়া এ গল্পে উঠে এসেছে একটি নির্মম তাৎপর্যপূর্ণ সত্য যে রবীন্দ্ররচনায় পূর্বাপর যে-সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যধর্মের একমাত্রিক ধারণা দেখা গেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তা ভেঙেচুরে দূরে ফেলে দিয়েছেন। সেখানে এসেছে স্থান-কাল-বিষয় নির্ভর বহুমাত্রিক ধারণা যা স্থিতিস্থাপক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তনশীল, কিন্তু ভেঙে পড়ার মতো নয়। এখানেই গল্পটির গুরুত্ব ও সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ সুস্থদেহে আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকলে এ সূত্রটিকে কতদূর নিয়ে যেতেন তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জানবেন, আর কারো জানার কথা নয়। তবে একথা ঠিক যে পাশাপাশি যুগনির্ভর আধুনিকতার নানামাত্রিক প্রকাশ ঘটানোও ছিল এ গল্পে তার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম 'অবসেসন' সতীসাধ্বিত্ব এ পর্যায়ে মনে হয় তিনি একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, তা না হলে 'বদনাম' (জুন, ১৯৪১) গল্পে সৌদামিনী চরিত্রকে নতুন মাত্রায় আঁকবেন কেন? 'বদনাম' গল্পের সদু তাই 'সতীলক্ষ্মী' না হয়ে 'অলক্ষ্মী হতে' চেয়েছে। বলেছে 'আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা।... আমি চাই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে।' সদু এভাবে দেশের কাজের মধ্য দিয়ে তার সতী-সাধ্বী নামের আকাঙ্ক্ষা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছে। সোহিনী চেয়েছে একভাবে, সদু অন্যভাবে, কিন্তু দুটোই কর্মের জগৎ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে শুধু দেশের কাজ সম্বন্ধে তার ধারণা পালটে দিলেন (বিপ্লবীদের সাহায্য করা) তাই নয়, সতীসাধ্বী মহিমার যুক্তিহীন খোলসটাও দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। দিলেন ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথ। সন্দেহ নেই গল্পের শেষাংশ অতিনাটকীয়, এর শৈল্পিক গুণও ততটা সার্থকতায় পৌঁছাতে পারে নি। তা সত্ত্বেও নারীত্ব, সতীত্ব, দাম্পত্যসম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-পারিবারিক বিষয়ে পুরনো ধারণার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে শেষ মুহূর্তের গল্পগুলোতে যে সংস্কারমুক্ত ধারণার প্রকাশ ঘটালেন, এ গোত্রান্তর রবীন্দ্রনাথ বলেই সম্ভব হতে পেরেছে। অসম্পূর্ণ সর্বশেষ গল্প 'মুসলমানীর গল্পে'ও একদিকে হিন্দুসমাজের অন্ধ রক্ষণশীলতা ও জাতপাত ভেদের বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে মানবিক চেতনার জয় ঘোষিত হয়েছে। জয় হয়েছে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শুদ্ধ ভালোবাসার। কমলা বেঁচে গেছে সেই ভালোবাসার জোরে। এখানে কমলার কণ্ঠে হিন্দুত্বমুক্ত গোরার শেষ কথা অনেকটাই শোনা গেছে।

'তিনসঙ্গী'র বাকি দুটো গল্পের চরিত্র ভিন্ন, যে-বিষয়ে ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সেকালে যারা কাজ করেছেন তাদের কারো কারো ধারণা রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন পাশ্চাত্যজীবনের বিশেষ করে নর-নারীর সম্পর্কের আধুনিক চেতনা *ল্যাবরেটরি* গল্পে প্রতিফলিত করেছেন। এখানে গভীর আদর্শনিষ্ঠার পাশাপাশি আধুনিক জীবনাচরণ প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে সোহিনীর মধ্যে এগুলোর সঙ্গে দেখা যায় প্রচলিত সামাজিক সংস্কার এবং নারীর দেহগত সংস্কার থেকে মুক্তি— যা ইউরোপীয় সামাজিক ব্যক্তিক জীবনাচরণের প্রতিফলন বলে মনে হতে পারে। সোহিনীসহ 'ল্যাবরেটরি' গল্পের চরিত্র তিনসঙ্গীর অন্য দুই সঙ্গী থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। এখানে স্রোত উদ্দাম, ঢেউয়ের রূপচিত্র আকর্ষণীয়, অনেকাংশে 'শেষ কথা'র পরিণত গাম্ভীর্য থেকে স্বতন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষকথা' সম্পর্কে সমালোচক যাই বলুন এখানে যতটা আধুনিকতার আলোকসম্পাত ততটাই বা তার চেয়ে কিছুটা অধিক মাত্রায় পুরনো রবীন্দ্রভাবনার আরোপ— ঐ যে, নারীপুরুষের বা 'স্বামীস্ত্রী'র কর্মজগৎ পৃথক করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই আদর্শ চিন্তার প্রকাশ অচিরার মধ্যেও পরিস্ফুট। পুরুষের সাধনা আর নারীর মাধুর্য— এমন বিভাজন বাস্তবিকই অযৌক্তিক। নবীনমাধবের কথা অনুসরণ করে অচিরার বক্তব্য— 'অর্থাৎ মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।' 'প্রসঙ্গত 'কচ দেবযানী'র উদাহরণ টেনে অচিরা বলেছে, 'মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কেটে অমর লোকের রাস্তা বানানো' (রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' স্মর্তব্য)। কথাগুলো অচিরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের। তবে অচিরার মুখে কথাগুলো কিছুটা বিদ্রূপ বা তিক্ততার প্রকাশ ঘটিয়েছে, এই যা।

অচিরার ঐ কথায় সমালোচনার স্পর্শ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বতত্ত্ব অনুযায়ী সে নিজেকে নবীনমাধবের বিজ্ঞান সাধনার বিঘ্ন বলে মনে করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে, সম্ভাব্য যৌথ জীবনের সম্ভাবনা থেকে। ঘর বাঁধার বিড়ম্বনা থেকে বাঁচিয়ে দিল নবীনমাধবকে সেই সঙ্গে নিজেকেও। এই আধুনিক বোধ পাশ্চাত্যের আদর্শ নয়, বরং তা মূলত ভারতীয়। বৈদিক যুগ থেকে দীর্ঘকাল মেয়েদের জ্ঞান সাধনা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, সেদিক থেকে নারী ও শূদ্র এক পঙ্‌ক্তিতে। 'কালান্তর'-এ পৌঁছে (নারী) রবীন্দ্রনাথের লেখায় এ ভাবনার অবসান ঘটলেও আধুনিক কালের আলোয় প্রতিফলিত 'তিনসঙ্গীর' শেষ সঙ্গীতে (শেষ কথায়)-এর সামান্যই উপস্থিত, বলা যায়, কার্যকরীভাবে উপস্থিত নয়। 'নারী তপস্যা ভাঙ্গে পুরুষের'— এমন কথাও মাঝে মধ্যে ঝলকানি দিয়ে উঠেছে অচিরা ও নবীনমাধবের আলোচনায়।

তবে নবীনমাধব যখন স্পষ্টভাবে অচিরাকে আহ্বান জানিয়েছে কাছে আসার তখন অচিরা স্পষ্টভাষায় জবাব দিয়েছে যে, তার একদা প্রণয়ী ভবতোষের প্রতি তার ভালোবাসা এখন নৈর্ব্যক্তিক, 'কোনো আধারের দরকার নেই'। ভবতোষ অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, কিন্তু অচিরার ভালোবাসা নিজস্ব আধারে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে বেঁচে রয়েছে। 'মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, সব হারালেও যা থেকে যায় সেটাই ভালোবাসার আদর্শ'। তবে মূল কথাটা নবীনের জন্য হৃদয়ভেদী, পাঠকের জন্য বিস্ময়ের। অচিরা বলেছে 'ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা মানবীর।'... এটা 'রক্ষা করতে না পারলে শুচিতা থাকে না।' সব শেষের তীর আরো তীক্ষ্ণ 'মানুষের (পুরুষের ?) সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' একথার ইঙ্গিত হচ্ছে : বিজ্ঞানী, এবার আপনি আসুন। প্রেম নয়, এখন কাজের তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকুন মহৎ কিছু অর্জনের জন্য। এখানে পুরনো রাবীন্দ্রিক তত্ত্বই কিছুটা ছায়া ফেলেছে যদিও সতীত্বের সংজ্ঞা কিছুটা ভিন্ন। তবু সনাতন সতীত্ব ধারণার ছাপ রয়েই গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রবিবার'-এর অভীককে লেখক তৈরি করেছেন অনেকটা 'শেষের কবিতা'র অমিতের আদলে, এক পা এগিয়ে। কথার ঝকমকিতে, অর্থসম্পদে, দৈহিক সৌন্দর্যে একেবারে অমিত। নাস্তিকবোধে সে এক পা এগিয়ে। রবীন্দ্রনাথের তিরিশ দশকের বা পরের সব নায়ক-নায়িকাই উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক, এলিট মানসিকতার, ইউরোপের ডিগ্রি বা পড়াশোনার নজির সেখানে আছে। সমস্ত পরিবেশটাই ইউরোপীয়। এটাই ছিল কলকাতার বিশের বা ত্রিশ দশকের ছোট এলিট বৃত্তের চালচিত্র। রবীন্দ্রনাথের লেখার উৎস ও উদ্দেশ্য ঐ চালচিত্রের চরিত্র উদ্ঘাটন, এদিক থেকে 'তিন সঙ্গী'র 'ল্যাবরেটরি' ও 'সোহিনী' ভিন্ন। অন্যদিকে 'তিনসঙ্গী'র অন্য দুই নায়িকা বিভা, অচিরা যেন লাবণ্যের আধুনিকতর রূপ, যতটা কথার ঐশ্বর্যে তথা বাগধারার ঝকমকিতে, তার চেয়ে বেশি ধীরতা স্থিরতায় ও অন্তরের সৌন্দর্যে। এদের বাকপটুত্ব, জ্ঞানের গভীরতা ও আচরণের সৌন্দর্যে ও আধুনিকতার গরিমায় রবীন্দ্রনাথ ত্রিশের নয়াপ্রজন্মের আধুনিক লেখকদের ছাড়িয়ে গেছেন বিস্ময়কর কৃতিত্বে। সত্যি বলতে কী, কথাটা অপ্রিয় শোনালেও বোধহয় সত্য যে, ঐ উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে আধুনিকতার কলম হাতে নিয়েছিলেন। তবে এদের মিলে যে ছবিটা তৈরি হয় তা একেবারেই সমকালীন সমাজবাস্তবতা-ভিত্তিক, সেখানে ফাঁকি নেই।

অসামান্য প্রতিভাবান অভীক বিভাকে বিয়ে করতে চায় গভীর আবেগে। আবেদন জানায়, 'ধর্মকর্মের বাঁধন ছিঁড়ে সঙ্গিনী হয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে।' কিন্তু সমস্যা অভীকের নাস্তিকতা নয়, নিজের ব্রাহ্মধর্ম বা প্রয়াত পিতার কিছু নির্দেশও শুধু নয়, অজ্ঞাত কারণে সে মনের ভেতর থেকে সাড়া পায় না। অথচ অভীকের প্রতি বিভার ভালোবাসা অতল জলে রঙিন মাছের মতো, যে নিঃশব্দে হেসে খেলে বেড়ায়, বাধা দেবার কেউ নেই। অভীক মাঝেমধ্যেই বিভাকে বলে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই, তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে।'

এই অভীক বিলেত যাত্রার জাহাজ থেকে চিঠি লিখেছে বিভাকে প্রেমের এক শাব্দিক ক্যানভাস তৈরি করে। *রবিবার* নাস্তিক অভীকের আত্মসমীক্ষার দলিল, সে সঙ্গে অতিআধুনিক উচ্চশিক্ষিত এলিট শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের জীবনাচরণের চালচিত্র। কথামালার নায়ক অভীকের বুদ্ধিদীপ্ত, চোখঝলসানো ব্যক্তিত্বের বাইরে অন্য কোনো বিশেষ আদর্শ এ গল্পে ফুটে উঠে নি। *চতুরঙ্গের* জ্যাঠামশাই-এর পাশে অভীকের নাস্তিকতা কথার ফুলঝুরি বলে মনে হয়। কিন্তু নারী-পুরুষের মুক্ত সম্পর্কের স্বচ্ছতা প্রকাশই সম্ভবত এ গল্পে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। আধুনিক মানুষের জীবন-দর্শনের মতো গভীর বিষয় এখানে বড় একটা পরিস্ফুট না হলেও উচ্চশ্রেণী, এলিট শ্রেণীর জীবনযাত্রার চালচিত্র রেখাচিত্রের বাস্তবতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু গল্পের শেষবাক্যে নাস্তিক অভীকের পক্ষে বিভাকে 'লোকাতত মহিমায়' দর্শন বড় বিস্ময়কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো একটি বিষয় বিচার্য। মেয়েরা এতকাল যে ঘরের মধ্যে বন্দি সেজন্যই মৃণালকে বলতে হয়েছিল 'আমি আর ঘরে ফিরব না।' কারণ মৃণাল প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বৃত্তাবদ্ধ জীবনের অন্ধতা সংকীর্ণতার চরিত্র বুঝতে পেরেছিল। দেখেছিল সমাজের অনুশাসনে এরা বাঁধা আর সমাজের অস্তিত্বও এদের অন্ধ স্বীকৃতির কল্যাণে অটুট। এ বিষচক্র সহজে ভাঙার নয়। এর জন্যেই বিন্দু বা ননীবালার আত্মহনন; কল্যাণী-হৈমন্তীদের ট্রাজিক জীবন, নিরুপমাদের শোকাবহ মৃত্যু, আনন্দীর গৃহত্যাগ ও মাধুকরী বৃত্তিগ্রহণ ইত্যাদি।

কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মূল্যবোধের আলোয় দীপ্ত এলিট শ্রেণীর সমাজ তার ভালোমন্দ, স্বচ্ছতা ও কৃত্রিমতা নিয়ে যে ভাবরূপে ঋদ্ধ তারই চিত্রচরিত্র তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ 'তিনসঙ্গী'র গল্পে। এখানে সমাজ মুখ্য চালিকা শক্তি নয়, যতটা ব্যক্তির বিত্ত, শিক্ষা, আভিজাত্য। এ আধুনিক সমাজ রবীন্দ্রনাথের চোখে নতুন, তাই এসেছে একেবারে শেষপর্বে। এদের বিশ্বাসে, মূল্যবোধে, আচরণে গভীরতার অভাব। আবার এ সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্বচ্ছন্দ, সামাজিক বন্ধন অসংলগ্ন, বিবাহ নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এনেছেন তাঁর প্রিয় বিজ্ঞান গবেষণা এবং নারী-পুরুষ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার বিষয়। এখানে তিনি কিছু সনাতন মূল্যবোধ আধুনিকতায় নিষিক্ত করে উপস্থিত করেছেন অচিরার মাধ্যমে যা আগেই বলা হয়েছে। এ মানসিকতা হীনম্মন্যতার, পরাজিত মনোবৃত্তির প্রতীক। এতে আধুনিক চেতনার প্রতিফলন নেই।

রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে বলেছিলেন— মেয়েদের 'সমস্যা অর্থনৈতিক; তোমাদের উপার্জন করতে দেওয়া হয় কি? পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার।... বাইরের এই যে বাধ্যবাধকতা এই তোমাদের বাধা হয়ে আছে।' (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)। অথচ মেয়েদের ঐ অর্থনৈতিক সমস্যার বাধার কথা, এর সমাধানের পথ ইত্যাদি গল্পে-উপন্যাসে সবক্ষেত্রে তুলে ধরেন নি রবীন্দ্রনাথ, যদিও সে সুযোগ ছিল, যেমন *স্ত্রীর পত্রের* মৃণাল। তবে কল্যাণী চুপ করে বসে থাকে নি। বিদেশী মেয়েদের প্রসঙ্গে ('বিজয়া'র উদাহরণ টেনে) রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন যে, 'বিদেশী মেয়েরা তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে।... তারা যখন ভালোবাসে তখন তার ইমোশনকে একটা রূপ দেয়। আর ঐ ইমোশনের মধ্যে যদি একটা ক্যারেক্টার থাকে তবেই হয় তার সত্য প্রতিষ্ঠা' (প্রাগুক্ত)।

এসব কথা থেকে পাঠকের মনে হতে পারে, সোহিনীর ক্যারেক্টারের কথা, *তিনসঙ্গীর* অন্য গল্পগুলোর কথা। এদেশে এর রূপ ভিন্ন ('মারে, চাপা দিয়ে দেয়') বলেই কি রবীন্দ্রনাথ *তিনসঙ্গীর* গল্পগুলোতে ভালোবাসার আদর্শ রূপচিত্র নিয়ে কথা বলিয়েছেন নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল ভালোবাসার আদর্শ পরিচয় তুলে ধরা, যা সেগুলোতে আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠে নি। অবশ্য ব্যতিক্রম সোহিনী। মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ সোহিনীর ভালোবাসা ও কর্মব্রতের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন কথিত পাশ্চাত্য ভালোবাসার আদর্শ মনে রেখে। সেদিক থেকে গল্পটি সফল। 'শেষ কথা'র নবীনমাধবও 'যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের পাল্লা দেবার' ব্রত নিয়ে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছিল। একদা-বিপ্লবী নবীনমাধব দেশসেবার পুরনো আদর্শ বাতিল করে দিয়ে বলেছে, "মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এ রকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি—" কথাগুলো অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের বলে চেনা যায় বিশেষ করে যখন বাঙালি বিজ্ঞানী নবীনমাধব বিজ্ঞানসাধনা ও গবেষণাকে দেশসেবা হিসাবে গ্রহণ করে। মাতৃত্বপূজা নিয়ে ব্যঙ্গ 'চার অধ্যায়' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্পেও দেখা যায়।

কিন্তু অচিরা এ বিজ্ঞানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে এমন যুক্তিতে যে তার প্রেমে রয়েছে 'পরাজয়ের বিষ' যা কর্মীর সাধনা ও সাফল্য নষ্ট করে দেবে। কাজেই বিজ্ঞানীর কর্তব্য জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন হয়ে দেবত্ব অর্জন। অর্থাৎ প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার সম্পর্কটা যেন সর্বনাশের। কিন্তু এ নেতিবাদের বিপরীত সত্যই প্রতিপন্ন হয়েছে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে, সোহিনী-নন্দকিশোরের উপাখ্যানে। 'তিনসঙ্গী'তেও যে রবীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত আদর্শের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন তা অবিশ্বাস্যই ঠেকে।

AMARBOI.COM

পাঁচ

এবার একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারীকে ঘিরে ব্যক্তিক পারিবারিক সমস্যার প্রাধান্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রাজেডির প্রকাশ। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে দ্বিতীয় বিবাহ হরসুন্দরীর জন্য আজীবন ট্রাজেডির সৃষ্টি করেছে, এখানে দায় ব্যক্তির অর্থাৎ প্রথম স্ত্রী হরসুন্দরীর। এখানে সমস্যার মূল কারণ দ্বিতীয় বিবাহ তথা বহুবিবাহের সমাজস্বীকৃত প্রথা যা রীতিমতো অমানবিক। এর অন্যদিকে রয়েছে বিবাহিত পুরুষের দ্বিতীয় নারীতে আসক্তি এবং বিবাহ। এ সমস্যার জটিলতা বহুমাত্রিক। এর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে বিস্তর, তবু প্রসঙ্গত 'নিশীথে' গল্পটির অবিশ্বাস্য পরিণতি মনে করা যায়। জমিদার দক্ষিণারঞ্জনের জন্য এ পরিণাম ভয়ানক, যে-পরিণাম তাকে মানসিক রোগীতে পরিণত করেছে। 'দুই বোন'-এর উদাহরণও মনে করার মতো। অবৈধ প্রণয়ের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম রবীন্দ্রনাথ দক্ষ হাতে এঁকে তুলেছেন।

অন্যদিকে বিধবা বিবাহ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের খুব একটা পছন্দসই ছিল না যদিও দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করার মতো। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে বিধবা কাদম্বিনীর পরিণাম রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে এঁকেছেন শেষ বাক্যের শরসন্ধানী গুণগ্রামে : 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' বিত্তহীন সমাজেও নারীর অবস্থান যে কী এক অমানবিক পর্যায়ের তার প্রমাণ 'শাস্তি' গল্পে ছিদামের উক্তি : 'বউ গেলে বউ পাইব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই ফাঁসি গেলে তো আর ভাই পাইব না।' চন্দরা স্বামীর এ নারী-বিরোধী উক্তির সঠিক জবাব দিয়েছে তাকে একবার দেখার জন্য ছিদামের আবেদন নাকচ করে, 'মরণ' এই মর্মভেদী জবাব উচ্চারণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক গল্পে নারীর সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান গভীর মমতায় এঁকে তুলেছেন, তা যত শোকাবহ হোক।

'ত্যাগ' গল্পটিতেও রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে জাতপাত-বিরোধী। অন্যদিকে 'মহামায়া' গল্পের অসামান্য ট্রাজেডির পেছনে রয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক সংস্কার অগ্রাহ্য করে নায়িকা মহামায়ার স্বাধীন প্রণয়চর্চা। রয়েছে পরিণামে মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার জবরদস্তির বিয়ে এবং বিধবা মহামায়াকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করার পর ঘটনার আনুকূল্যে তার জীবনরক্ষা ও অর্ধদগ্ধ শরীর নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘরবাঁধার মতো ঘটনা। মহামায়ার প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা, প্রচলিত বিধিবিধানবিরোধী প্রেমের টানে ঘরবাঁধা নারীস্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ বিদ্রোহের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এ ধরনের ইস্পাতকঠিন বিদ্রোহী নায়িকাচরিত্রের সৃষ্টি একেবারেই বিরল ঘটনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন উচ্চারণ

প্রকৃতপক্ষে 'সবুজপত্র' প্রকাশের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীচৈতন্যে যে গুণগত পরিবর্তন তা যেমন ছোটগল্পে বাস্তবতার নতুন নিরিখে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি এর প্রকাশ কবিতায় যৌবনের উল্লাসে, ঝড়ো হাওয়ার ছুটে চলার আবেগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ। যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীভাবনায় ইতঃপূর্বে নারীত্বের চেয়ে সতীত্ব-পত্নীত্ব ও দাম্পত্যজীবনে নারীর গৃহধর্ম ও তার সেবাপরায়ণা কল্যাণীরূপের প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন, তাঁর হাতেই ছোটগল্পে ও কবিতায় নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত *স্ত্রীরপত্র, বোষ্টমী* ইত্যাদি গল্পে যেমন নারীর সামাজিক নির্যাতনের বিপরীতে তার স্বাধিকার চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তেমনি কবিতায় 'বলাকা'-'পলাতকা' পর্বে গৃহলক্ষ্মী নারীর নির্যাতন ও দুর্দশার ছবি এক ট্রাজিক চরিত্র তুলে ধরে। এরপরে 'অচেনা'-'পুনশ্চ' পর্বে নারীচেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ।

'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় গৃহবধূ নারীর যে মর্মান্তিক জীবনচিত্র আঁকা হয়েছে তা পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিফলন। নারী নির্যাতনের এ ছবি ছোটগল্পে প্রতিফলিত অনুরূপ দৃশ্যচিত্রের তুলনায় অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। নামেই যে আদর্শ গৃহলক্ষ্মী, যে-লক্ষ্মী সামাজিক রক্ষণশীলতার সনাতন অনুশাসনের দাবি পূরণ করেছে ঠিকই, তবে বিনিময়ে যৌবনেই জীবনের যবনিকা টানতে হয়েছে তাকে। রোগে জীর্ণ দেহ, অবহেলায় ভরা দুর্বিষহ জীবন নিয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছেও সে বসন্তের স্পর্শ পেয়ে মনে এমনই উল্লসিত হয়ে ওঠে যে মৃত্যু তুচ্ছ মনে হয়। তার উপলব্ধি—

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে উঠছে জেগে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,...
দাও খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুক্তি' কবিতার নায়িকা গৃহবধূর শেষপর্যন্ত মুক্তি ঘটেছে মৃত্যুতে, সেই সঙ্গে মুক্তি ঘটেছে—

রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা

এক দুর্বিষহ গতানুগতিকতার জীবন থেকে। এ তো এক ক্রীতদাসীর জীবন। 'জীবনের ভালোমন্দ বোঝার অবকাশ যেখানে নেই।' অথচ ভারবাহী পশুর মতো এ গার্হস্থ জীবনের মহিমা কীর্তনে সমাজ ও পরিবার এক পা'য় দাঁড়িয়ে থাকে। গৃহবধূর এ করুণ জীবনচিত্র অত্যন্ত মমতার সঙ্গে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ সমাজের ওপর, পরিবারের পুরুষ প্রধানগণের ওপর আঘাত হিসাবে বিবেচ্য। 'ফাঁকি' কবিতাও প্রতারণার পাশাপাশি নারীজীবনের অবহেলা আর লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তে পরিপূর্ণ। 'মুক্তি'র নায়িকার যদিও মুক্তি মিলেছে মৃত্যুতে, কিন্তু 'নিষ্কৃতি'র নায়িকা মঞ্জুলিকা সম্ভবত সচেতন মেয়ে, তাই সে পিতৃগৃহের লাঞ্ছনার জীবন থেকে নিষ্কৃতি আদায় করে নিয়েছে আপন চেষ্টায়। বাপের দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগে ভালোবাসার মানুষটির হাত ধরে বিধবা মঞ্জুলিকার গৃহত্যাগ। উদ্দেশ্য, সে আর প্রেমিক পুলিন মিলে দূরে গিয়ে ঘর বাঁধবে, সংসার করবে। এ কবিতায় সতীসাধ্বীর ব্রত পালন আর গৃহধর্ম পালন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিদ্রূপ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, মূলত পুরুষদের লক্ষ্য করে। ছুড়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

'পলাতকা'য় নারীর জীবনচিত্র আঁকার পর্ব থেকে 'মহুয়া'র প্রেমপর্বে প্রবেশ করার পর নারীর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ আরো বলিষ্ঠ, জীবন সত্যের প্রকাশ আরো সুস্পষ্ট। 'শেষের কবিতা'র প্রেক্ষাপটে নর-নারীর প্রেম নতুন মূল্যবোধে আশ্রিত বলেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববিশ্বাসের নারীতত্ত্ব—প্রেয়সী ও জননী কিংবা সতীত্ব-পত্নীত্ব-গৃহধর্মের ধারণা অনেকটাই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা, আর্জেন্টাইন মহীয়সী বিজয়ার মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে তাঁর নারীভাবনা ঢেলে সাজাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী তথা দাম্পত্যসম্পর্ক নতুন যুগের আলোয় নতুন করে দেখতে হয়েছে। নির্ভয়ে একে অন্যের ওপর নির্ভর করার মধ্যেই তো প্রেমের সার্থকতা, সেই সঙ্গে একসাথে পথচলা, ভাগ্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার মতো পরনির্ভরশীল দুর্বলতা পরিহার জীবনের দিকদর্শন হয়ে ওঠে। প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে প্রেমের সেতুবন্ধন রচনা করে জীবনের পথচলাই সর্বোত্তম বিবেচিত হয়। প্রেমের বাণী উদ্দীপ্ত উভয়ের কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয়—

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।...
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই শেষ নয়, দুজনের চোখ দিয়ে জগৎ দেখা, পরস্পরকে চিনে নেওয়া, দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা সমানভাবে ভাগ করে নেওয়ার যে-ধারণা তা পূর্বেকার রবীন্দ্র-ভাবনার একেবারে বিপরীত, এবং অভিনব, তাই বলা চলে—

এ গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।

প্রেমের এমন বলিষ্ঠ ধারণা নিয়েই 'দুজনের পক্ষে চলতি হাওয়ার পন্থী' হওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে, তাদের প্রেম নিয়ে যেমন রোমান্টিক তেমন জীবনবাদীও। আর জীবনবাদী হওয়ার কারণে এ পর্বে রবীন্দ্র-চেতনায় সবলা-অবলার দ্বন্দ্ব আর প্রবল হয়ে ওঠে না। নারীত্ব তথা নারীসত্তা তখন আর সংকীর্ণ চৌখুপিতে আবদ্ধ থাকার তত্ত্বে বিশ্বাসী থাকে না। সে কারণেই নারী ও পুরুষ জীবনভূমিতে মানব-মানবীরূপে দণ্ডায়মান। সমাজে অবহেলিত নারী, পুরুষ শাসিত সমাজের নানা অনুশাসনে পীড়িত নারী স্বাধিকার চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার...
নত করি মাথা
পথ প্রান্তে কেন রব জাগি,
কেন শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।

AMARBOI.COM

এমন এক আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর 'মহুয়া' পর্বে নারীর দাবি পুরুষের পাশে পথ চলার, সর্বকাজে নারী-পুরুষ একসঙ্গে চলবে এই তো ছিল বহুকাল আগে লেখা *চিত্রাঙ্গদার* কথা। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা যা চেয়েছিল তা শুধু প্রেম নয়, বিবাহবন্ধন। কিন্তু 'মহুয়া' পর্বের সবলা নারী প্রেমের শক্তিতে এতটাই বিশ্বাসী যে তার নারীত্বের ওপর অন্য কারো কর্তৃত্বে সে বিশ্বাসী নয়, এর অর্থ নারীদেহ আর পুরুষের হাতে ভোগপণ্য নয়। একালের নারীর মতো বলতে পারা যায় আমার এ দেহের অধিকার একান্তই আমার, সেখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ধারণের অধিকার পুরুষের নয়। যাজ্ঞবল্ক বা অন্যান্য শাস্ত্রকারের ধর্মীয় অনুশাসনের যুক্তিহীন অন্যায় দাবি অস্বীকারের মতো করে সবলা নারী উচ্চারণ করে—

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনি—
আমারে প্রেমে বীর্যে করো অশঙ্কিণী।...
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দীনতা যে সম্মানের নয়' একথা কবিতার সবলা নারী বুঝলেও রবীন্দ্র-উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকা এর আগে বুঝতে পারে নি, তাদের হীনম্মন্যতা ও দীনতার কথা এর আগে যথাস্থানে বলা হয়েছে। অবাক হতে হয় ভেবে যে 'মহুয়া'য় প্রেমপর্বের রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করেই এতটা সাহসী হয়ে নারীর এতটা অধিকার মেনে নিলেন কীভাবে যে তাকে আর 'বাক্যহীনা' রাখতে চান না কবি। রক্তে তার রুদ্রবীণা বাজে বলেই নারীর আকাঙ্ক্ষা 'জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তে উত্তরণ'-এর এবং সেই সঙ্গে এমন বিশ্বাসও—

জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে...।

'মহুয়া' পর্বের পর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রথাসিদ্ধ সতীত্বের ঐতিহ্যপালনের পক্ষে কথা কদাচিৎ উচ্চারিত হয়েছে, তবে সে উচ্চারণের চরিত্র ভিন্ন। জীবধারা রক্ষায় নারীর ভূমিকার কথাটা তিনি জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে শেষপর্বে এসেও উচ্চারণ করেছেন বিভিন্ন ধরনের রচনায়। এটা রবীন্দ্রচেতনার বহুকথিত 'অবসেসন'-এর অংশ।

তা সত্ত্বেও 'মহুয়া'র প্রেম পর্বে নারীত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ উচ্চারণ আমাদের অবাক করে। অথচ একই সময়ে রচিত উপন্যাসে কেন দ্বিধা, সংশয়, কুণ্ঠা! 'পলাতকা'-'মহুয়া' পর্বেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ ভূমিকা শেষ হয়ে যায় নি, বরং প্রকাশের ফর্মে পরিবর্তন এসেছে, এই যা। এ সময় তার গদ্যে এসেছে ঝকমকে দৃপ্ত রূপ। ইউরোপ ভ্রমণ, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী রাশিয়া সফরের পর আমেরিকার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সব কিছু মিলে গদ্যে, কবিতায় যেন আরেক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু মাঝেমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে দীর্ঘদিন-লালিত ধারণা সামনে এসে দাঁড়ায়। সোহিনীর বিপরীতে যেমন অচিরা— যে নারী ও পুরুষের কাজ ভিন্ন করে দেয়, সতীত্বের ভিন্ন এক আধুনিক সংজ্ঞা তৈরি করে নেয়। পুরুষের 'তপস্বী রূপই' তার কাছে সত্য, 'নিষ্কাম পুরুষের শক্তিরূপ'ই অচিরার আরাধ্য। তার প্রতি নবীনমাধবের দুর্বলতা দেখে অচিরার নিজেকে ধিক্কার— 'ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অন্যের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও।'

এ নারী নারীত্ব বিচারে অস্বাভাবিক, 'মহুয়া'-বা 'পুনশ্চের' স্বাভাবিক যৌন-আকাঙ্ক্ষা, জীবনাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন নারী নয়। এ নারী সাধ্বীরই অন্যরূপ, তপস্বীর সফল সাধনার জন্য নিবৃত্তির কৃচ্ছ সাধনায় রত নারীর এক বৌদ্ধিক রূপ। নবীনমাধবও অবাক হয় অচিরার এ রূপ দেখে, বিচ্ছিন্নতাকে মুক্তি মনে করেও ঘরে এসে সন্ধ্যার নির্জনতায় বুঝতে পারে 'খাঁচা ভেঙ্গে গেছে'। তবু 'পাখির পায়ে আটকে রয়েছে ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।'

'বাজে' শব্দের বদলে এই যে ভবিষ্যতকাল ব্যবহার 'বাজবে', এর তাৎপর্য কম নয় নবীনমাধবের জন্য, তার প্রেমের জন্য। অর্থাৎ অচিরার জন্য তার প্রেম শেষ হয়ে যাবে না। এ জন্য কথাটা আমাদেরও মনে জাগে যে ১৯৩৯ সালে পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বধারণার সামান্য তলানি যেন থেকেই যায়। কবিতার প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্বে পৌঁছেও 'বিশ্বের জীবলক্ষ্মীরূপী নারীর' কথা (আরোগ্য) ভুলতে পারছেন না কবি, রক্ষণশীলতার ছিন্ন শিকলটা কুচিৎ হলেও বাজে।

কিন্তু 'শেষ কথা'র আগের কথা হচ্ছে তিরিশের তাৎক্ষণিক প্রভাবে (মনে হয় রুশ-অভিজ্ঞতার প্রভাব) রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ্যে মাটিতে নেমে এলেন তাঁর ভাষায় যেমন 'বেড়াভাঙ্গা গদ্যের ক্ষেত্রে' তেমনি 'স্ত্রীস্বাধীনতার' ক্ষেত্রে। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত হিসাবে কথাগুলো কাব্যিক রূপকে বলা হলেও এর অন্তর্নিহিত সত্য যেমন গদ্য কবিতার সাধারণ মানুষের প্রতীক তেমনি সত্য নারীস্বাধীনতার পক্ষে বয়ান যা নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তা না হলে সরস ভঙ্গিতে বলা হলেও 'সাধারণ মেয়ে'র মতো গদ্য কবিতা কেমন করে লেখা হতে পারে যেখানে পরবর্তী সময়ে লেখা বিলেতপ্রবাসী এলিটদের সম্বন্ধে চমৎকার ইঙ্গিত থাকে, তির্যক ভাষায় যদিও। কিংবা নিম্ন-শ্রেণীর মেয়ে রংরেজিনীর হাতে কেমন করে জীবনের বাস্তব সত্য ফুটে ওঠে, হোক না তা ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে।

'শেষের কবিতা' বা 'তিনসঙ্গী'র রচনায় নারীর নারীত্ব নিয়ে যে-ভাবনার সুপ্রকাশ তার বলিষ্ঠ প্রকাশ যেমন 'মহুয়া'র রোমান্টিকতায় তেমনি এর স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, রঙহীন, নির্ভার, অরোমান্টিক প্রকাশ 'পুনশ্চ'-এর গদ্য কবিতায়। এগুলোর মধ্যে তীব্রতা নেই, চোখ ঝলসানো আকর্ষণীয়তা নেই, কিন্তু রয়েছে নিস্তরঙ্গ রূপের সত্য, যে-সত্যেই এদের প্রতি আকর্ষণ ফুটে ওঠে পাঠকের মনে। এ বইয়ের কবিতায় মূলত সাধারণ মানুষের আনাগোনা, অবশ্য অসাধারণও রয়েছে। এখানে মূল উপজীব্য বিষয় মানুষ, মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ। এ মানুষের মধ্যে যেমন পুরুষ রয়েছে তেমনি রয়েছে নারী, যে-নারী সমাজে মাথা উঁচু করে আপন নারীত্ব নিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছুক, কথা বলতে আগ্রহী।

এরপর 'নবজাতক' থেকে *শেষ লেখা* পর্যন্ত কবিতার সুর অন্য তারে বাঁধা, সেখানে বিশ্বরাজনীতির প্রভাব, স্বদেশী রাজনীতির ভিন্নরূপ ইত্যাদি ছাড়িয়ে মানুষের কথা এবং মানবিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর শেষ দু'বছর তো বিশ্বযুদ্ধের ঝাঁঝালো আবহাওয়ায় কবি অসুস্থ, তবু তাঁর সুস্থ প্রতিক্রিয়া শাশ্বত মানুষের পক্ষে, যে-মানুষ প্রহৃত হয়েও পরাজয় স্বীকার করে না। এ মানুষের ধারণার মধ্যে নারী কি বাদ পড়তে পারে? নর-নারী বা মানব-মানবী মিলেই তো সভ্যতার সৃষ্টি মানুষ। এ জোড়-বন্ধনে প্রকৃত মানবতা ও মানবধর্মের প্রকাশ, যা না হলে ভবিষ্যৎ সভ্যতার মৃত্যু অনিবার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নারীর প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে, যেটুকু আছে (যদি আদৌ থাকে) তা গুরুত্বহীন। কথাটা ঘুরিয়ে বলতে গেলে সমাজ তার অর্ধেক সদস্যের অবদান থেকে বঞ্চিত। সমাজের ব্যবস্থাপনা তাই হতে পেরেছে একমুখী অর্থাৎ পুরুষের কর্তৃত্বে পরিচালিত। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের মতে গোটা বিশ্বে নারীর অবস্থা কমবেশি প্রায় একই রকম। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশ, বিশেষ করে আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থা নিঃসন্দেহে গুরুতর। প্রতিবেশী দেশগুলো এদিক থেকে এমন কোনো ব্যতিক্রম নয়।

সমাজে নারীর এ দুর্বল অবস্থানের পেছনে পুরুষের পেশিশক্তির অবদান যতটা তার চেয়ে পুরুষদের অর্থনৈতিক প্রতাপ অনেক বেশি মাত্রায় সক্রিয়। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, নারীশিক্ষার অভাব এবং নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা এবং সামাজিক রক্ষণশীলতার পিছুটান নারীর পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ। তাই নারী ক্ষেত্র বিশেষে চাইলেও তার স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারে না। এ না-পারার আরেকটি কারণ দীর্ঘকাল ধরে অবস্থার চাপে সৃষ্ট হীনম্মন্যতাও কেবলই তাকে পিছনের দিকে টানে। আশ্চর্যের বিষয় নারী এ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয়। সাধারণভাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী পূর্বোক্ত কারণগুলোর চাপে বা সম্মোহনে প্রতিবাদ বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর কথা ভাবে না, ভাবতে পারে না।

তবু ব্যতিক্রম হিসাবে এর মধ্যেই কেউ কেউ মাথা তুলে দাঁড়ায় বা প্রতিবাদ জানায়, অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলে বিদ্রোহ করে। কদাচিৎ এতে সুফল মেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রোহ নিঃশব্দে শেষ হয়, কখনো বা আত্মসমর্পণে দ্রোহের অবসান ঘটে। এ অবস্থায় নারী মনে করে এটাই তার নিয়তি, সেক্ষেত্রে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিন্তা আর বাস্তবে বড় একটা এগিয়ে চলে না। অন্যদিকে পুরুষ এ হিসাবটা ভালো করেই জানে, কারণ সমাজ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটা তার হাতেই ধরা। আমাদের উপমহাদেশীয় অঞ্চলে এ অবস্থা দীর্ঘকালের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান কালে পৌঁছে এমন দাবি কি চলে যে সে পুরনো অবস্থা আর নেই! আধুনিকতার ভোগ্যসামগ্রী, বিনোদন মাধ্যম হাতে পেয়ে সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে, এগিয়ে গেছে নারীও। এমন কথা বুকে হাত দিয়ে বলা সহজ নয়। নাইরোবি, কায়রো, বেইজিং নারী সম্মেলন যতই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হোক, নারীমুক্তি ও নারীস্বাধিকারের পক্ষে যত প্রস্তাবই গ্রহণ করা হোক, উপমহাদেশীয় পটভূমিতে এ অঞ্চলে নারীর অবস্থা সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজের উচ্চশ্রেণীতে নারীস্বাধীনতা বলতে তত্ত্বগত অর্থে যা বোঝানো হয়ে থাকে তার প্রকৃত অর্জন এখনো দূরে।

আধুনিক সাজসজ্জা, বিস্তর মূল্যবান ভূষণ, পার্টি বা ফ্যাশান শো এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান যদি নারীস্বাধিকারের মানদণ্ড হয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু ঘরসংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে নারীর প্রাত্যহিক ভূমিকা ও মতামতের গুরুত্ব যদি অংশত মেনে নেওয়া যায় তাহলেও স্বীকার করতে হয় যে উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে বৃহত্তর জনসমাজে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ জনস্তরে নারীর এ অবস্থানটুকুই অবিশ্বাস্য। সেখানে এখনো সামন্তবাদী আধিপত্যভিত্তিক মূল্যবোধ প্রবল। নারীর স্বাধীন মতামত সেখানে পুরোপুরি অস্বীকৃত। পুরুষ বাস্তবিকই সেক্ষেত্রে সর্বময় কর্তা, সুস্পষ্ট এক শাসক প্রভু যার ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু ঘটে না। স্বামী অর্থাৎ 'প্রভু' শব্দটি যথার্থ তাৎপর্য ও মূল্য নিয়ে বিরাজমান। মধ্যযুগীয় এ প্রভুত্ব গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য দিকেও অনুরূপ মূল্যমানে উপস্থিত।

সমাজের অন্য শ্রেণী, বিশেষ করে নাগরিক ও অনুরূপ শ্রেণীতে ঘরের বাইরে কর্মজগতে নারীর অবস্থান খুব একটা সন্তোষজনক মনে করার কারণ নেই। আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে কতটা বাস্তবভিত্তিক তা নিয়ে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটার গুরুত্ব এখানেই যে, অর্থনৈতিক অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানবিক অধিকারের ভিত, এমনকি ব্যক্তিক অধিকারেরও পূর্বশর্ত। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে হাতেগোনা কিছু সংখ্যক এলিট শ্রেণীর নারীর উপস্থিতি নারীর সর্বজনীন অধিকারের পরিচয় দেয় না।

ঘরের ভেতরে নারী যদিও মোট কাজের সিংহভাগ একাই সম্পন্ন করে থাকে সেক্ষেত্রে সে শ্রমের বিনিময়মূল্য নারীর গৃহলক্ষ্মী ও কল্যাণীরূপের মূল্যেই শেষ হয়ে যায়, শ্রমের সাধারণ নিয়ম সেখানে হিসাবে আসে না, পারিবারিক মর্যাদা ও ব্যক্তিক মর্যাদার প্রশ্ন সেসব হিসাব দূরে সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে আরো এ জন্য যে পরিবারে পুরুষ অর্থনৈতিক অর্জনের প্রধান উৎস, তাই নারী-পুরুষ হিসাবে শ্রমের সমতা বা শ্রমমূল্যের বিষয়টি সেখানে আঙ্কিক বিচারের ঊর্ধ্বে। পুরুষের মতামত বা ইচ্ছাই সেখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের ভেতরে পারিবারিক সম্পর্কের কথা যদি বিবেচনায় রাখাও যায়, ঘরের বাইরে নারীর শ্রমমর্যাদার সূচক ঐ এক নিয়মে বিবেচ্য হতে পারে না। তা সত্ত্বেও দেখা যায় নারীর শ্রমমূল্য পুরুষের সঙ্গে সমান হিসাবে ধরা হয় না। নারী-শ্রমিক একই কাজে পুরুষ-শ্রমিক থেকে কম মূল্য পেয়ে থাকে, কাজের সমাপন পুরুষের সমমানের হওয়া সত্ত্বেও। ক্ষেত্র বিশেষে তার সুযোগ-সুবিধা পুরুষের থেকে কম। এই বৈষম্যমূলক আচরণ— নারী ও পুরুষের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ের। লিঙ্গ বৈষম্য তাই সমাজের সর্বত্র অমানবিক সূচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সাধারণ শ্রম থেকে বিশেষ শ্রমে, তার দৈহিক শ্রম থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমে বৈষম্য সরাসরি পরিস্ফুট না হলেও এর প্রকাশ ঘটে ভিন্নতর চরিত্রে, যা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। নারী-পুরুষ সমস্যার উল্লিখিত দিকটি এর একমাত্রার প্রকাশ।

নারী-পুরুষ সমস্যার একটি দিক, বিশেষত এর সামাজিক শক্তির পুরুষতান্ত্রিক পটভূমির দিক বিবেচনা করে দেখতে চাইলে স্পর্শকাতর একটি বিষয় সামনে চলে আসে। অস্বীকারের উপায় থাকে না যে ধর্মীয় অনুশাসন ঐ পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক শক্তির ভিত রচনার অন্যতম প্রধান উপকরণ। সব ধর্মই নারীকে পুরুষের চেয়ে হীন দৃষ্টিতে দেখেছে, সমদৃষ্টিতে কখনোই নয়। এর কারণ কি সেখানে পুরুষের প্রভুত্ব? লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত সব ধর্মেরই প্রবক্তা বা প্রচারক পুরুষ। স্বভাবত সুবিধার সিংহভাগ পুরুষের পক্ষেই গেছে।

এই পক্ষপাতিত্ব, 'জেন্ডার কমপ্লেক্স' এর একদেশদর্শিতা নারীকে সমাজে, পরিবারে পেছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে। কোনো নারী এ পর্যন্ত কোনো ধর্মের প্রবক্তা রূপে এসেছে— এমন নজির ইতিহাসে নেই। কোনো নারী যদি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মানবগোষ্ঠীর জন্য কোনো কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছে তাহলে তাকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, কিংবা ধর্মীয়-সমাজ শক্তি তাকে 'ডাইনি' হিসাবে চিহ্নিত করে পুড়িয়ে মেরেছে। আদিবাসী সমাজ থেকে মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় সমাজে এমন উদাহরণ মিলবে। পুরুষ-প্রধান সমাজ এমন ভূমিকায় নারীকে কখনো মেনে নেয় নি, মেনে নেওয়ার কথাও নয়।

কাজেই এমন চিন্তা নিছক অবাস্তব যে পুরুষের হাতে তৈরি অনুশাসন পুরুষের সমান অধিকার নারীর জন্য বরাদ্দ করবে। স্বভাবতই ধর্মের নিরিখে মানুষের জন্য তৈরি ইহজাগতিক ও পারলৌকিক ব্যবস্থাদির সুযোগ-সুবিধা পুরুষের পক্ষেই গেছে। আর একটি দিক দেহগত। যৌনবাসনার পরিতৃপ্তি তথা যৌনসম্ভোগের প্রক্রিয়ায় পুরুষ 'এগ্রেসিভ পার্টনার' বিধায় তার ভোগের ব্যবস্থাটা নিখুঁত বা সুচারু এবং পরিপূর্ণ হওয়া চাই। কার্যত সে ব্যবস্থাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা না হলে উচ্চমার্গের সাধনায় নিমগ্ন প্রাচীন ঋষি তপস্বীদের যৌনসম্ভোগের এতসব কাহিনী রচিত হবে কেন? আর দেবদাসী প্রথা তো নারীর জন্য এক চরম অবমাননাকর অধ্যায়, যা ধর্মীয় রীতির বাধ্যবাধকতা থেকে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী ধর্মীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতায় এভাবেই পুরুষের ভোগপণ্যে পরিণত হয়েছে, সমাজে এ সত্যটাই স্থায়ীরূপ নিয়েছে। তাছাড়া নারী পরিবার-প্রধান পুরুষের বংশরক্ষার যন্ত্রেও পরিণত হয়েছে। আর এ বংশরক্ষা এবং বংশগতির শুদ্ধতা রক্ষার কৃত্রিম উচ্চম্মন্যতা বা আভিজাত্যের টানে তৈরি হয়েছে নারীর সতীত্ব ধারণার বিষয়টি। সতীত্ব রক্ষিত না হলে উত্তরাধিকারের শুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না, অন্যদিকে পুরুষের অহমবোধ তৃপ্ত হয় না। সম্ভবত এসব কারণে বহুবিবাহ পুরুষের ক্ষেত্রে নীতিসিদ্ধ কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা নয়, অর্থাৎ এক নারীর একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে বিবাহ বা একাধিক পুরুষের প্রতি অনুরাগ নীতিবিরুদ্ধ, গর্হিত কাজ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ এক রীতিতে পৃথক ব্যবস্থা, এক যাত্রায় পৃথক ফল।

এমনি নানা কারণের বশবর্তী হয়ে সমাজ এতটাই জড় ও স্থাবর হয়ে উঠেছে যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের পক্ষে সহজে তার মন সায় দেয় না, আর তা নারীর পক্ষে হলে তো কথাই নেই। এ স্থবিরতা বিশেষভাবে গ্রাম্য সমাজে দেখা যায়। আর সে জন্যই বিশশতক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আধুনিক চেতনা নারীকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেতে যত দ্বিধা, যত অনড়তা। ধর্মভিত্তিক ফতোয়াবাজি— তা সঠিক অনুশাসনভিত্তিক হোক বা না হোক আমাদের সমাজে নারী-নির্যাতনের এমনকি নারী হননের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা দীর্ঘদিন আগেকার হলেও এর সাম্প্রতিক প্রবণতা বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত ও অধস্তন শ্রেণীতে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে।

প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ভাঙার কারণে সমাজের রক্ষণশীল ধারকের হাতে নারী ফতোয়াবাজির শিকার হয়েছে। যেমন হয়েছে তার ভালোবাসার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে, তেমনি অত্যাচারী স্বামীর গৃহত্যাগের পরিণামে, তেমনি সমাজের অন্যায় অনুশাসন লঙ্ঘনের ফলে। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণী থেকে অধস্তন শ্রেণী— সর্বত্র নারী ও নববধূ যৌতুক তথা পণপ্রথার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের পরিসংখ্যান হিসাব করতে গেলে সমস্যার গুরুত্ব, এর সামাজিক অভিব্যক্তির পরিণাম বিবেচনায় শিউরে উঠতে হয়।

আশ্চর্য যে শত বছর আগে (যেমন রবীন্দ্রনাথের কালে) পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণামে নারী নির্যাতন ও নারীহনন যে-মাত্রায় ছিল, আধুনিক চেতনার প্রভাব সত্ত্বেও তা কমে আসা দূরে থাক, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর অর্থ বর্তমানকালের আধুনিকতা শুধু উচ্চশ্রেণীর বা অংশত মধ্যশ্রেণীর ভোগে-বিনোদনে প্রযুক্তির সার্থকতা খুঁজে নিয়েছে, বৃহত্তর সমাজের অন্ধকার চেতনা আলোকিত করে তোলার প্রয়োজনীয় কর্তব্য বা দায়িত্ব পূরণ করতে পারে নি। এদিক বিবেচনায় সমাজের দৃষ্টি পিছন দিকে ফিরেছে, সমাজের যাত্রা পিছুটানের শিকার হয়েছে— এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয়।

তাছাড়া গত দু'এক দশক ধরে গ্রামীণ সমাজে দুস্থ বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্ত নারী বা অনুরূপ যেসব নারী অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেছে তাদের কেউ কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক রক্ষণশীলতার আঘাতে কখনো স্থানচ্যুত, কখনো বিপর্যস্ত, কখনো বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের সামাজিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দূরে থাক, সমাজ বরং তা বিপন্নই করেছে। করেছে সমাজের রক্ষণশীল মূল্যবোধের তাড়নায় এবং সেই সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের প্রভুত্ব রক্ষার তাগিদে।

বাংলাদেশের নারী ঐতিহ্যগতভাবে এমনি এক জান্তব, পুরুষ প্রভাবিত নির্যাতন-ব্যবস্থার চাপে তার মানবিক অস্তিত্ব ভুলে যেতে বসেছে, নারীত্ব ধারণা বা স্বাধিকারবোধ তো বটেই। বহুমাত্রিক সামাজিক শোষণ বুঝি নারী-জীবনের সঙ্গী। নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ সামাজিক সত্য হয়ে উঠেছে। কখনো তা পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতেও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করছে। এ ধরনের অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে আধুনিক চেতনার শক্তি প্রয়োজনীয় মাত্রায় সংঘবদ্ধ হতে পারে নি বলেই নারীর বিরুদ্ধে প্রচলিত সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিক অন্যায় দূর হয় নি। দূর হওয়া দূরে থাক, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলে, এ অন্যায়-অবিচারের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। রবীন্দ্রনাথের কালের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান কাল এদিক থেকে আধুনিক চেতনা বা যুগ-প্রগতির প্রমাণ তুলে ধরতে পারছে না।

পারছে না মনে হয় মূলত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাবে। নারীশিক্ষা বা নারীর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার বিষয়ে একদা মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নি বলে। তখন মনে করা হতো নারী ঘর-সংসার দেখবে, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করবে, স্বামী ও সংসারের অন্য সদস্যদের সেবা করবে, বিনিময়ে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে পুরুষ— স্বামী বা পরিবার-প্রধান, অর্থনৈতিক দায়টা পুরুষের, বাকি সবই নারীর— তাতে তার দেহ-মনের মৃত্যু ঘটুক ক্ষতি নেই, কারণ নারী যেন সমাজে উদ্বৃত্ত ফসল। যখন, যেমন বা যে-কোনো প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা চলে।

সেজন্যই একদা গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদে বলা হতো 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু মরে'— অর্থাৎ গোধন নারীর চেয়েও মূল্যবান এবং নারী এমনই সহজলভ্য। একই কারণে কন্যা সন্তান বিসর্জন দেওয়ার তুল্য, অন্যদিকে পুত্রসন্তান পরিবারের বহু মূল্যবান সদস্য হিসাবে বিবেচিত। নারীর এ অবমূল্যায়ন প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। এ অবমূল্যায়নের আরেক রূপ সতীত্ব ধারণার চরম প্রকাশ হিসাবে নারীর সহমরণ। এ নারীহত্যা জনপ্রিয় সমাজপ্রিয় করে তুলতেই প্রবাদ রচনা— 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।'

সেকালের সমাজে কি নারীর এতটাই সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল যে কুলীনের বহুবিবাহ, সতীদাহ কিংবা গঙ্গাসাগরে কন্যাসন্তান বিসর্জনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে ? নাকি এগুলো ছিল সমাজে শক্তিমান পুরুষের অহমবোধের প্রকাশ, বা আধিপত্যবাদী শক্তি প্রদর্শন যাতে নারীকে সহজে আয়ত্তে রাখা যায়, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ না ঘটে, যাতে সে পুরুষের সম-অধিকার বা সমমর্যাদা দাবি না করে। সংসারে শ্রমের বিনিময়ে যথাযথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা যাতে তার মনে না জাগে। সে সময়কার নারী-পুরুষঘটিত পরিসংখ্যান হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারত। কারণ যাই হোক সেকালে নারীর দুরবস্থা সম্পর্কে এটাই ছিল সমাজবাস্তবতা। সম্ভবত সংখ্যার চেয়ে সামাজিক রক্ষণশীলতা ছিল নারীর এ দুরবস্থার কারণ।

নারীর দুর্দশার দূর করার দুটো পূর্বশর্ত শিক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা। সেকালে যেমনই হোক বর্তমানকালে সে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৃহত্তর জনসমাজে না হলেও উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে নারীশিক্ষার হার খুব কিন্তু কম নয়, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকটি লিঙ্গ জাত্যাভিমান ('সেক্স শোভিনজম')-এর কারণে প্রসার লাভ করে নি। অন্যদিকে বৃহত্তর জনসমাজে নারীশিক্ষা এতই পিছিয়ে আছে, আর্থিক স্বনির্ভরতা অধিকতর হারে এতটা পিছিয়ে আছে যে নারীস্বাধিকারের প্রশ্নে এ দুটো পূর্বশর্তের যথামাত্রায় বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এদিকে বড় একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা না হলে নারীর অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা গড়ে উঠতে পারে না। সমাজের সনাতন বিধিবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোবল নিয়ে দাঁড়াতে হলে এ দুটো বিষয়ই লড়াইয়ের ভিত তৈরি করতে সাহায্য করে। তাছাড়া যুগ-যুগ-লালিত সংস্কার থেকে মুক্তির জন্যও দরকার শিক্ষা ও মুক্তবুদ্ধির মানবিক চেতনা। সময়ের আনুকূল্য সত্ত্বেও নারীর ব্যক্তিসত্তার মুক্তি ও স্বাধিকার অর্জন যে অনেক পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ এ লড়াই প্রথমত শক্তির দিক থেকে অসম চরিত্রের, দ্বিতীয়ত এখানে রয়েছে সমষ্টিশক্তির অভাব। নারীর হাতে সচেতন পুরুষের হাত মেলানো নারীমুক্তির লক্ষ্য অর্জনে অপরিহার্য।

কিন্তু এ কাজ মোটেই সহজ নয়। সহজ ছিল না শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আমলে, সহজ নয় এখনো একুশ শতকের আধুনিকতায় পৌঁছে। তবে আগেকার তুলনায় সাহিত্যে এর আনুকূল্য যথেষ্ট এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। তবু লক্ষ্য অর্জন দূরে রয়ে গেছে প্রধানত ব্যাপক জন-স্তরে শিক্ষার অভাবে। এর দায় শাসকশ্রেণীর। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও সর্বদা মন থেকে সংস্কারের অন্ধকার দূর করতে পারে না বলেই আলোকিত সংস্কৃতির সচেতন চর্চার প্রভাব আবশ্যিক শর্ত হিসাবে বিবেচিত। সে সংস্কৃতিকে যেমন সামাজিক অঙ্গনের, তেমনি হতে হবে পারিবারিক বৃত্তের। স্বীকার করা দরকার যে এদিক থেকে আমরা বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি যদিও আধুনিকতার বিনোদনমূলক উপভোগে আমরা পিছিয়ে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি-পর্বের সূচনা এখন থেকে একশ' বছরেরও আগে। তখনকার সমাজ ও পরিবারে রক্ষণশীলতার প্রকাশ, সংস্কারের পিছুটান যে কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল সে সময়ের সামাজিক ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। এমনকি প্রমাণ মেলে সমকালের বিচারে শিক্ষায়, আধুনিক সংস্কৃতির চর্চায় সর্বাধিক অগ্রসর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষির সন্তানদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের নারী স্বাধিকার নিয়ে কলমযুদ্ধের ঘটনায়। এ যুদ্ধ সনাতন ধারণা বনাম আধুনিক ধারণার।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বল করে স্বদেশ ও বিদেশে নারীর সামাজিক-পারিবারিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার করে নারী-স্বাধিকারের পক্ষে চিঠির পর চিঠি প্রকাশ করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায়, তারই প্রতিবাদে হিন্দু সমাজে বিরাজমান নারীর অবস্থা ও সনাতন আদর্শের পক্ষে কলম ধরেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতামতের। সমালোচনা করেছিলেন পাশ্চাত্য নারীর জীবনাচরণ ও হালচালের, যা সংসার ও দাম্পত্যধর্মের অনুকূল নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে কষ্ট হয় না সমাজের রক্ষণশীল শিক্ষিতশ্রেণীর নারীবিষয়ক ধারণা ও আধুনিকতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পাল্টা জবাব দিতে দ্বিধা করেন নি। যদিও তা ছিল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিপজ্জনক।

আসলে উনিশ শতকী নবজাগরণের প্রভাব সত্ত্বেও সে সময়টা ছিল সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার ও আধুনিক চেতনার আলো-আঁধারের যুগসন্ধিক্ষণ। তবে অন্ধকারের বৃত্তটা আয়তনে বড়। সংস্কার ও রক্ষণশীলতার সে অন্ধকার প্রধানত সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার মায়াকান্নায় বা ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় প্রতিফলিত। এর প্রভাব পরিস্ফুট ছিল পারিবারিক জীবনের চৌহদ্দিতে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গনে। এ বন্ধন, এ অচলায়তন ভাঙার মধ্যেই ছিল আধুনিকতার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে এ অচলায়তন ভাঙার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

নারীমুক্তি ও নারীস্বাধিকারের ক্ষেত্রে অন্যান্য আধুনিক মূল্যবোধের মতোই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল দুদিকের লড়াই— যেমন নিজের সঙ্গে তেমনি বাইরের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে। নিজের সঙ্গে লড়াইটা ছিল তাঁর জন্য অধিক সমস্যাসংকুল। মহর্ষি পিতার নীতিরীতি ও বিশ্বাস ভাবনার অভিভাবকত্বে এবং সে সূত্রে উপনিষদ ও বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি মুগ্ধতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-মন গড়ে উঠেছিল, সনাতন সভ্যতার আচার-আচরণ ও জীবনধারা তাঁর চেতনায় যে ছাপ, যে প্রভাব রেখেছিল তা সহজে মুছে যাবার ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের শিলাখণ্ডে শুরুতে সেই যে আঁচড় পড়ে ছিল সময় মাঝেমধ্যে পলি ফেলে তা ঢেকে দিলেও বিভিন্ন প্রভাবে কখনো কখনো সে-পলি সরে গেছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পুরনো চিহ্ন। একালের বিজ্ঞান শব্দ ও সুরের ধ্বনি রাসায়নিক ফিতায় আঘাতের তরঙ্গ তুলে যে ছাপ রাখে তা আবার সহজেই মুছে ফেলে সেখানে নতুন শব্দ বা ধ্বনির ছাপ এঁকে দিতে পারে। এ কাজ হরদমই চলে— রেকর্ডারে আবৃত্তি বা গান শোনার প্রক্রিয়ায়। কিন্তু মনের স্নায়বিক তন্তুর চরিত্র ভিন্ন, সেখান থেকে পূর্বচিহ্ন একেবারে মুছে ফেলা বেশ কঠিন। কোনো কোনো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দোলাচলচিত্ততা বা চেতনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব যে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে সে সম্বন্ধে এর বাইরে অন্য কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন, প্রশ্নের জবাব মেলা ভার। বারবার এ ফিরে আসার কারণেই নিজের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে লড়াই চলেছে রবীন্দ্রনাথের, চলেছে সময় ও আধুনিকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে, সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যও বটে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বা রবীন্দ্রভাবনায় বাঁকফেরা তো এ আধুনিকতার টানেই। ভেতরের লড়াইটা না থাকলে তার সাহিত্যে আধুনিকতার মুক্তির কাজটা (বিশেষত নারীস্বাধিকার প্রসঙ্গে) রবীন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারত। লড়াই চলত মাত্র এক ফ্রন্টে, অর্থাৎ বাইরের সঙ্গে, রক্ষণশীল-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে।

উল্লিখিত বাইরের লড়াইটা ছিল মূলত সামাজিক রক্ষণশীলতার অচলায়তনের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সংকীর্ণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, অমানবিক চেতনার সঙ্গে। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের যে আলোকিত মূল্যবোধ রবীন্দ্রনাথ অন্তরে বহন করেছেন সারাজীবন, তার সঙ্গে সামাজিক রক্ষণশীলতা ও অনাধুনিকতার দ্বন্দ্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্য অবশ্যই এক সমস্যা। এ সমস্যা তাঁর পাশ্চাত্য রেনেসাঁসীয় আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সনাতন বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর জন্য বাস্তবিকই এক ধরনের সঙ্কট তৈরি করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এ ধরনের দুই ধারার দ্বন্দ্বে ভুগেছেন, বিশেষ করে তাঁর নারীবিষয়ক ভাবনায়। সতীত্ব-পত্নীত্ব-মাতৃত্ব, দাম্পত্যসম্বন্ধের পবিত্রতা ও নারীর সেবাপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীরূপ বিষয়ক বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিকচেতনার দ্বন্দ্ব তাকে দক্ষিণে-বামে নিরন্তর দোলায়িত করেছে। পেণ্ডুলামের মতো এ দোলা থেকে মুক্তি সহজ ছিল না।

রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস-ভাবনার ক্ষেত্রে এটাই ছিল এক গভীর ট্রাজেডি। আর এ বিষয় নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছে। সমালোচনা যেমন সনাতনপন্থীদের তরফে তেমনি আধুনিকদের পক্ষ থেকে। একালে সনাতনপন্থার সমালোচনা কম হলেও আধুনিকতার সমর্থকদের পক্ষ থেকে সমালোচনা ঠিকই উঠে আসছে। আসছে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক রক্ষণশীলতা নিয়ে তার নায়িকা চরিত্রচিত্রণে পিছুটানের বিষয় নিয়ে, কিংবা একই বিষয়ে তার স্ববিরোধিতার প্রকাশ সম্পর্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উল্লিখিত একাধিক বিষয় নিয়ে স্ববিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ এত স্পষ্ট যে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। সেজন্যই সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধিকারের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও পরিণত-বয়সী রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বছরে পৌঁছে একই বিষয়ে সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল, অন্যদিকে সত্তরে পৌঁছে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়করভাবে নারীর স্বাধিকার ও তার ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী যদিও পূর্ব-ধারণার তলানি একেবারে নিঃশেষে মুছে যায় নি, মাঝে-মধ্যে নারীচরিত্র চিত্রণে ঐ বিশ্বাস বা তাঁর নারীতত্ত্বের পরিস্রুত রূপ দেখা দিয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে মানবিক চেতনাই রবীন্দ্রনাথের জন্য মুক্তির উপায় হয়ে উঠেছে। এ মানবিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

মোটা দাগে বিভাজিত উল্লিখিত তিন পর্বের রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ত্রিধারায় দেখতে পাওয়া যায়। তারুণ্যের উদ্দীপনায় বিলেতে বসে স্থানিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে নারীস্বাধিকারের সমর্থক রবীন্দ্রনাথকে প্রবল ব্যক্তিত্ববান মহর্ষি পিতার নির্দেশে শিক্ষায় অকালে ইতি টেনে দেশে ফিরতে হয় (১৮৮০)। দেশে ফেরার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত নারীবিষয়ক ঐ চিন্তার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে যদিও ক্রমে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে বিপরীত ধারার। 'মানসী' রচনা কালে বাল্যবিবাহের সমালোচনা করে লেখা প্রবন্ধ (১৮৮৭), এরপর 'দেনাপাওনা'র মতো গল্প ও 'চিত্রাঙ্গদা' রচনা (১৮৯১) এবং বেশ কয়েকটি গল্প নারী সম্পর্কে পূর্বোক্ত ধারণার প্রমাণ দেয়।

কিন্তু এর মধ্যেই ক্রমশ স্থানিক প্রভাব, পিতার প্রভাব (!) যে রবীন্দ্রমানসে বিপরীত ধারণার ভিত তৈরি (যা প্রকৃতপক্ষে কৈশোরেই পিতার নিকট সান্নিধ্য ও অধ্যাত্মবাদী শিক্ষার প্রভাবে তৈরি) করতে শুরু করেছে তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথেরই কিছু কিছু লেখা থেকে। যেমন মারাঠি রমা বাঈয়ের নারী স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা শুনে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদী প্রবন্ধ রচনা (১৮৮৯), নারী-পুরুষের কর্তব্য ও কর্ম-বিষয়ক ভিন্নতার কাব্যপ্রতীক 'বিদায় অভিশাপ' রচনা (১৮৯৩), চিত্রার কবিতায় দুই নারীতত্ত্ব— উর্বশী ও লক্ষ্মী (১৮৯৫) এবং অনুরূপ চরিত্রের রচনা। অর্থাৎ তখনো দুই ধারায় অবগাহন। অবশ্য প্রতিক্রিয়ার পলি চেতনায় পড়তে শুরু করে আরো আগেই। তাঁর সংস্কারবাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তার পেছনে কতটা ছিল পিতার প্রভাব ? রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদী গান শুনে তাঁকে মহর্ষির ৫০০ টাকার চেক উপহার (১৮৮৭) কিংবা দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৮৮৮) এবং সেখানে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত স্থাপন (১৮৯০) ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন (১৮৮৯), একে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শিক্ষায়তনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে প্রতিষ্ঠা (১৯০১) ইত্যাদি ঘটনা কি একেবারেই পারস্পরিক যোগসূত্রহীন ? অন্তত রবীন্দ্রভাবনার চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিচারে ও আধ্যাত্মিকতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দিকে রবীন্দ্রনাথের ক্রমশ ঝুঁকে পড়ার দিক বিচারে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব প্রভাব বাস্তবিকই রবীন্দ্রচেতনায় গভীর দাগ কেটেছে, তা না হলে এর মধ্যেই তাঁর উপাসনা-ভাষণ 'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম' (১৮৯৯) এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ (১৯০০ খ্রি.) করতে যাবেন কেন রবীন্দ্রনাথ ? কিংবা এর পরপরই পিতার নির্দেশে বিধবা বিবাহ-বন্ধ করতে সুশীতলা দেবীকে এলাহাবাদ থেকে নিয়ে আসবেন কেন ? নিজের অসম বিবাহ (১৮৮৩) নিয়ে (ভবতারিণীর বয়স তখন ১১ বৎসর) যেমন আপত্তি তোলেন নি, তেমনি আপত্তি করেন নি সুশীতলাবিষয়ক ঘটনায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশ, পরিণত বিচারবুদ্ধির মানুষ; তিনি তখন আর বিলেতে অধ্যয়নরত নিছক তরুণ নন যে পিতার অযৌক্তিক নির্দেশ তাকে মানতে হবে। অর্থনৈতিক পর-নির্ভরতা কি রবীন্দ্রনাথকে এতটা দুর্বল করেছিল যে পিতার কোনো নির্দেশই অমান্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি ?

রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই পিতার নির্দেশ পালন করতে তৎপর ছিলেন ? সেসময়কার ঘটনাদি বিচারে তা মনে হয় না। পিতার প্রভাব, সমকালীন পরিবেশ প্রভাব, কর্মসুবাদে কিছু দায়িত্বের প্রভাব (রক্ষণশীল আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি পদ গ্রহণ— ১৮৮৪, ব্রাহ্ম সম্মেলনে আচার্যের বেদিতে আসনগ্রহণ— ১৮৮৬) ইত্যাদি মিলে মিশে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ভূমিতে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ভাঙচুর শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। আর সে ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে সনাতন বিশ্বাসের পরিণত রূপ আত্মপ্রকাশ করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কালে (১৯০১) যখন তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকারও সম্পাদক। এর আগে (১৮৯৮) স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নির্মাণের কাজ চলেছে, পরে পুরীর বাড়ি, ব্যক্তিগত মূল্যবান সামগ্রী বিক্রি করে ঐ আশ্রম চালনা এবং আশ্রম উপলক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর বৈদান্তিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের এমন এক বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে ওঠে যার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও হিন্দুত্ববাদ তাঁর চেতনা প্লাবিত করে ফেলে।

'নৈবেদ্য'র কবি এ রবীন্দ্রনাথ (কাব্যগ্রন্থটি পিতাকে উৎসর্গ করেন) একদিকে উপনিষদ ও প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার আদর্শরূপের প্রভাবে অভিভূত, অন্যদিকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন মহাকাব্য থেকে সংস্কৃত কাব্যের রূপময়তায় মুগ্ধ। তাই ইন্দুমতী, শকুন্তলা প্রমুখ নায়িকাদের আদর্শে আস্থাবান রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্ট নায়িকাদের ঐ আলোকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, অন্তত কিছুটা প্রভাব তো পড়েছেই। তাই 'গৃহিণী সচিব সখা' ইত্যাদি বাণী (কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এর উদ্ধৃতি) রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নায়িকা কুমুর আদর্শ হয়ে ওঠে, এমনকি হয়ে ওঠে 'কুমারসম্ভব'-এর শিব-পার্বতী। আশ্চর্য যে তিরিশের দশকে আধুনিক চেতনার রবীন্দ্রনাথের রচনা 'শেষের কবিতা'য় অমিত-লাবণ্য পর্যন্ত পূর্বোক্ত কালিদাসী বাণী উদ্ধৃত করেছে তাদের প্রেম-বিষয়ক আলোচনায়, এমনকি করেছে শেষ উপন্যাস 'চার-অধ্যায়'-এর অতি আধুনিক অতীন-এলা— আলোচ্য বিষয় প্রেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ভাবতে অবাকই লাগে যে রবীন্দ্রমানসে মধ্যবয়সে পরিস্ফুট সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস কতটা গভীরমূলীয় ছিল যা তাঁর আধুনিকতার আলোকিত ধারণার মধ্যে কিছুটা জায়গা করে নিতে পেরেছিল। এ গভীর বিশ্বাসের পেছনে মহর্ষির প্রভাবই প্রধান ছিল বলে মনে হয়। কারণ অল্প বয়সী কাঁচামনের কাদামাটিতে যে ছাপ পড়ে তার স্থায়িত্ব পরিণত বয়সে অর্জিত ধারণাদির তুলনায় অনেক বেশিই হয়ে থাকে। তাই মহর্ষির জীবদ্দশার এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আদর্শগত দিক থেকে ভিন্নতা লক্ষণীয় হলেও রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রভাব পরিপূর্ণভাবে কতটা মুছে ফেলতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এ বিষয়ে জ্যোতির্ময় ঘোষের মূল্যায়ন অস্বীকারের উপায় নেই যখন তিনি বলেন 'পিতা দেবেন্দ্রনাথের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের অভিভাবককারী প্রভাবের বাইরে পদক্ষেপের সাহস রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবিতাবস্থায় কোনোদিনই সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও জীবনভাবনায় তথা সামগ্রিক জীবনাদর্শে তাঁর পিতৃদেবের সর্বগ্রাসী প্রভাবের অনুপ্রবেশ-প্রবণতার ফলশ্রুতি স্বাভাবিক কারণেই সর্বাংশে কল্যাণকর হয় নি।' তাই সব কিছু মিলিয়েই ঐ চল্লিশ বয়সপর্বের তথা মধ্যপর্বের রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায়, তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-পরম্পরা ও চরিত্রচিত্রণে পরিপূর্ণ সনাতন বিশ্বাসের প্রতিফলন চোখে পড়ে।

তাই 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর বিধবা-প্রেম অস্বীকৃতই হয় না, তার জন্য নির্ধারিত হয় নির্বাসন। তাও আবার কাশীধামে। দাম্পত্যপ্রেমের শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব 'চোখের বালি'তে যতটা পালিত তার চেয়ে অনেক অনেক পরিচর্যায় তা পালিত হয়েছে 'নৌকাডুবি'তে সতীসাধ্বী নায়িকা কমলার স্বামীসম্বন্ধের নিত্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে, তার গৃহলক্ষ্মীরূপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে নিহিত শৈল্পিক সম্ভাবনা রক্ষণশীল আদর্শের কারণে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নষ্ট করেছেন এমন সমালোচনা সঠিক মনে হয়।

মহর্ষির মৃত্যুর (১৯০৫) পর থেকে রবীন্দ্রমানসে ক্রমে যে পরিবর্তনের সূচনা তার প্রতিফলন 'গোরা' উপন্যাসে মানবিকতার উদ্ভাসে। তবু সেখানে দেখা যায় নারী স্বাধিকারের প্রশ্নে দুই বিপরীত বিশ্বাসের প্রকাশ— সুচরিতা ও ললিতা সে-দুই চেতনার প্রতীক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধুনিকবোধের যাত্রা তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের ঘিরে এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে অনড় হয়ে থাকে নি। সমাজের অচল বদ্ধাবস্থার মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন যে-স্থবিরতার ভার তৈরি করে এর বিপরীত বিন্দুতে সহজিয়া সাধনার স্বচ্ছ মানবিকতা রবীন্দ্রনাথকে বরাবর আকর্ষণ করেছে যে জন্য বৈষ্ণব-বাউল ধারা সর্বদাই তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। এর মধ্যে রসের সন্ধানে জীবনসত্যকে বুঝে নেবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল কখনোই কম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সময় অনেক কিছুতেই তলানি ফেলে যার মধ্যে স্বচ্ছতার দেখা মেলে না। তাই— রসাত্মক সাধনায়ও গুরুবাদের প্রভাব সমাজে নর-নারীকে অবাঞ্ছিত বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তা নারীত্বের ওপর বিস্তার করেছিল দূষিত প্রভুত্ব, নারীর যৌনজীবনকে করেছিল বিষাক্ত, মর্যাদাহীন। পুরুষের সম্ভোগবাসনা অধ্যাত্মবাদিতার নামে নারীকে পরিণত করেছিল ভোগ্যসামগ্রীতে। রবীন্দ্রনাথের দামিনী ('চতুরঙ্গ') ঐ অবক্ষয়ী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বলিষ্ঠ প্রতীক। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিধবা ননীবালা নারীর ওপর পুরুষের যে-অন্যায়ের যথার্থ প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়েছে, আত্মহননের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রতিবাদ জানিয়েছে তার পাশাপাশি দামিনী নারীত্বের প্রতি যে-কোনো প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

এখানেও রবীন্দ্রনাথ সবলতা-দুর্বলতার দ্বৈতরূপ তুলে ধরেন যেন তাঁর নারীভাবনায় অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। এবং শচীশের সঙ্গে দামিনীর জয়-পরাজয়ের প্রতিযোগিতায় নারীত্বের অবমূল্যায়ন ঘটান গুহাপর্বের ঘটনায় এবং দামিনীর প্রতি শচীশের পুরুষসুলভ প্রভুত্ববাদী ব্যবহারে, সেই সঙ্গে ভালোবাসার নারীকে বর্জনের মধ্য দিয়ে। তবু দামিনী যে পরাজিত হয় নি, শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর মিলন ঘটানোর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন এবং নারীর ব্যক্তিক অধিকারের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'-তে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নায়িকা বিমলা সনাতন মতাদর্শের কাছে ঠিকই আত্মসমর্পণ করেছে এমন বিশ্বাসে যে স্বামীর অবস্থান স্ত্রীর অনেক ওপরে, স্বামীর পদসেবা স্ত্রীর কর্তব্য এবং তা দাম্পত্যধর্মের অংশ। তাই নিখিলেশের আপত্তি সত্ত্বেও তার পদসেবায় বিমলা তৃপ্তি পায়, এবং এ সেবা নারীর ব্যক্তিসত্তার পক্ষে অবমাননাকর বলে মনে করে না। অবশ্য এ সনাতন চিন্তার বিরুদ্ধে নিখিলেশের উদ্যোগেই বিমলার মধ্যে নারীর আত্মমর্যাদাবোধের আবির্ভাব ঘটে, ঘটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার আধুনিকতার টানে এবং প্রতিনায়ক সন্দীপের প্রতি বিমলার প্রবল আকর্ষণে— যে আকর্ষণ একাধারে দেশাত্মবোধ ও যৌনতার মিশ্র রূপ নিয়ে প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীধারণায় যথারীতি দোটানার শিকার।

নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও যৌন-স্বাধীনতা নিয়ে এ ধরনের টানাপোড়েন থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে মুক্ত হতে পেরেছিলেন তিরিশের দশকের কাছাকাছি পৌঁছে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে ঝকমকে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে। কিন্তু একই সময়ে লেখা 'যোগাযোগ'-এ কুমুকে তিনি গড়ে তোলেন সতীত্ববিশ্বাসী সনাতন নারীর প্রতীকে। শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন কুমু শেষপর্যন্ত স্বামীর যৌন অনাচারের শিকার হয়ে ঘর ছেড়েও মাতৃত্বের দায় বহন করে স্বামীর ঘরেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ বাধ্যবাধকতার দায় কুমুর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে 'শেষের কবিতা'য় প্রেমের দ্বৈতযাত্রায় নায়িকা লাবণ্য যেমন স্বামী নির্বাচনে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি দুই প্রেমের স্বীকৃতিতে নারীর ব্যক্তিক অধিকারও প্রকাশ করেছে। একজনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যজনের প্রেমের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে বিরল ঘটনা— যদিও রবীন্দ্রনাথেরই ছোটগল্পে বিবাহিত নারীর প্রেম (পরকীয় ধারণার প্রেম) অবিশ্বাস্য কোনো বিষয় নয়। কিন্তু উপন্যাসে দুর্বোধ্য কারণে এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল।

লাবণ্যর চরিত্রধারায় অধিকতর ঋজু ও অগ্রসর চেতনার নায়িকা এলা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও নারীস্বাতন্ত্র্যবাদী— কিন্তু সেই এলা'কেও রবীন্দ্রনাথের নারীতত্ত্বের দুর্বলতা বহন করে নারীর শারীরতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার কথা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এলা কথাগুলো বলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, কিন্তু বুঝতে পারা যায় এসব কথা যতটা নায়িকা এলার তার চেয়েও বেশি তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক প্রবন্ধের বক্তব্যে তার প্রমাণ রয়েছে।

এ ধরনের ভিন্ন এক তত্ত্ব অর্থাৎ দুই নারীতত্ত্বের চাপে 'চার অধ্যায়ে'র আগে রচিত 'দুই বোন' বা 'মালঞ্চ' শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতায় পৌঁছাতে পারে নি। সে তথ্য ভিন্ন প্রসঙ্গের, কিন্তু এর মধ্যেও 'দুই বোন'-এর অন্যতম নায়িকা ঊর্মিমালার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রণয়চর্চায় যেমন রক্ষণশীলতার ছায়া পড়েনি তেমনি অসামাজিক প্রেমের উত্তাপে তার মধ্যে যৌনতার উদ্ভাস এবং প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের বাসনা নারীর স্বাভাবিক যৌনবাসনারই প্রতিফলন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শর্মিলার সংসারে এর বেশি ভাঙচুর করতে সাহস পান নি। এর কারণ কি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়, না কি তাঁর মধ্যেই ছিল নারীর পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতা ও দাম্পত্যসম্বন্ধের শুদ্ধতা রক্ষার দ্বন্দ্ব— যে-দ্বন্দ্বের ফলাফল হিসাবে ঊর্মির মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছা-বিদায় গ্রহণ।

চার

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকারা এভাবেই নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্রোহে বা আত্মসমর্পণে দুই স্রোতের সামিল হয়েছে। কেউ নিজস্ব প্রকৃতিতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামনে এগিয়েছে, কেউ বা পিছন দিকে হেঁটেছে। এদের কারো কারো বিদ্রোহ যতটা সামাজিক, তুলনায় অনেকখানি ব্যক্তিক। বিনোদিনী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও তার বিদ্রোহী চেতনার শেষ রক্ষা হয় নি। 'বিনম্র দীনতা'য় তার পরাজয় সামাজিক বিধানের প্রতি দ্রোহে নয়, আত্মসমর্পণে; যে জন্য তার অবশেষ গন্তব্য কাশীধামে স্বেচ্ছানির্বাসনে। অন্যদিকে আশা বা কমলা সনাতন সতীত্ব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্নীত্বের ও পবিত্র দাম্পত্যসম্বন্ধের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী নারী। বিনোদিনীর এহেন পরাজয়ের দায় তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারীস্বাধীনতার প্রশ্নে নির্ভেজাল, প্রকৃত বিদ্রোহী চরিত্রের নায়িকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। কেননা আপাতবিচারে বিদ্রোহী নায়িকা অধিকাংশের মধ্যেই কমবেশি দুই ধারার মিশ্ররূপ উপস্থিত। 'গোরা' উপন্যাসের ললিতা অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে, স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারার কারণে বিদ্রোহী, এবং পরিণামে জয়ী, যে কথা মূল নায়িকা সুচরিতার ক্ষেত্রে বলা চলে না। অন্যদিকে গুরুবাদ, সামাজিক বিধিবিধানের মতো বিষয়াদি অমান্য করার দিক থেকে দামিনী প্রবলভাবে বিদ্রোহী নারীসত্তার প্রতীক। কিন্তু শচীশের প্রতি প্রেমের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট একাধিক ঘটনায় তার মধ্যে যে-পুরুষ পূজার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে, চরিত্রধর্ম বিচারে অনেকাংশে তা সনাতন নারীচেতনার প্রতীক। এ বিদ্রোহ তাই নির্ভেজাল নয়; তবে দামিনী জয়ী তার যৌনসত্তার স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠায়, শ্রীবিলাসকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেও তার সঙ্গে ঘর না বেঁধে স্বাধীন ব্যক্তি ও স্বাধীন নারীসত্তার প্রতীক আত্মসচেতন দামিনীকে মুক্ত রাখার কৃতিত্বে।

কুমুও চেয়েছিল তার কুমু পরিচয়ে আপন ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা নিয়ে জীবনযাপন করতে, কিন্তু তার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পূর্বলালিত সনাতন নারী ধারণার সংস্কার থেকে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক ভক্তিবাদ, সেই সঙ্গে আরোপিত মাতৃত্বদায়, যে-দায় পুরোপুরি লেখক কর্তৃক আরোপিত। কুমুর সাময়িক বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছিল স্বামীর যৌনবর্বরতার ফলে তার বিপর্যস্ত মনের প্রতিক্রিয়ার কারণে। তখনো কিন্তু তার মনে শুদ্ধ সতীত্বধারণার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অটুট। কুমুর বিদ্রোহ তাই বিদ্রোহ নয়। ঘটনার চাপে তার ঘর ছেড়ে আবার ঘরে ফেরা।

প্রেমের দ্বিমাত্রিক বা দ্বিপাক্ষিক প্রকাশ ঘটানো যদি নারীসত্তার স্বাধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে লাবণ্য বিদ্রোহী নায়িকার মর্যাদায় চিহ্নিত হতে পারে। যেমন পারে দেহশুচিতা ও সতীত্বের বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকে মুক্ত 'চার অধ্যায়'-এর নায়িকা এলা। আর ঊর্মি স্বাধীন যৌনবাসনার ও অনুরূপ প্রণয় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটিয়েও বিদ্রোহী সত্তার মর্যাদা অর্জন করতে পারে নি তার পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য।

অন্যদিকে বিমলা নারীত্বের এক আত্মসচেতন প্রতীক এবং দাম্পত্যবহির্ভূত প্রেমের ধারক হয়েও সতীত্ব-পত্নীত্বের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ঘরে ফিরেছে আপাত বিদ্রোহের সাময়িক ধ্বজা উড়িয়ে। নারীসত্তার বিদ্রোহ তার প্রকৃতিতে ছিল না, সাময়িক উদ্দীপনার টানে দ্বিতীয় প্রেমের বিস্ফোরণ ঘটিয়েই তার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। এদের মধ্যে সুচরিতা আধুনিকা হয়েও বিদ্রোহী নয় বরং নারীত্বের প্রচলিত ধারণার প্রেক্ষাপটে আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটগল্পের নায়িকাদের মধ্যে মাখন বড়াল লেনের মেজবউ মৃণাল নারীত্বের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার চাপে বিদ্রোহী হয়ে ঘর ছেড়েছে। এটা নিঃসন্দেহে নারীত্বের পক্ষে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বিদ্রোহ যখন মীরাবাঈয়ের নির্দেশিত ভক্তিবাদের পথে শেষ হয় তখন সে বিদ্রোহের তাৎপর্য অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে। সে বিদ্রোহ কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছায় না, বরং লক্ষ্যহীন প্রতিবাদে শেষ হয়ে যায়।

হৈমন্তীর প্রতিবাদ 'আমি নারী মহীয়সী'র মতো ভাবনাতে শেষ হয়। এ প্রতিবাদ পরোক্ষ, যা আত্মহননে গরিমা অর্জনের চেষ্টা করে। তুলনায় কল্যাণীর ('অপরিচিতা') প্রতিবাদ অনেকটাই ইতিবাচক যা বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিণতি লাভ করতে চেয়েছে। এ প্রতিবাদ বিদ্রোহ না হলেও এতে বিদ্রোহের চেতনা কিছুটা হলেও নিহিত রয়েছে। আর আনন্দী বোষ্টমীর প্রতিবাদও পরোক্ষ এবং তা গুরুবাদের বিরুদ্ধে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র অপ্রধান ছোটগল্পে সংখ্যার দিক থেকে মোটেই কম নয়।

তবে সত্যিকারের বিদ্রোহী নায়িকা সোহিনী। সে প্রচলিত সতীত্বের ধারণা জঞ্জালের মতো দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এমনকি সে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে পতিব্রতা নারীর ভূমিকা পালন করতে চায় নি। স্বামীর কর্মের প্রতি তার কর্মের মিলেই সত্যকার দাম্পত্যসম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার আদর্শে তার বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি আনুগত্যও কর্মভিত্তিক বিশ্বাসের সূত্রতায়। দেহের শুচিতা নিয়েও তার মনে কোনো সংস্কার নেই। সতীত্ব তার বিচারে নিতান্তই আপেক্ষিক একটি বিষয়, তেমনি একই কথা দেহ সম্পর্কেও। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততার মানদণ্ড তার চোখে প্রচলিত হিসাব থেকে একেবারে ভিন্ন। সে মানদণ্ড ব্রতের একাত্মতায় চিহ্নিত, তথাকথিত সতীত্বের ধারণায় নয়।

তেমনি আরেকটি বিদ্রোহী চরিত্র 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী তথা সদু। স্বামীর প্রতি আনুগত্য তথা সতী-সাধ্বীর প্রচলিত ভূমিকা তার চোখে মহৎ আদর্শ পালনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত সত্য হিসাবে উঠে আসে। দেশাত্মবোধেও নারীধর্মের যে প্রতিফলন তা সত্যকার সতীত্ব ভূমিকার বিরোধী হতে পারে না। সদুর বিদ্রোহী চরিত্র নারীত্ব-সতীত্বের প্রচলিত সংজ্ঞায় যতটা পরিস্ফুট তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ পেয়েছে রাজনৈতিক দেশাত্মবোধের পরিপ্রেক্ষিতে। সে অর্থেই সদু বিদ্রোহী, প্রচলিত সামাজিক সতীত্ব-দাম্পত্য ধারণার প্রেক্ষাপটে নয়।

'তিন সঙ্গী'র সোহিনী যে-অর্থে ও যে-মানদণ্ডে বিদ্রোহী— বিভা কিংবা অচিরা কেউ সেদিক থেকে বিদ্রোহী তো নয়ই, প্রতিবাদী চরিত্রও নয়। বিভা আধুনিকা হয়েও প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী পদক্ষেপে আগ্রহী নয়, আর অচিরা রবীন্দ্রনাথের নারীতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে পুরুষের স্বতন্ত্র সাধনায় নারীর বিচ্ছিন্ন ভূমিকার সমর্থক। তাই নবীনমাধবের কাছ থেকে দূরত্বই তার কাম্য। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সমাজে স্বতন্ত্র, পরস্পর থেকে ভিন্ন— এমনই তার বিশ্বাস।

তুলনায় কবিতার নায়িকাদের কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেই বিদ্রোহী। এরা প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধান মেনে নিতে আগ্রহী নয়। 'সবলা' কবিতার নায়িকা সে হিসাবে নানা মাত্রায় বিদ্রোহী। সে যেমন নিজের ভাগ্য আপন শক্তিতে জয় করার অধিকার দাবি করে তেমনি প্রচলিত রীতিতে বধূবেশে বাসর কক্ষে যাবার বিরোধী। তার কথা 'কভু তারে দিব না ভুলিতে মোর দৃপ্ত কঠিনতা।' সে জানে 'বিনম্রদীনতা সম্মানের যোগ্য নয়'— যে-দীনতার প্রকাশ ঘটেছিল বিদ্রোহী বিনোদিনীর মধ্যে, ক্ষণিকের জন্য সেরা বিদ্রোহী দামিনীর মধ্যেও, এমনকি পুরুষের পদপল্লব চুম্বনরত একাধিক নায়িকার মধ্যে।

এ নায়িকা সব ধরনের দীনতার ঊর্ধ্বে নিজেকে ধরে রাখতে সংকল্পবদ্ধ। এর আকাঙ্ক্ষাও পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদার সম্পর্ক। সেখানে মহতী আদর্শ হতে পারে মেলবন্ধনের সেতু। 'জীবনের সর্বোত্তম বাণী' তাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধন রচনা করতে পারে। এ ধরনের বিদ্রোহী নায়িকা সোহিনী বাদে রবীন্দ্রসাহিত্যে দ্বিতীয় নেই। 'নির্ভয়' প্রকৃতপক্ষে সবলার পথ তৈরি করে দিয়েছে, এরা কবিতায় এসেছে বলে গদ্যসাহিত্যের নায়িকাদের তুলনায় এদের স্বীকৃতি কম।

'মুক্তি' (পলাতকা)-র নায়িকা তুলনায় অনেকটাই গল্পের হৈমন্তী চরিত্র। সহিষ্ণুতার চরম প্রকাশ ঘটিয়ে পরোক্ষ প্রতিবাদে মৃত্যুই যেন এদের আরাধ্য। এরা পরোক্ষে বিদ্রোহী হলেও দ্রোহে নয়, আত্মনিবেদনের মহিমায় এদের প্রতিবাদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে তুলনায় 'নিষ্কৃতি'র বালবিধবা যেমন সাহসী তেমনি প্রেমেও আন্তরিক। প্রেমের টানে সমাজে প্রচলিত সব রীতিনীতি ও সংস্কারের বাধা ভেঙেচুরে প্রেমিককে নিয়ে পিতৃগৃহের কারাগার ছেড়ে গিয়ে বিদ্রোহের যথার্থ পতাকা উড়িয়ে ঘর বেঁধেছে। এমন বিদ্রোহের তুলনা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্য শাখায় অপেক্ষাকৃত কম।

শুধু তাই নয় মঞ্জুলিকার জীবনকাহিনীতে রবীন্দ্রলেখনীর কল্যাণেই সংসারধর্ম, দাম্পত্যধর্ম, বিধবা নারীর কঠোর বিধিনিষেধ পালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে বিচার করলেও সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে নারীত্বের মর্যাদা এ কাহিনীতে বলিষ্ঠ গুণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মর্যাদা লাভ করেছে বিধবাবিবাহের সুষ্ঠু অধিকার। এ কবিতার গদ্যফর্মে শৈল্পিক রূপায়ণ অসাধারণ বিদ্রোহী নায়িকার জন্ম দিতে পারত। সে নায়িকা নিঃসন্দেহে হতো সোহিনীর তুলনায় ভিন্ন মাত্রায় এক বিদ্রোহী নারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশদ বিচারে দেখা যায়, উপন্যাসের প্রতিবাদী নায়িকাদের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগ্রাম বিচারে ছোটগল্পের বিদ্রোহী নায়িকারা যেন এক পা এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ছোটগল্পের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও কবিতায় বিদ্রোহী নায়িকারা বিদ্রোহের গুণগত মাত্রা বিচারে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। এ নায়িকাদের নির্ভয় বলিষ্ঠতা আদর্শ নারী চরিত্র হিসাবে পরিস্ফুট। জীবনবাদিতা এদের অন্বিষ্ট আদর্শ, ভক্তিবাদিতার ধোঁয়াটে, অনির্দিষ্ট গন্তব্য এদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই ভাববাদিতার চেয়ে বাস্তববাদিতা এদের বিদ্রোহের ভিত রচনা করেছে।

পাঁচ

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য বাংলাসাহিত্যের যে আমাদের সর্বোত্তম তথা মহত্তম সাহিত্যপ্রতিভার হাত দিয়ে সৃষ্ট সর্বমাত্রিক আদর্শ বিদ্রোহী নায়িকা-চরিত্রের সংখ্যা খুবই কম। অথচ সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। তুলনায় সনাতন আদর্শের রক্ষণশীল চেতনার নায়িকাসংখ্যা বিস্তর— কমলা, আশা, সুচরিতা, ননীবালা, কুমু (বিশেষ বিচারে শর্মিলা, নীরজাও বাদ পড়ে না), মোতির মা (নিস্তারিণী), এবং আরো অনেক। এরাই রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের মধ্যে দলে ভারি।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমন বিচারে বিষয়টা ভেবে দেখেন নি। তাঁর নারীভাবনার টান তাঁকে যেদিকে নিয়ে গেছে সেদিকেই তাঁর শৈল্পিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তাতে তাঁর আধুনিক চেতনার প্রকাশ কতটা তাঁর রক্ষণশীল নারীভাবনা অতিক্রম করেছে সে হিসাব রবীন্দ্রনাথ আদৌ করেন নি। ভাবেন নি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকার প্রত্যাশার দিকটা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এক পর্যায়ে বলেই রেখেছিলেন যে 'লোকরঞ্জন' তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়।

হতে পারে এ বিষয়ে টলস্টয়ের মতামতের ভিন্ন মেরুতে তাঁর অবস্থান, এক সময় কথাটা রবীন্দ্রনাথ প্রায় কবুল করেই ফেলেছিলেন। তা সত্ত্বেও কথা থাকে যে লোকরঞ্জনের প্রশ্ন বাদ দিলেও সৃষ্টিকর্মের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, যুগধর্মের দাবি (সময়ের দাবি রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি), চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক যথার্থতা ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব বিচার রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেন নি, অস্বীকার যুক্তিসঙ্গতও নয়। সেদিক থেকে অন্তত কয়েকটি নায়িকা চরিত্রের সমাপন নিয়ে প্রশ্ন জাগে, এবং সেসব প্রশ্নের যোগ্য যুক্তিগ্রাহ্য জবাব রবীন্দ্রনাথ দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

এর কারণ এ আলোচনায় একাধিকবার প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরুক্তি সত্ত্বেও উপসংহারে বলতে হয় মহর্ষি পিতার প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের (সামাজিক, ব্যক্তিক) সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রভাবের মিথস্ক্রিয়ায় যখন যে প্রাধান্য বিস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পেরেছে নায়িকা চরিত্রচিত্রণে জয় হয়েছে সে প্রভাবেরই। তাহলে কি বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা চরিত্র সৃষ্টিতে পিছুটান তথা রক্ষণশীলতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি ?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় সবক'টি উপন্যাস ও সংশ্লিষ্ট ছোটগল্প ও কবিতাবলির বিচারে রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনা ও জীবনবাদিতার ছাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ চরিত্রের ওপর পড়েছে— প্রধান চরিত্র-সংখ্যা হিসাবে না এনে তা বলা চলে। শুদ্ধ আধুনিক চেতনার প্রকাশ বিবেচনায় আনতে গেলে দুই স্রোতের টান বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সার্বিক বিচারে সামাজিক অন্যায়, পারিবারিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানবিক চেতনার জয় (যা আধুনিকতার সমান্তরাল) সংশ্লিষ্ট ছোটগল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদী বাস্তবতা ভাববাদী আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম করে। ছোটগল্পের সঠিক পরিসংখ্যান এবং উপন্যাসের কিছু সংখ্যক চরিত্রবিচার এমন সত্যেরই প্রমাণ দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~